গৃহীর গাইড

দুর্গা বসু













গৃহীর গাইড

[দ্বিতীয় খণ্ড]

দুর্গা বসু

বি. আর্চ. (১ম শ্রেণী), এ. আই. আই. ডি. ; এফ. আই.
আই. এ. ; এল. বি. এ. (ক-শ্রেণী) ; রেজিঃ আর্কিটেক্ট
ও ভ্যালুয়ার ; প্রাক্তন পরিদর্শী অধ্যাপক,
আই. আই. টি., খড়্গপুর ও বি. ই.
কলেজ, শিবপুর

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলকাতা-৯

GRIHIR GUIDE (Vol. II)
Durga Basu

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮৩

মূল্য : ২৫·০০

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

আমার গাইডেন্সের বিন্দুমাত্র
তোয়াক্কা না করেই যিনি পরম-
বিক্রমে গৃহ-পরিচালনা করেন,
অতি সুষ্ঠুভাবে, সেই শ্রীমতী
বিশাখা বসুকে—

খোকন

দুর্গা বসু অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস,
৭এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০০১৩

সংশোধনী :

৪ পৃষ্ঠায় 'এন ভিরনমেণ্টাল' পড়তে হবে 'এনভিরনমেণ্টাল'।

৩১ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারার দশম লাইনে '১৩´৬´´' কে পড়তে হবে '১৩´৬´´'।

৩৪ পৃষ্ঠায় ২য় লাইনে 'গোস্তখি'—আসল ফারসী কথাটা হচ্ছে 'গুস্তাখী' যদিও চলতি বাংলা রূপ 'গোস্তাকি'।

৩৬ পৃষ্ঠায় ২৬ লাইনের শেষে 'প্রাদাদ' কথাটি পড়তে হবে 'প্রাসাদ'।

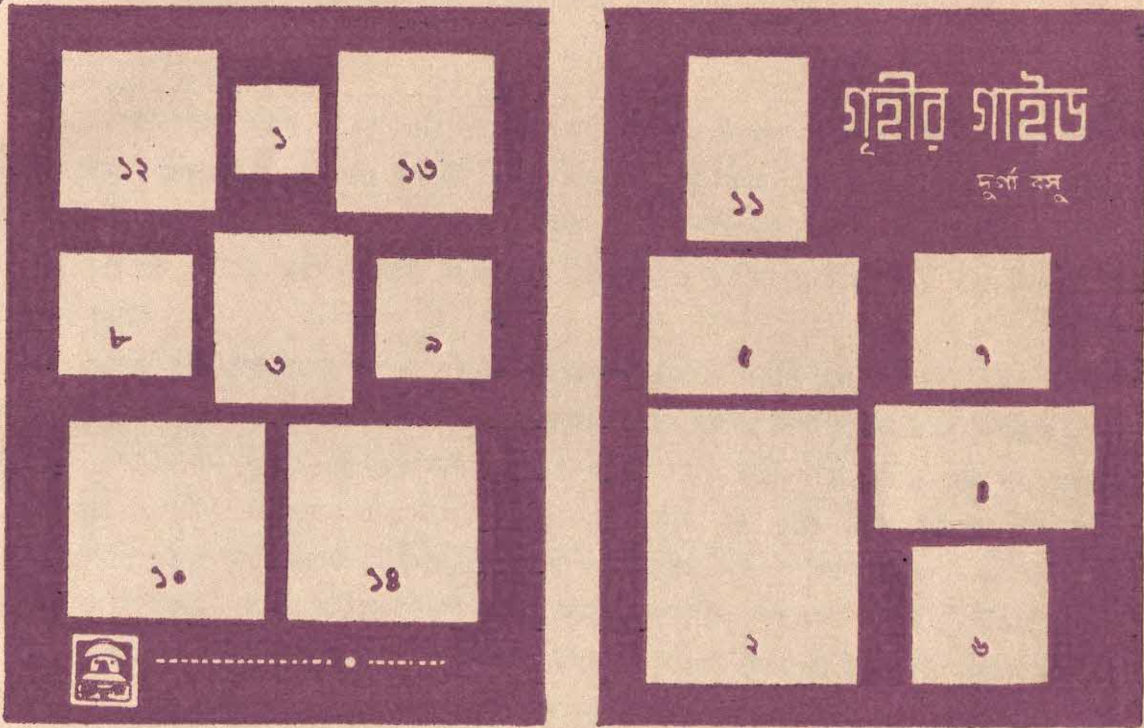
৪২ পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনের গোড়ায় 'গোস্তখি' সম্পর্কেও উপরের মন্তব্যই প্রযোজ্য।

৬৮ পৃষ্ঠায় ২৮ লাইনে 'জড়ানো' পড়তে হবে 'জরানো'।

৮৬ পৃষ্ঠায় ১৮/১৯ লাইনে 'তিনশো টাকায় আপনার মোট বিশাল ঝলমলে বুককেস' পড়তে হবে 'মোট তিন শো টাকায় আপনার বিশাল ঝলমলে বুককেস'।

সূচীপত্র

ছবি ক্রোড়-পৃষ্ঠা



মলাটের রঙীন ফটো দেখার হদিশ

(বিবরণের জন্য দেখুন ৫৬ পৃষ্ঠায় 'বিচিত্র সব বাসস্থান')

১ মুখ বন্ধ—বই ও সমালোচকের

অধুনালুপ্ত অচল পত্রের প্রয়াত সম্পাদক শ্রীদীপেন সান্যাল এক পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যতদিন আর একটি যুৎসই বিষয় খুঁজে না পাচ্ছেন ততদিন পরম-পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হাতে খণ্ড খণ্ড হতে থাকবেনই। তবে আমাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে তার উল্টোটাই। যুৎসই বিষয়ের অভাব নয়, প্রাচুর্যই আমাদের বাধা করেছে গৃহীর গাইডের ২য় খণ্ড লিখতে বা প্রকাশ করতে।

'গৃহীর গাইডে'র প্রথম প্রকাশ ১৩৮৮-এর ১লা বৈশাখ। উঠতি লেখক তো বটেই, পোড়-খাওয়া বহু অভিজ্ঞ প্রকাশককেও হতচকিত করে মাত্র ৯।১০ মাসের মধ্যে পাঠক এমন নিঃশেষে সমস্ত কপি লুঠ করে নিলেন যে '৮২-এর বইমেলায় শত চেষ্টা করেও একটা কপি পর্যন্ত পাওয়া গেল না প্রদর্শন করার জন্য। পাঠক যে কেবল প্রকাশকের ভাঁড়ার খালি করে বই তুলে নিয়ে থামলেন তা নয়। গোছা গোছা চিঠি আসতে লাগল মেদিনীপুর, উত্তর বাংলা, আসাম, বিহার, শ্রীহট্ট, ঢাকা, এমনকি সুদূর থাইল্যাণ্ড থেকেও। সে সব চিঠিতে দেওয়া থাকত নানান আন্তরিক পরামর্শ—বইটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করার। পাঠকের স্নেহধন্য নবীন লেখক হিসাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই দুসরা ছাপাই-এ কিছু কিছু বিষয় যোগ করলাম পাঠককুলের নির্দেশ অনুযায়ী।

'৮৮-এর ১৬ই ফাল্গুন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২। ২য় প্রকাশের প্রুফ রিডিং চলছে প্রায় অহোরাত্র। "একটি জরুরী বই"—এই শিরোনামায় 'আজকাল' পত্রিকায় সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রীশুভাশিস রায় লিখলেন, "আধুনিক বাস্তুবিদ্যার জ্ঞানসমৃদ্ধ, প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় ভাষায় লেখা বাংলা বইয়ের সংখ্যা কম। 'গৃহীর গাইড' এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গৃহনির্মাণের গাইড হিসাবে মলাটে গৃহীর গাইড নামকরণ যদিও প্রথমে চোখকে হোঁচট খাওয়ায়, মলাট উল্টে পড়তে বসলে চোখ অবশ্যই এক সাবলীল ভাষার স্রোতে পৌঁছে যায় নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডারে। …স্বল্প ব্যয়-ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের জন্য এই ধরনের বাড়ীর একক প্লিন্থ এরিয়াতে কত খরচ হতে পারে তার একটা বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই প্রচেষ্টা আর একটু পূর্ণতা পেত। … মিস্ত্রী-মজুরের কাজ তদারকির জন্য বইটিতে যা তথ্য আছে তাতে কাজ চলে যায়। কিন্তু ঠিকাদারের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের কাজের আইটেমে বিভিন্ন ধরনের বিল্ডিং মেটিরিয়ালের পরিমাণের আরও বিস্তৃত পদ্ধতি, নানা ধরনের বিল্ডিং মেটিরিয়ালের বর্তমান বাজারদর ও বিভিন্ন ধরনের বাড়ির একক প্লিন্থ এরিয়াকে মোটামুটি একটা খরচের ওপর আলোকপাত—এ বইয়ে অনুপস্থিত। ফলে বাস্তু-অভিলাষীকে নকশাকারের ও এস্টিমেটরের ওপর হিসাবের জন্য সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করতে হয় অজ্ঞতার

অসহায়তা নিয়ে। …সেই এস্টিমেট চলতি বাজারদর অনুযায়ী হল কিনা বা সেই স্পেসিফিকেশনের ও সিডিউল অব্ আইটেমস্-এর বিবরণের ফাঁক দিয়ে ঠিকেদারের সাপ্লিমেণ্টারী আইটেমের প্রাসাদ গড়ার সম্ভাবনা রইল কিনা এসব খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয় একটা বিস্তারিত গাইড লাইন এ বইয়ে অত্যন্ত কাম্য ছিল। …যাঁরা পদে পদে নকশাকারের অনবধানতা, নকশাকার-ঠিকাদারের যোগসাজশ ও ঠিকাদারের প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছেন শুধুমাত্র যথাযোগ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁদের জন্য লেখক এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন এই আশা রাখি। …"

উঠতি লেখককে উৎসাহ যোগাতে মামুলী প্রশংসাবাক্যের ফাঁকে ফাঁকে অতি উমদা গঠনমূলক সমালোচনা। এ পর্যন্ত ওই অচেনা শুভাশিস রায়কে 'থ্যাঙ্কু' দেওয়া চলে। কিন্তু সমালোচনাটুকু পড়ে ক্ষেপে গেলেন প্রকাশক। এত সব বাদ পড়ে গেছে ? কিন্তু সব কিছু তো একটা বইয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। অতএব দ্বিতীয় খণ্ড ! তাও খুব একটা গা করি নি। কিন্তু ২য় খণ্ডের রয়েলটি থেকে কত চপ-কাটলেট-কাঁচাগোল্লা-কড়াপাক জুটতে পারে তার স্পেসিফিকেশন ও এস্টিমেট প্রকাশক বুক পকেটে গুঁজে দেওয়ার পর আর স্থির থাকা গেল না। একেই বলে গেরো। কোথাকার কে রায় মশাই দু কলম খোঁচা মারলেন খবরের কাগজে—ব্যাস, আমার দিবানিদ্রা, বিকেলে পার্কে বসে ফুচকা ভক্ষণ, মায় নুন শো—সব বন্ধ। আর এই যে আপনি গ্যাঁটের পয়সা খরচা করে চোখের মাথা খাচ্ছেন দ্বিতীয় দফায়, এর জন্যও দায়ী আপনাদের পত্র ও শুভাশিস বাবুর সমালোচনা-বাহিত বিষয়প্রাচুর্য। ঠাকুর ঠিকই বলেছিলেন, 'বিষয় বিষ'।

● বাজারদরের রকেট ভ্রমণ

এস্টিমেট বা চলতি বাজারদর মোতাবেক খরচের হিসাব-কিতাব নিঃসন্দেহে খুব দরকারী ব্যাপার কিন্তু বইএর মারফত বাজার দর সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া খুব শক্ত। কারণ ? এও কি বলে দিতে হবে মশাই যে বর্তমানে বাজারদর স্বয়ং মা লক্ষ্মীর থেকেও বেশী চঞ্চল! এতই দ্রুত সঞ্চরণশীল যে ঘূর্ণায়মান ফ্যানের ব্লেডের মতই বিষয়টির অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ জাগে। ১৯৭৯-এর গোড়ার দিকে সরকারী উদ্যোগে হাউসিং বোর্ড গলফ গ্রীনে মধ্যবিত্তের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট বানাবার মনস্থ করলেন। তিনতলা বাড়ীর এক একটি ফ্ল্যাটের দাম ধরা হল এক লক্ষ টাকা। মাত্র দেড় বছর বাদে ৮০ সালের মাঝামাঝি সরকারী ঘোষণায় ফ্ল্যাটগুলির দাম বাড়াতে হল ১,৩০,০০০ থেকে ১,৪২,০০০ টাকার মধ্যে। ১৬/১৭ মাসে গড়পড়তা দাম বাড়ল ৩৩ শতাংশের মত। এর পরের দেড় বছরে ইটের দাম ৪৮০টাকা থেকে ৭৫০টাকা হাজারে ঠেকল। সিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠে যাওয়ায় খোলা বাজারে তার দাম টন প্রতি একলাফে সাত শো টাকা থেকে বেড়ে হল তেরো শো (ধন্নি রাজা পুণ্য দেশ, সিমেন্টের কণ্ট্রোল যদি হয় শেষ) ! লক্ষ টাকার সরকারী ফ্ল্যাটগুলি এবার হাতবদল করবে তিন লক্ষে। লোডশেডিং-এর কল্যাণে বই ছাপতেও ইদানীং প্রেসের কিঞ্চিৎ সময় লাগে। পাণ্ডুলিপিতে ইটের বাজার দর হাজার করা ৭৫০ টাকা বল্লে সেটিতো ধ্যানীবুদ্ধের মত গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে অথচ বাজারের দর তার হাইজাম্পের লংজাম্পের জোরে ওই

'কিঞ্চিৎ সময়ের' মধ্যে ১৭৫০-এ পৌঁছে যাবে। একটা শ্বাসরুদ্ধকারী কিম্ভুত-কিমাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটি একটা মধ্যবিত্ত বাড়ীর বিবরণই ধরা যাক। দোতলার ভিত সমেত একতলা বাড়ী—১০ ইঞ্চি সিমেন্টে গাঁথা দেয়াল, ভিতর বাইরে সিমেন্ট বালির পলেস্তারা, লাল সিমেন্টের মেঝে, ঢালাই ছাদ, কাঠের ব্যাটেনে বসানো ইলেকট্রিকের তার, টিউবওয়েল, সেপটিক ট্যাঙ্ক-ওয়ালা একজোড়া পাইখানা, উঠানের খানিকটা সিমেন্ট বাঁধানো, রাস্তার কোলে ছুটো পাকা গাঁথনী করা গেট পিলার তৈরি হয়ে গেলেও গেটের পাল্লা ও হুপাশের ফেনসিং বাঁশের বাঁকারী দিয়েই তৈরি ; পিলারে নেমপ্লেট বসানোর জন্য খাঁজ কাটা আছে কিন্তু মারবেল ট্যাবলেটটা এখনো রাজস্থানের অন্ধকার খনিগর্ভে। এ হেন ছোটখাট তকতকে মধ্যবিত্ত নিবাসটির প্লিন্থ এরিয়া রেট কষলে দেখা যায়, তা ছিল ঃ

১৯৬০-এ	প্রতি বর্গমিটারে	২৬০ টাকা,
১৯৬৫ তে	”	৩৫০ টাকা,
১৯৭০ এ	”	৪৮০ টাকা,
১৯৭৫ এ	”	৬৫০ টাকা,
১৯৮০ তে	”	৮৬০ টাকা,
এবং ১৯৮৩ তে	”	১১৫০ টাকা !

অর্থাৎ ২৩ বছরে দাম বেড়েছে সাড়ে চার গুণেরও বেশী ; প্রতি পাঁচবছরে তার আগের চেয়ে ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ বেশী (গড়ে ৩৫%ধরে নেওয়া যায়)। এ ভাবে চললে বিশ শতকের শেষে এই রেট গিয়ে দাঁড়াবে বর্গমিটারে ৩৬০০ টাকা (বা বর্গফুটে ৩৩৪ টাকা)। ···পাঠক, তোমার হৃদযন্ত্র যথেষ্ট সবল তো ?

● আয়ের দশ শতাংশ মাইনাস বোঁচকা বুঁচকি

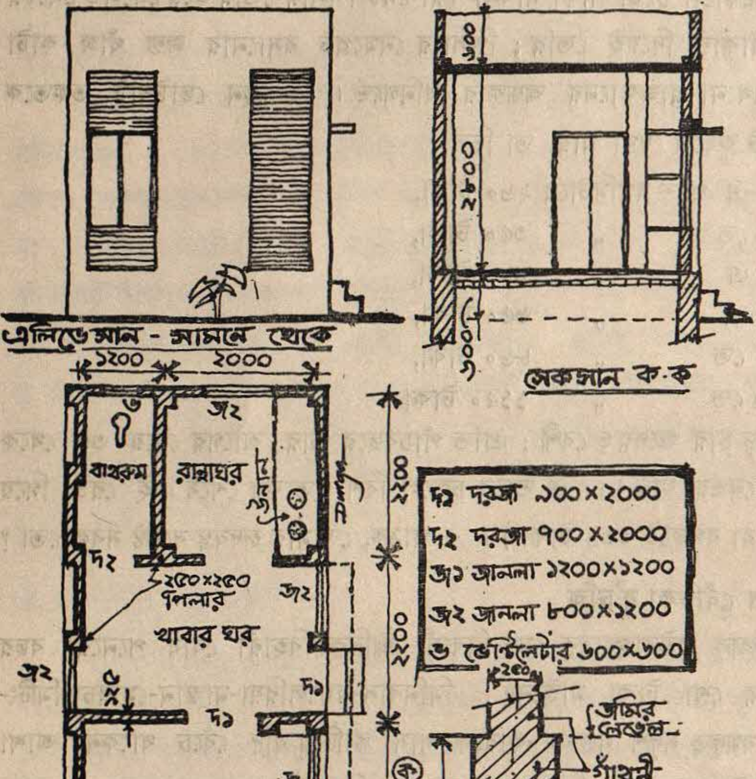
ঘনশ্যাম এক্সপোর্টার্সের মেজবাবু বউবাজারের মেস-নিবাসী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোষ পনেরো বছর আগে চাকরিতে ঢুকেছিলেন চার শো টাকা মাইনেয়। মিনিবাস-ম্যালেরিয়া-মাস্তান-মোরচা-মিটিং-মিছিল-মাইক অর্থাৎ কোলকাতার যমদূত সদৃশ সপ্ত-'ম'-কারকে পাস কাটিয়ে যদি বেঁচে থাকেন, আশা রাখি পনেরো বছর বাদে হু হাজার টাকা মাইনেয় রিটায়ার করবেন। নিকুঞ্জবাবুর একমাত্র স্বপ্ন, কোন্নগরে সরিকী সূত্রে প্রাপ্ত সওয়া হু কাঠা জমির উপর একটা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করা, যাতে তিনি চোখ বুঁজলে ঘোষজায়া পথে না বসেন। ৩০ বছরে নিকুঞ্জবাবুর বেতনের মাসিক গড়পড়তা বারোশো টাকা হিসাবে ধরে এবং ঘোষমশায়ের নিয়মিত সঞ্চয় আয়ের দশ শতাংশ হিসাবে ধরে দেখা যাচ্ছে জীবনের শেষ ধাপে তাঁর সঞ্চয় পৌঁছাচ্ছে ৪৩,০০০ টাকায় ; সুদে আসলে সেটা কোন ক্রমেই এক লাখের উপর যাবে না। বুঁচকির বিয়ে, বোঁচকার 'ল' পড়া, ঘোষজায়ার গয়না, নিজের চিকিচ্ছে বাবদ এই সঞ্চয়ের পঁচাত্তর ভাগ খরচের খাতায় লিখলে, নিকুঞ্জবাবুর স্বপ্ন মেটাতে পড়ে থাকে পঁচিশ হাজার টাকা। আসুন, দেখা যাক পশ্চিমবাংলার এমনি কয়েক লাখ নিকুঞ্জবাবুর কুঞ্জ গড়ার স্বপ্নে আমরা কতটা সাহায্য করতে পারি।

● কোন্নগরের নিকুঞ্জনিবাস

চলতি পদ্ধতিতে পঁচিশ হাজার টাকায় বড়জোর স্নানঘর আর পাইখানাটা তৈরি হবে। তাও হুলপ করে

বলা যায় না, সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কটা শেষ করতে পারবেন কিনা। অর্থাৎ, সুকুমারী ভাষায় 'শূন্য কত্তি শূন্য, হাতে রইল পেন্সিল'। নিকুঞ্জবাবুদের স্বপ্নের মাথায় তুম করে এক রামগাঁট্টা বসিয়ে দিয়েছে আমাদের অর্থনীতি।

সেকন (Cecon) হচ্ছে ভারত সরকারের তৈরি একটি উপদেষ্টা সংস্থা যা তৈরি হয়েছে ৬টি জাতীয় গবেষণাগারের সমাহারে—সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারীং সেন্টারস, সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সিমেণ্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব্‌ ইন্‌ডিয়া, ন্যাশনাল এন ভিরনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারীং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল বটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। গত পাঁচ বছর ধরে বহুত গবেষণা করে দুই খণ্ডে এক কেতাব বার করেছেন সেকন যাতে নিকুঞ্জবাবুদের বাড়ী করবার মেলাই শুলুক সন্ধান দেয়া আছে। এই বইয়ের দুসরা খণ্ডে পশ্চিম বঙ্গের উপযোগী এমন একটি আবাসনের নকশা রয়েছে যার নির্মাণকৌশল অবলম্বন করে ১৯৭০ সালে ঠাকুর-পুরে এক শিক্ষিকার বাড়ী তৈরি করেছিলাম (১নং চিত্র)। প্রতি বর্গমিটারে খরচ পড়েছিল দুশো টাকা (সে সময় চলতি পদ্ধতিতে খরচ পড়ত বর্গমিটারে পৌনে পাঁচশো টাকার মত)। বাড়ীটি আজও অটুট, নিখুঁত। প্রমাণ, মালিক রমা দেবী ও অমিয় বসু আজও আমাকে চায়ের সাথে নিখাদ প্রীতি পরিবেশন করেন। সেকনের বই-এ প্রদত্ত নকশায় বাড়ীটির আয়তন দেখানো হয়েছে ২৫'৭ বর্গমিটার (১নং নকশা), '৮১-এর বাজারদরে খরচ বলা হয়েছে বাড়ী প্রতি ১৮০০০ থেকে ২২০০০ টাকা। অর্থাৎ, নিকুঞ্জবাবুর আয়ত্তের মধ্যে।



আসুন, নেমে পড়া যাক নিকুঞ্জনিবাস গড়তে। প্রথমে ভিত কাটা যাক ৬০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ৭৫ সেন্টিমিটার গভীর করে। তলায় এক রদ্দা ইটের সোলিং বিছিয়ে দেড়শো মিলিমিটার পুরু ঢালাই করতে হবে ঝামা ইটের খোয়া (১০ ভাগ), বালি (৫ ভাগ) ও সিমেন্ট (১ ভাগ) মিশিয়ে। পুরো ঢালাইটুকু করতে আপনার লাগবে ৫ ব্যাগ সিমেন্ট। এবার বুনিয়াদের গাঁথনী। নকশা মাফিক গাঁথনী করতে হবে ৩ ভাগ সুরকীর সাথে ১ ভাগ ফোটানো চুন বা ৬ ভাগ বালির সাথে ১ ভাগ সিমেন্ট মিশিয়ে। এই গাঁথনীর মাথায় মাথায় থাকবে মেঝে। দুরমুশ পিটিয়ে শক্ত করা মাটির উপর প্রথমে ১ রদ্দা ইটের সোলিং, তারপর সাড়ে সাত সেন্টিমিটার পুরু সিমেন্ট-খোয়ায় ঢালাই (১ ঃ ৫ ঃ ১০ ভাগে) ও শেষমেশ ১২মিলিমিটার পুরু সিমেন্ট-বালির (১ ঃ ৩) সান বাঁধানো মেঝে। এ পর্যন্ত আপনার লাগবে হাজার দেড়েক ইট, এক ঠেলা বালি ও ১৮/১৯ ব্যাগ সিমেন্ট। এবার দেয়াল। এখানেই রয়েছে মূল গঠনকৌশল। মাঝে মাঝে ২৫০ মিলিমিটার × ২৫০ মিলিমিটার পিলার রেখে নকশা মাফিক ১২৫ মিলিমিটার চওড়া ভারবাহী দেয়াল গড়ে তুলতে হবে।

কোন প্রতিবেশী যদি বলেন যে ১২৫ মিলিমিটার চওড়া দেয়ালে ছাদের ওজন চাপানো অনুচিত, তাঁকে নিকুঞ্জবাবুর মনে করিয়ে দিতে হবে যে ১২৫ মিলিমিটার চওড়া দেয়ালে এক তলা নয়, দোতলার ভার চাপিয়ে আক্রায় চমৎকার আবাসন গড়েছেন স্বয়ং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের হাউসিং বোর্ড। এ রাজ্যে বাড়ী তৈরির অভিজ্ঞতায় এঁদের সমতুল আর কেউ নেই। এ গাঁথনীর মসলার ভাগ হবে ১ ঃ ৬। দেয়ালের উচ্চতা ২·৭৫ মিটার। এই অবধি লাগবে আরো হাজার আড়াই ইট, দেড় ঠেলা বালি ও ১৮ ব্যাগের মত সিমেন্ট। উপরে দিতে পারেন ১০০ মি. মি. পুরু ঢালাই (১ ঃ ২ ঃ ৪) ছাদ বা ১২৫ মি. মি. মোটা আর. বি. ছাদ। লাগবে ১৫ ব্যাগ সিমেন্ট, এক ঠেলা বালি ও আধ লরি পাথরকুচি (১৮ মিলিমিটার সাইজের) অথবা এক হাজার ফার্স্ট ক্লাশ পিক্ড্ ইট। সওয়া ছ' মিটার লম্বা ১০ মি.মি. মোটা টরর্ লোহা লাগবে ৩৮ গাছা যার ওজন কমবেশী ১৬০ কেজি। আড়াআড়ি বাঁধনের জন্য লাগবে আরো ৪০ কেজি ৬ মি. মি. রড। ছাদ ও দেয়ালের ভিতর বাইরে ১ ঃ ৬ ভাগের সিমেন্ট-বালির পলেস্তারা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে ১২ মি. মি. পুরু করে। তার উপর চুনকাম। দরজা-জানলা শাল কাঠের। ইতিমধ্যে পয়সায় যদি টান ধরে, নিকুঞ্জবাবুর উচিত দরজা-জানলায় রং না করে স্রেফ বাহির পিঠে প্রাইমার দিয়ে ছেড়ে দেওয়া। বছর তিনেক দিব্যি কেটে যাবে। বাইরের চুনকামটাও বছর তিনেক শিকেয় তোলা থাকতে পারে। তবে একটু কষ্ট করে ছাদে জল নিরোধক টারফেল্টটা সাঁটিয়ে নেওয়া উচিত। খরচ সেকনের মতে কুড়ি হাজারের মত (অর্থাৎ বর্গমিটারে ৭৮০ টাকা—৮১তে)। এর সাথে যদি সেপ্টিক ট্যাঙ্ক করতে হয় (কোন্নগরে হলে করতেই হবে), ধরে নিন বাড়তি আরো হাজার দুয়েক টাকা। তা হলেও নিকুঞ্জবাবুর বাজেট ছাড়াচ্ছে না। আয়ু? তা নিকুঞ্জবাবুর তো বটেই, বোঁচকার জীবনটাও সুখেই কেটে যাবে এই নিকুঞ্জনিবাসে।

● যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন

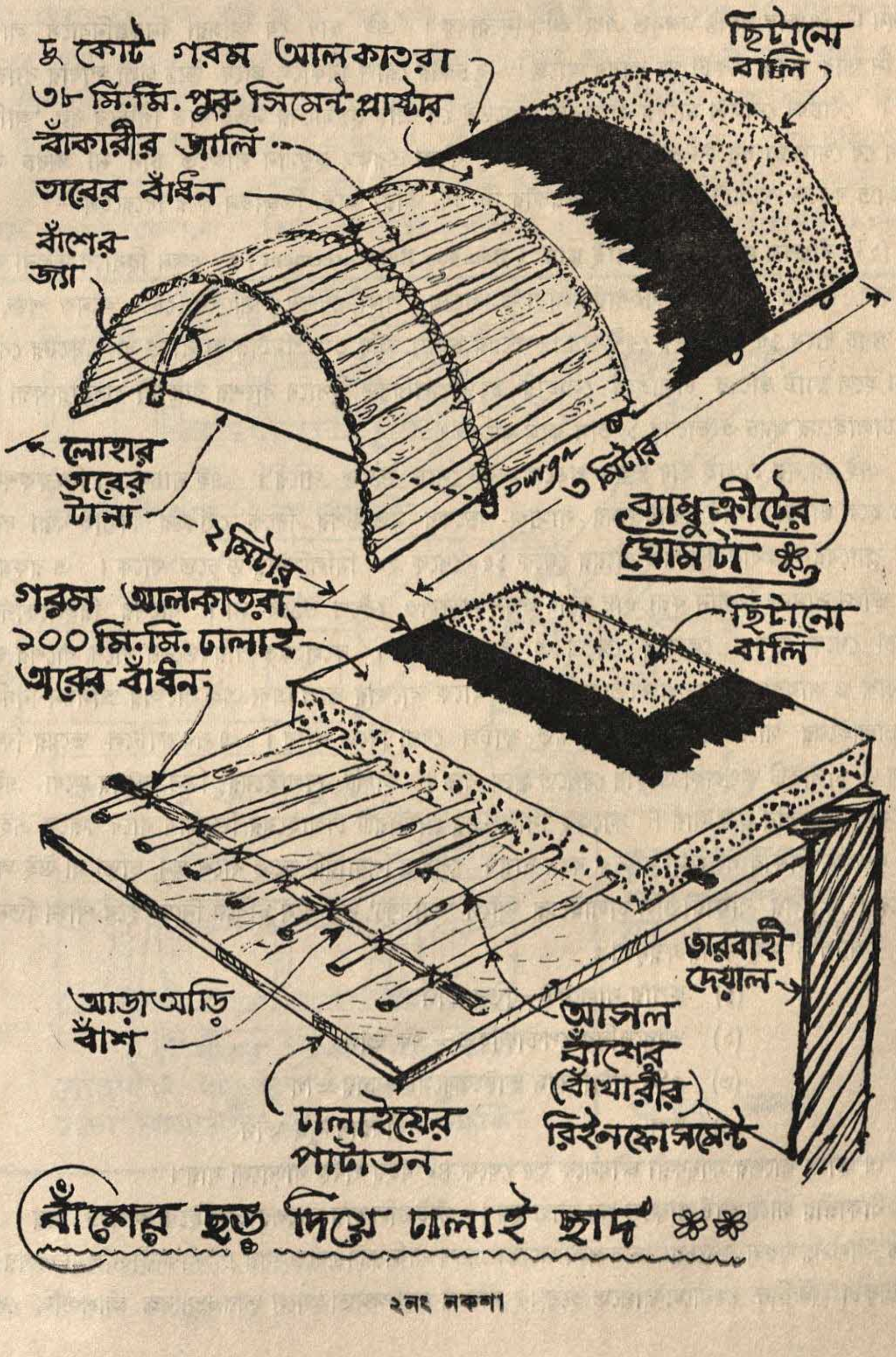
২৫'৭ বর্গমিটার (মানে ২৭৬ বর্গফুট) আয়তনের বাড়ীটা বড্ড ছোট মনে হচ্ছে ? ইংল্যাণ্ডের বাকিংহাম শায়ারের অভিজাত পাড়া ল্যাংলে পার্ক। এই পাড়ায় ডেভিড মোরিয়েনের বাগানে রাখা রয়েছে সবুজ রং করা একটা বাক্স ৪ ফুট × ৫ ফুট × ৩ ফুট ··· গীনেস বুক অব রেকর্ড অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বকালীন ক্ষুদ্রতম আবাসন। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন সেনা আলেকজাণ্ডার ওয়ার্ট্‌লে তাঁর জীবনের শেষ কুড়িটি বছর (১৯৬০ থেকে ১৯৮০) কাটিয়ে গেছেন এই বাক্সে। অবশ্য ছ ফুট দীর্ঘ ওয়ার্ট্‌লের পা দুটো আঁটানো যেত না বাক্সে। তাই ছোট দরজার লাগোয়া তৈরি করে নিয়েছিলেন একটা পকেট বারান্দা—পা দুটি ছড়িয়ে বিশ্রামসুখ উপভোগ করার জন্য। আশী বছর বয়সে তাঁর এই প্রাসাদেই দেহ-রক্ষা করেন ওয়ার্ট্‌লে। চিন্তা করুন আমাদের নিকুঞ্জনিবাসের মধ্যে চল্লিশটি এ হেন ওয়ার্ট্‌লে প্রাসাদ ঢুকে যেতে পারে ! নিকুঞ্জবাবুর তো আর খুতখুতনি থাকার কথা নয়। আলেকজাণ্ডার ওয়ার্ট্‌লে ছিলেন ইংল্যাণ্ডবাসী, ইংরিজী বলা সাহেব, সাদা চামড়া !

● সস্তার তিন ব্যবস্থা !

১২৫ মি. মি. পুরু ভারবাহী দেয়াল যেমন সস্তায় বাড়ী করবার পক্ষে এক বিশেষ কৌশল তেমনি সস্তায় ছাদ করারও কিছু কিছু নতুনতর প্রযুক্তি সৃষ্টি হয়েছে যেগুলি নিকুঞ্জনিবাস তৈরিতে আমরা কাজে লাগাই নি। এই বার আমরা এগুলি একে একে শিখব ঃ

[১] **ব্যাম্বুক্রীট (Bamboocrete)-এর ঘোমটা (২ নং নকশা)** ঃ বাড়ী তৈরির উপকরণ হিসাবে বাঁশ এক অতি চমৎকার জিনিস। সস্তা, সহজলভ্য, নমনীয় অথচ বিপুল ভারবাহী শক্তির অধিকারী, হালকা এবং বেশ দীর্ঘজীবী। তাই সস্তার বাড়ীতে বাঁশের ব্যবহার বহুল। স্ট্রাকচার, খুঁটি, দেয়ালের ও ছাদের ফ্রেম, চৌকাঠ, দরজা ও জানলার ঝাঁপ এবং এই শেষমেশ জোড়হাটের রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর আবিষ্কৃত ব্যাম্বুক্রীটের ঘোমটা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছাদ।

প্রথমে জোড়া বাঁকারী বা পাতলা বাঁশের দু মাথায় লোহার তারের টানা বেঁধে ধনুকের আকৃতির জ্যা বা আর্চ তৈরি করে দুই হাত অন্তর অন্তর সেগুলিকে সমান্তরাল ভাবে সাজাতে হবে। তার পর সারবদ্ধ ধনুকের পিঠের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে বাঁশের বাঁকারী বা কঞ্চি সাজিয়ে তা ধনুকাকৃতি ফ্রেমের সঙ্গে তার দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। ফলে ঘোমটাটির চেহারা দাঁড়াবে উপুড় করা মাটির খোলার মত, যদিও আকারে অনেক বড় (২ মি. × ৩ মি.)। এর পর ঘোমটার উপর দু খেপে মোট ৩৮ মি. মি. পুরু করে লাগাতে হবে সিমেণ্ট প্লাস্টার (১ ঃ ৬)। ২৮ দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পর শুকিয়ে নিয়ে মাখাতে হবে গরম আলকাতরা (১৮০° সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত ৮০/১০০ গ্রেডের আলকাতরা)—দু কোট। আলকাতরা জমে যাবার আগেই উপর থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে মিহি বালি। ব্যাস, ছাদ রেডী। তুলে এনে ঘরের মাথায় বসিয়ে দিলেই হল। টিনের চালের অর্ধেক দামে তৈরি এ ছাদ, আপনি নিজ হাতেই গড়ে নিতে


দু কোট গরম আলকাতরা
৩৮ মি.মি. পুরু সিমেন্ট প্লাস্টার
বাঁকারীর জালি
তারের বাঁধন
বাঁশের জ্যা
ছিটানো বালি
লোহার তারের টানা
৩ মিটার
২ মিটার
ব্যাম্বুক্রীটের ঘোমটা
গরম আলকাতরা
১০০ মি.মি. ঢালাই
তারের বাঁধন
ছিটানো বালি
ভারবাহী দেয়াল
আড়াআড়ি বাঁশ
আসল বাঁশের (বাঁখারীর) রিইনফোর্সমেন্ট
ঢালাইয়ের পাটাতন
বাঁশের ছড় দিয়ে ঢালাই ছাদ

২নং নকশা

পারবেন। এ ছাদ যথেষ্ট মজবুত এবং অগ্নি-নিরোধক। এই ছাদ যে আমরা নিকুঞ্জনিবাসে লাগাতে পারি নি তার অবশ্য একটা গূঢ় কারণ আছে। বুঁচকীর রোজ বিকালে ছাদে উঠে গলা সাধার ব্যায়রাম আছে। বোঁচকা ঘোমটা ছাদের প্রস্তাবটা তুলতেই সে প্রায় হনুমানের মতই দাঁত খিঁচিয়ে বল্ল, 'আমি কি হনুমান যে গোল ছাদের টং-এ বসে গান গাইব?' যাঁরা এরকম হনুমান সাজতে চান না অথচ সস্তায় কিস্তিমাত করতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য রুরকীর সি. বি. আর. আই. ডিজাইন করে দিয়েছেন—

[২] **বাঁশের ছড় দিয়ে ঢালাই ছাদ (Bamboo Reinforcement)**ঃ ওজন হিসাবে তুলনা করলে দেখা যায় বাঁশের আঁশ বা ফাইবার লোহা ও কাঠের (শাল, সেগুন) আঁশের চেয়ে অনেক শক্ত, প্রায় ডবল অথচ দামে ১৫ শতাংশের বেশী নয়।—ঘরের চওড়া যদি ৩·২ মিটার বা সাড়ে দশ ফুটের বেশী না হয় তা হলে ফ্ল্যাট ছাদের ঢালাইয়ে লোহার ছড়ের পরিবর্ত হিসাবে বাঁশের বাঁকারী ব্যবহার করা যায়। এতে ঢালাইয়ের খরচ ৩ ভাগের ১ ভাগ কমে যাবেই।

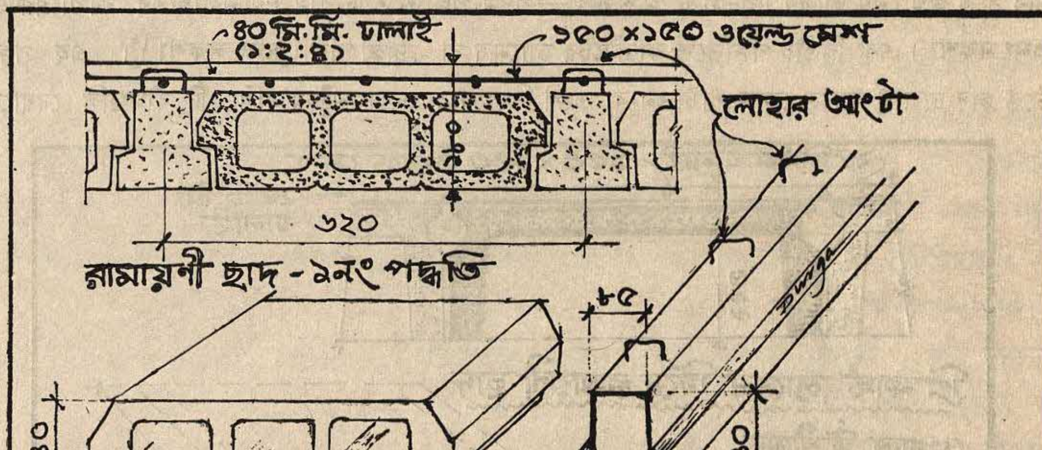
এই ধরনের ঢালাই ছাদ ওজন পড়লে একটু নেচে উঠতে পারে। এই নাচন বা ডিফ্লেকশন বন্ধ করতে হলে ছাদটা ঢালাই করার সময় সামান্য ধনুকের মত উপর দিকে বেঁকিয়ে ঢালাই করা দরকার যাতে স্ল্যাবের মাঝখানটা চারটি ধারের থেকে ১৫ থেকে ২০ মিলিমিটার উঁচুতে থাকে। এ রকমভাবে আগে ভাগে সামান্য খিলান করা ছাদ হঠাৎ ওজন পড়লেও কেঁপে উঠবে না। বাঁশের রিইনফোর্সমেণ্টে আর্দ্রতা থেকে যায়। লোহার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন ওঠে না। ফলে ঋতু-পরিবর্তনের সাথে বাঁশের জলীয় অংশ বাঁশ ও আবহাওয়ার মধ্যে যাতায়াত করতে থাকে বাষ্পের রূপে এবং এই বাষ্পের আগমন-নির্গমনের চাপে ঢালাইয়ের গায়ে সরু সরু চুলের মত ফাটল দেখা দিতে পারে। এ সব ফাটলে ভয়ের কিছু না থাকলে ও, ঢালাইটি অপলকা শ্রীহীন দেখতে হয়ে যায়। ছাদটি ঢালাইয়ের তিন মাসের মধ্যে এই সব ফাটল যা সৃষ্টি হবার হয়ে যায়। কাজেই সিলিং-এর প্লাস্টারটি ঢালাইয়ের তিনমাস বাদে করলে এই সব ফাটল দৃশ্যমান থাকার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। শেষ হুঁশিয়ারিটি হচ্ছে বাঁশে ঘুন, ছাতা বা উই লাগার ব্যাপারে। বাঁশের বাঁকারীগুলি ঢালাইয়ের আগে 'অ্যাসক্যু' সল্যুশনে চুবিয়ে নিতে হবে পাক্কা তিন দিন ধরে। 'অ্যাসক্যু' সল্যুশনের ফরমূলা ঃ

(১) কপার সালফেট—তিন ভাগ
(২) আরসেনিক পেণ্টাক্সাইড—এক ভাগ
(৩) ৫% পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট—চার ভাগ
(৪) জল —বিরানব্বুই ভাগ

এ ভাবে বাঁশের কার্যকরী জীবনকে ৩৫ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়।

বাঁকারীর গায়ে গাঁট থাকলে খুব ভাল হয়। গাঁটগুলি চার পাশের ঢালাইকে কামড়ে ধরে। এই বাড়তি বাঁধনের দরুন ছাদের ভারবাহী ক্ষমতা বেশ খানিকটা বেড়ে যায়। বাঁকারীগুলি ছিলবার সময় আর একটা জিনিস খেয়ালে রাখতে হবে। বাঁশের বহনক্ষমতা আসে তার সুসংবদ্ধ আঁশগুলি থেকে।

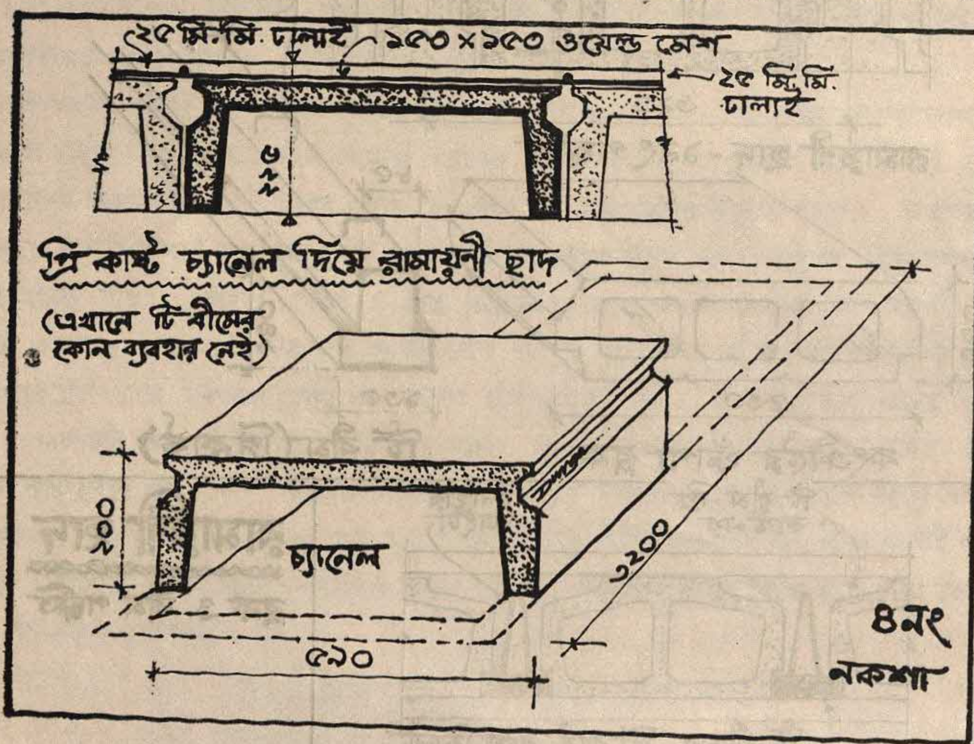
বাঁকারী চেরবার সময় কিছু আঁশ ছিঁড়ে যেতে বাধ্য। যত বেশী আঁশ ছিঁড়ে যাবে, বাঁকারীর ভারবহন-শক্তি তত কমে আসবে। কাজেই বাঁকারীগুলি ছিলবার সময় খুব সাবধানে কাটারী চালাতে হবে যাতে আঁশগুলি যথাসম্ভব অটুট থাকে। লম্বা ফালি ফালি বাঁকারীগুলির মাপ হবে ১০ মি. মি. × ২৫ মি. মি। ঢালাইয়ের জায়গায় এগুলিকে পাতবার আগে তাদের ছায়ায় রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। মাচার উপরে রেখে শুকালে, শুকানোর কাজটি অনেক বেশী সুসম্পন্ন হয়। এর পর আছে 'অ্যাসক্যু' সল্যুশনে ভেজানো। ভিজে অবস্থাতেই ঢালাইয়ের পাটাতনের উপর বাঁকারীগুলিকে সাজাতে



হবে। প্রথমে আড়াআড়িভাবে দু তিনটি ফাঁক ফাঁক করে রেখে তার উপর ৫০ থেকে ৭৫ মি. মি. ফাঁক দিয়ে সাজাতে হবে আসল বাঁকারীগুলি যা রিইনফোর্সমেন্ট হিসাবে ভার বহনে ঢালাইয়ের সঙ্গী হবে **(২ নং নকশা)**। আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি বাঁকারীগুলিকে তার দিয়ে বেঁধে দিলে ঢালাইয়ের সময় সরে

যাবার সম্ভাবনা খতম হয়ে যাবে। ১০০ মি. মি. পুরু ঢালাই করতে হবে ১ : ২ : ৪ এর ভাগে। খোয়ার মাপ ২০ মি. মি. পর্যন্ত। এর পর গোল ছাদের মত ২৮ দিন জলে ভিজিয়ে শুকানো এবং শুকিয়ে আলকাতরা মাখানো, বালি ছিটানো। তারপর? তারপর বুঁচকীকে পাঠিয়ে দিতে পারেন ছাদে সা-রে-গা-মা সাধতে।

[৩] রামায়ণী ছাদ (Roof with Precast Elements) : শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় অবতীর্ণ হবার অনেক আগেই রচিত হয়েছিল রামায়ণ। তেমনি এ ছাদে আপনার ঘরের দেয়াল ওঠার অনেক আগেই মাটির বুকে জন্ম নেয় ছাদের প্রি-কাস্ট অংশগুলি—প্রথম পদ্ধতিতে টি বীম ও ঢালাইয়ের ফাঁপা ব্লকগুলি (**৩নং নকশা**) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে: কংক্রীটের চ্যানেল বা ডোঙ্গাগুলি (**৪নং নকশা**)। এই পদ্ধতি দুটিতে ছাদ ঢালাই করতে কোন পাটাতন বা তক্তা বিছানোর প্রয়োজন হয় না। টি বীমগুলি দেয়ালের



উপর সাজিয়ে রেখে তার ফাঁকে ফাঁকে ফাঁপা ব্লক বা চ্যানেলগুলি আটকে দেওয়া হয়। বীমের মাথার উপর টিকি সদৃশ বেরিয়ে থাকা লোহার আংটার সাথে ৮ মি. মি. লোহার জাল (১৫০ × ১৫০ ওয়েল্ড মেস) আটকে ২৫ থেকে ৪০ মি. মি. পুরু ১ : ২ : ৪ ভাগে ঢালাই করে দেওয়া হয়। এই ঢালাই বীম, চ্যানেল (বা ব্লক) সব কিছুকে এক সঙ্গে বেঁধে একটা বেশ শক্ত-সামর্থ্য ভারবাহী ছাদের রূপ দেয় (দল পাকানোর মজাটাই এখানে—অনেকগুলি দুর্বল মানুষ একটি সবল সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারে। পার্টি, ক্লাব, ইউনিয়ন, সমবায়, সৈন্যবাহিনী—যাই বলুন, মূল মন্ত্রটা দলগত শক্তির সৃজন।)

এই ভাবে সাটারিং বা ঢালাইয়ের তক্তা লাগানোর কাজ বাদ দিতে পারায় এই পদ্ধতিটা সময় এবং খরচ দুই বাঁচায় এবং সময় বাঁচায় বলে আরো বেশী খরচ বাঁচায়। তবে এই রামায়ণী কৌশলের একটা অসুবিধা আছে। আবাসনের সংখ্যা যত বেশী—এ ভাবে কাজ করার সুবিধা তত বেশী। অর্থাৎ নিকুঞ্জবাবুরা ও একজন দুজন হলে পড়তায় পোষাবে না। ওদেরও দল পাকাতে হবে—সমবায় পদ্ধতিতে। অবশ্য তাতে আর আপত্তিটা কোথায়? আমরা তো আগেই দেখেছি পশ্চিম বাংলায় বেশ কয়েক লাখ নিকুঞ্জবাবু আছেন।

আমরা এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে দেখেছি গত বিশ-বাইশ বছরের গড়পড়তা ধরলে প্রতি বছর বাড়ী তৈরির খরচ তার আগের বছরের থেকে ৭%মত বেড়ে যাচ্ছে। এই ভাবে বর্তমান বাজার-দরের সাথে তার ৭ শতাংশ যোগ করে নিলে আগামী বছরের এবং তার সঙ্গে তার ৭ শতাংশ যোগ করলে আগামী বছরের পরের বছরের একটা আনুমানিক মূল্যমান পাওয়া যাবে। অঙ্কটা যে একেবারে নির্ভুল, পদ্ধতিটা একেবারে অভ্রান্ত—একথা কিছুতেই বলা যাবে না। ভবিষ্যতে নানারকম নতুন নতুন নির্মাণকৌশল ও মালমসলা আবিষ্কার হবে, পরিত্যক্ত হবে নানান সাবেকী পদ্ধতি ও মেটিরিয়াল। এ সবের প্রভাব বাড়ী তৈরির খরচার উপর পড়তে বাধ্য। দেশের ও সমাজের অর্থ নৈতিক উত্থান-পতন ও তার ছায়া ফেলবে আর পাঁচটা খরচের আইটেমের মত বাড়ী তৈরির খরচের উপরও। তাই শতাংশ বৃদ্ধির হার যুগযুগান্ত ধরে এক থাকবে না। হয় কমবে, নয় বাড়বে। কাঁটা কোন্ দিকে হেলবে তা কেবল ভবিষ্যতই জানে—এখন থেকে বলা মুস্কিল। তবু বই যখন লিখছি (তা সে ছাইপাঁশ ৮০ সালেই লেখা হোক বা ৮১ সালেই লেখা হোক) এবং পাঠক যখন নগদ মূল্যে ক্রয় করে তা পড়ছেন (তা সে পঠনপাঠন ৮৩ সালেই হোক আর ৮৪ সালেই হোক), তিনি স্বভাবতই দাবি করবেন বাড়ী গড়ার তাবৎ সুলুক সন্ধানের সাথে সাথে তার খাই-খরচেরও একটা হাল-হকিকৎ বাতাতে হবে। পাঠক তুমি আমাদের লক্ষ্মী, তুমি কি বেঠিক কথা বলতে পারো !!

অতএব চেষ্টা করছি বাড়ী বানানোর বিভিন্ন আইটেম রেটের একটা রামায়ণী চার্ট তৈরি করার। অর্থাৎ বর্তমান বাজারদরকে ওই শালিয়ানা ৭ শতাংশ-এর ফরমূলায় ফেলে ৮৪-৮৫ সালের একটি সম্ভাব্য বাজারদর তৈরি করলাম। আশা করি এটি শুভাশিস বাবুর সমালোচকসুলভ মুখ বন্ধ করতে সাহায্য করবে।

কাজের দফা বা Items of Work	শ্রমের দাম বা Labour Rate	মালমসলা সহ মোট খরচ বা Total Cost
(১) মাটি কাটা	% ঘন মিটারে ৪২০·০০	%ঘন মিটারে ৪২০·০০
(২) মাটি ভরা	ঐ ৩০০·০০	ঐ ৩০০·০০
(৩) এক ইটের সোলিং	প্রতি বর্গমিটারে ১·২৫	প্রতি বর্গ মিটারে ২০·০০

কাজের দফা বা Items of Work	শ্রমের দাম বা Labour Rate	মালমসলা সহ মোট খরচ বা Total Cost
(৪) ঝামা খোয়া যোগে লোহাহীন ঢালাই		
(ক) ১ : ৩ : ৬ ভাগে	প্রতি ঘনমিটারে ১৬·০০	প্রতি ঘনমিটারে ২৮৫·০০
(খ) ১ : ৪ : ৮ ভাগে	ঐ ১৬·০০	ঐ ২৫৭·০০
(৫) পাথরকুচি যোগে লোহা সহ ঢালাই		
(ক) ১ : ২ : ৪ ভাগে	ঐ ১৮০·০০	ঐ ২২০০·০০
(খ) ১ : ১½ : ৩ ভাগে	ঐ ১৮০·০০	ঐ ২৫০০·০
	লোহা ও ঢালাই পাটাতনের ব্যবহারের হেরফেরে এই দরদাম কম বেশী হতে পারে।	
(৬) ভিতের গাঁথনী (১ : ৬)	প্রতি ঘনমিটার ২৫·০০	প্রতি ঘনমিটার ২৩০·০০
(৭) উপরের গাঁথনী		
(ক) ১ : ৬ ভাগে	ঐ ৩০·০০	ঐ ২৩৫·০০
(খ) ১ : ৪ ভাগে	ঐ ৩৫·০০	ঐ ২৬৫·০০
(৮) পাতলা গাঁথনী		
(ক) ১২৫ মি. মি. (১ : ৪)	প্রতিবর্গমিটারে ১৮·০০	প্রতি বর্গমিটারে ৩২·০০
(খ) ৭৫ মি. মি. (১ : ৪)	ঐ ১৬·০০	ঐ ২৪·০০
(৯) কংক্রীট জালি	ঐ ২৫·০০	ঐ ৫৭·০০
(১০) ঐ সেলফ	ঐ ২২·০০	ঐ ৫৫·০০
(১১) প্লাস্টার সিমেন্ট যোগে ১২ মি. মি. পুরু (১ : ৬)		
(ক) দেয়ালে	ঐ ৩·০০	ঐ ১২·৩০
(খ) ছাদে	ঐ ৩·৫০	ঐ ১৪·০০
(১২) ১০০ মি. মি. পুরু জল ছাদ	ঐ ১৪·০০	ঐ ৬২·০০
(১৩) খাড়া ইটের মেঝে	প্রতি বর্গমিটারে ১২·০০	প্রতি বর্গমিটারে ৩৫·০০

কাজের দফা বা Items of work	শ্রমের দাম বা Labour Rate	মালমসলা সহ মোট খরচ বা Total Cost
(১৪) ২৫ মি. মি. পুরু সিমেন্টের মেঝে		
(ক) ছাই রং-এর	ঐ ১০·০০	ঐ ৩৫·০০
(খ) লাল রং-এর	ঐ ১০·০০	ঐ ৪০·০০
(১৫) মোজাইক মেঝে		
(ক) ঘরে জমান সিলভার গ্রে	ঐ ৩০·০০	ঐ ৬০·০০
(খ) টালি—ঐ	ঐ ২০·০০	ঐ ৮৫·০০
(গ) টালি—সাদা	ঐ ২০·০০	ঐ ১১০·০০
(১৬) গ্লেজড টালি	ঐ ২৫·০০	ঐ ১১৪·০০
(১৭) গ্রে মার্বেল	ঐ ৭০·০০	ঐ ৩৭৫·০০
(১৮) অ্যাসবেস্টাসের ছাদ		
(ক) ফ্রেমিং কাঠের	ঐ ০·৫০	ঐ ২৭·০
(খ) সিট ছাউনী	ঐ ১·০০	ঐ ৪·৩০
(১৯) জানলার গ্রীল	ঐ ৫.০০ (ফিটিং চার্জ)	ঐ ১১৫·০০
(২০) কোলাপসিব্‌ল গেট	ঐ ৮·০০	ঐ ১৮৫·০০
(২১) লোহার জানলা (গ্রীল সহ)	ঐ ৬·০০	ঐ ২৩০·০০
(২২) গ্রীল গেট	ঐ ৬·০০	ঐ ১৫০·০০
(২৩) শাল কাঠের ফ্রেম	ঘন মিটারে ২০০·০০	ঘনমিটারে ২৯০০·০০
(২৪) মেহগনির পাল্লা	বর্গমিটারে ৫·০০	বর্গমিটারে ৩৫০·০০
(২৫) ফ্লাসডোর পাল্লা	ঐ ৫·০০ (ফিটিং চার্জ)	ঐ ৩৭০·০০
(২৬) ১ কোট চুনকাম	ঐ ০·১০	ঐ ০·৩৮
(২৭) বাইরের সিমেন্ট রং তুই কোট	ঐ ০·৪৫	ঐ ১·২২
(২৮) সিন্থেটিক পেণ্ট	ঐ ১·০০	ঐ ৩·৭৫
(২৯) ১০০ মি. মি.সি. আই. পাইপ—	প্রতি মিটারে ১২·০০	প্রতিমিটারে ৯০·০০
(৩০) খোলা পাকা নর্দমা—	ঐ ১৫·০০	ঐ ৬২·০০

মুখ বন্ধ তো হল—বইয়ের এবং সমালোচকের, কিন্তু তাতে করে উদ্দেশ্য কি সফল হল? ওই যে শুভাশিস বাবু লিখেছিলেন 'ঠিকাদারের সাপ্লিমেণ্টারী আইটেমের প্রাসাদ গড়ার সম্ভাবনা রইল কিনা এসব খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয় একটা বিস্তারিত গাইড লাইন এ বই-এ অত্যন্ত কাম্য···যাঁরা পদে পদে··· ঠিকেদারের প্রবঞ্চনার শিকার হচ্ছেন শুধুমাত্র যথাযোগ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে, তাঁদের জন্য লেখক পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয় আলোকপাত করবেন বলে আশা রাখি।'—তার সবকিছু কি ঠেকানো গেল? না, স্রেফ বাজারদরের হকিকৎ মালুম থাকলেই সব কিছু সামলানো যাবে না। আরো বেশ কিছু কাছা-কোঁচা সামলে চলতে হবে। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। এমন কি শেয়ানাতর দেবতাদেরও ল্যাং খেলে মুক্ত-কচ্ছ হতে হয়। আর ঠিকেদার নামক সেই ক্যারাটে বিশারদটির ল্যাং আটকাতে হলে যেটি নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন তা হল 'কনট্রাক্ট-দলিল'। ব্যাপারটা বুঝতে চলুন যাত্রা করা যাক সুরলোকের দিকে···

২ এস. ডি. এ. বনাম ড. বি. চিটার্জি

সুরলোকে হুলুস্থুল কাণ্ড! দৈনিক দৈববাণীর নিউজ রুমে প্রায় দক্ষযজ্ঞ চলছে। আজ তিন দিন হল সংবাদিকদের নাওয়া-খাওয়া ঘুচে গেছে। ট্রাঙ্ক কলের চাপে শিবলোক, বিষ্ণুলোক ও ইন্দ্রলোকের মাঝে সমস্ত জংশন বিলকুল জ্যাম হয়ে গেছে। বিষ্ণুলোক ও শিবলোকের মাঝে ভেঙ্গে পড়া সাসপেনশন ব্রিজের চারপাশে কারফিউ জারি হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহত শিবের বাহন নন্দী ও ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে স্বর্গীয় সেন্ট্রাল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। অশ্বিনীকুমার (সিনিয়র) নিজে চার্জ নিয়েছেন আই. কে. ইউনিটের। গত বাহাত্তর ঘণ্টা একটানা স্ক্যানারের দিকে চোখ রেখে বসে আছেন ইউনিটের কন্ট্রোল স্টেশনে।

● **ব্যাপারটা কি ?**

বিষ্ণুলোক ও শিবলোকের মাঝে যাতায়াত সহজতর করার উদ্দেশ্যে সুরলোক ডেভালাপমেন্ট অথরিটি বা সংক্ষেপে এস. ডি. এ-এর পক্ষ থেকে ডাইরেক্টর জেনারেল অব্ প্ল্যানিং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা একটি প্রিকাস্ট কংক্রীটের সাসপেনশন ব্রীজের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই ব্রীজের ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ৪২০ নং, অধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০০ এর মেসার্স গ্যাঁড়াকল বিল্ডারস্‌কে। মেসার্স গ্যাঁড়াকল বিল্ডার্স-এর প্রোপ্রাইটার (হিংসুটে নিন্দুকরা বলে মিসএপ্রপ্রিয়েটার!) ড. বাটপাড় চিটার্জি বা সংক্ষেপে বি. চিট্ আবুধাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইড-ডি. (পয়জার হাপিস-ই ডাগদার বা সোজা বাংলায় জুতো চুরির পণ্ডিত।); অধর্মতলায় আকাশচুম্বী বাটপাড় ভবনের ৩০ তলার ছাদে তাঁর রেজিস্টার্ড অফিস; প্রিকাস্ট কংক্রীটের কাজে তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ বা তাঁর নিজের ভাষায় টেকনোক্র্যাট।

এ হেন গ্যাঁড়াকল বিল্ডার্সের বিষ্ণুলোক থেকে শিবলোকগামী হাইওয়ের উপর তৈরি নয়নাভিরাম ১নং সুরসেতুর উদ্বোধন করতে নন্দীর পিঠে চেপে এলেন দেবাদিদেব। প্রধান অতিথি ঐরাবতবাহী দেবরাজ ইন্দ্র। সেভেন হেভেন ব্যাণ্ড পার্টির বাজনার তালে তালে এগুতে লাগল—মহাষণ্ড নন্দী, মহা হস্তী ঐরাবত। তার পিছনে স্ব-বাহন বিশ্বকর্মা ও এস. ডি. এ.র অন্যান্য অফিসাররা। শেষে তেত্রিশ কোটি দেবতার বিপুল মিছিল। প্রসেশান যখন প্রায় ব্রীজের মাঝামাঝি এসেছে···আকাশ থেকে গন্ধর্বরা বস্তা বস্তা অপরাজিতার পাপড়ি ছুঁড়ে ফেলছেন শিব ঠাকুরের মাথায়···ব্যাণ্ডে বাজছে 'ভোলেবাবা পার করেগা' ঠিক সেই সময়! এক গগনবিদারী শব্দে দেড়শ ফুট উপত্যকার নীচে ভেঙ্গে পড়ল ব্রীজের মাঝখানের স্প্যানটি। নন্দী ঐরাবতের সম্মিলিত পায়ের চাপের তুলনায় ওটি বড়ই ক্ষীণ প্রমাণিত হল। ঐরাবত পড়তে পড়তে

কোনরকমে শুঁড় বাড়িয়ে ধরে ফেল্লে ব্রীজের ৩ নং পিলপের মাথাটা। তার শুঁড়ের ৯২টি হাড় সরে গেলেও বেঁচে গেলেন ইন্দ্রদেব। হাওদা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়লেন পিলপের উপর। নন্দী আটকে গেছল ৪নং পিলপে থেকে বেরিয়ে আসা ব্রাকেটে। তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া মহাদেবের জটা ধরে পিলপের উপর তুলে আনল ভৃঙ্গী। ইতিমধ্যে নিজের হাতি ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন দেবশিল্পী। শোনা যাচ্ছে তিনি ব্রহ্মার আদালতে নাকি আবেদন করেছেন অ্যান্টিসিপেটারী বেলের।

প্রাথমিক হকচকানিটা কাটতেই শুরু হল হম্বিতম্বি, দৈব তর্জন-গর্জন। দৈনিক 'দৈববাণী'র পাতায় বেরুলো গরম সম্পাদকীয় : 'দুর্ঘটনার পূর্ণ তদন্ত চাই।' একই দাবী নিয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার, রাস্তায় রাস্তায় শিবঠাকুরের চেলাদের তিড়িং বিড়িং মিছিল। পয়লা চোটে দেবরাজ একটু ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। নামকরা ফেরেব্বাজ বি. চিটের কেলেঙ্কারী নিয়ে তদন্ত কমিশন চালাবার দুঃসাহস কোন দেবদেবীরই ছিল না। কাজেই কমিশন বসাবার লোক পাচ্ছিলেন না ইন্দ্রদেব। শেষ পর্যন্ত নারদঠাকুর খবর আনলেন। কোলকাতায় খুব হাবা-গোবা প্রায়-বেকার এক স্থপতি আছে। বলতে গেলে কোলকাতার সবচেয়ে ওঁচা আর্কিটেক্ট (এবং যেহেতু কোলকাতা পৃথিবীর সব চেয়ে ওঁচা শহর, বলা যেতে পারে পৃথিবীর সবচেয়ে ওঁচা আর্কিটেক্ট), মহা পেটুক। অমৃত ভাণ্ডের লোভটোভ দেখালে কান ধরে যা খুশী করিয়ে নেওয়া যায়। ইন্দ্রদেবের টেলেক্স পেয়েই যমরাজ জারী করলেন গ্রেফতারী পরোয়ানা। রাত্রি তৃতীয় যামে যমদূত হাতকড়া খুলে দিতেই কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে উঠে বসলেন ভয়ে মৃতপ্রায় প্রথম স্বর্গীয় ব্রীজ কেলেঙ্কারী কমিশনের মানবিক সভাপতি দুর্গা বোস।

প্রাথমিক তদন্তে খুঁটিয়ে দেখলাম বি. চিটের ঘাড়ে বিশেষ কোন দায়িত্ব চাপানো যাচ্ছে না। স্বর্গরাজ্যের সবই কেমন ঢিলে-ঢালা কাছা-খোলা ব্যাপার। এত লক্ষ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট। অথচ তার কনট্রাক্ট দেয়ার ব্যাপারটা সারা হয়েছে মৌখিকভাবে। বি. চিট ১০০১টি আবদার করেছেন বর প্রার্থনার স্টাইলে। ডাইরেক্টর জেনারেল এক কথায় 'তথাস্তু' বলে সেরে দিয়েছেন মৌখিক কনট্রাক্ট। সাক্ষীও তেমনি। এস. ডি. এ.-র তরফে ডাইরেক্টার জেনারেলের বাহন হাতি এবং বি. চিটের তরফে তার পি.এ. মিস ছুছুন্দরী বাই। ঘড়া ঘড়া কংক্রীট ঢেলেছেন গ্যাঁড়াকল কনস্ট্রাকশন। অথচ কোন রেকর্ড নেই কিভাগে মেশানো হয়েছে সিমেন্ট, গচ্ছা গেছে কত মেগাটন লোহা। ঘড়া ঘড়া মোহর ঢেলেছেন কুবের অথচ বালাই নেই কোন রসিদ বা ভাউচারের। পুরো ব্যাপারটাই এলোমেলো, ধোঁয়াটে, ঘোলাটে, আবছা।

একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হল ওঁচা আর্কিটেক্টকে। ধরে ধরে বোঝাতে শুরু করলাম দেবতাদের :

মালিক-ঠিকেদারের ভুল বোঝাবুঝি, মন কষাকষির মূল কারণ হল পাঁচ দফা :

এক নম্বর : যে কোন কাজের, তা সে ১ নং স্বুর সেতুই হোক আর নিকুঞ্জবাবুর কোন্নগরী কুঁড়ে ঘরই হোক, ঠিকেদারকে দিয়ে তৈরি করাতে হলে সর্বাগ্রে দরকার কাজের একটি নিখুঁত দফাওয়ারী দরপত্রে উভয়ের লিখিত সম্মতি। এই দরপত্রে প্রতিটি দফা (Item)-এর

মালমসলা ও করণ পদ্ধতির পূর্ণ বিবরণী (Specification of material and workmanship) এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি দফার নিভুর্ল পরিমাপ (accurate Quantities) থাকা একান্তই দরকার। এর মধ্যে কোন উল্টোপাল্টা ভুলভাল থেকে গেলে কাজের পিঠে মনকষাকষি, তর্ক, আস্তিন গুটানো, পিতৃপুরুষদের স্মরণ করা থেকে ফৌজদারী ও শেষমেশ শ্রীঘর বাস সবই সম্ভব। এই দরপত্রের নিখুঁত বর্ণনা ও পরিমাপ যোগানোর দায়িত্ব মালিকপক্ষের। মালিকপক্ষ এটি কেমন করে পাবেন ? এই খানেই কেরামতি চৌকশ আর্কিটেক্টের। আপনার বাস্তুকার, নকশাকার বা স্থপতি যদি উচ্চমানের হন তা হলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আপনি খাঁটি জিনিসটিই পাচ্ছেন। উচ্চমানের খ্যাতিমান স্থপতির দক্ষিণা নিশ্চয়ই বেশী। তবু এটা দিয়ে নিখুঁত দরপত্রটি জোগাড় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দু নম্বর ঃ ঠিকেদার দরপত্র বা টেণ্ডারে কাজ পাবার প্রতিযোগিতায় অনেক সময় জেনে-শুনে অসম্ভব রকম কম দর লিখে দেন। ঠিকেদার কিছু পি. সি. সরকার নন। অলৌকিক কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে অসম্ভব রকম কম দরে কাজ তুলতে হলে ওঁকে গ্যাঁড়াকল কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর মত ছলচাতুরি ফাঁকিবাজির রাস্তা ধরতেই হবে যার ফলে আপনার বাড়ীর ছাদ সুর সেতুর মত ধসে পড়তে পারে। ফাঁকিবাজির ব্যাপারটা যখন এতই অবশ্যম্ভাবী তখন ঝগড়া-ঝামেলা এড়াতে উচিত খুব কম দরে গোড়াতেই প্রলুব্ধ বা সম্মত না হওয়া।

তিন নম্বর ঃ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাজ আরম্ভ হওয়ার পর ঘন ঘন পরিবর্তন হয় প্ল্যান ও স্পেসিফিকেশনের। অনেক সময় এ জন্য কিছু কিছু তৈরী অংশেও কাটছাঁট, ভাঙ্গা চোরা করতে হয়। ফলং ঠিকেদারের ক্ষতি, মিস্ত্রিদের বিরক্তি এবং কাজের কম মজবুতি। এর উপর অনেক সময় তাড়াতাড়িতে এই সব পরিবর্তনের উপযুক্ত রেকর্ড, লিখিত নির্দেশ বা পরিবর্তিত নকশা (Revised Drawing) রাখা হয় না। পুরো পরিবর্তনটাই ঘটে বিশ্বকর্মার স্টাইলে 'তথাস্তু' বলে। এক্ষেত্রে বিবাদ-বিসংবাদ হতে বাধ্য। বি. চিটের মত কন্ট্রাক্টার হলে এই গোলমেলে পরিস্থিতির সুযোগে কিছু অন্যায় মুনাফা লুটে নিতে চেষ্টা করবেই।

চার নম্বর ঃ এই বইয়ের প্রথম খণ্ডটি যদি পড়ে থাকেন (যদি না পড়ে থাকেন তাহলে গরীব লেখকের উপর অবিচার করেছেন—অবিলম্বে কিনে ফেলুন এক কপি) তা হলে হয়ত মনে আছে জঙ্গীপুরের শ্রীদিগ্বিজয় দত্ত বিনা নকশায় বাড়ী করতে গিয়ে দাবড়ানি খেয়েছিলেন তাঁর ঠিকেদার রহমন মিস্ত্রির কাছে।

ঠিক এতটা বেকুফী সচরাচর দেখা না গেলেও প্রায়শই দেখা যায়, কাজ শুরু করার পরও ইলেকট্রিক্যাল লে আউট, সিঁড়ির বা স্যানিটারী লে আউট, দরজা-জানলার ডিটেল ড্রইং অথবা বারান্দার 'রেলিং, জালির ডিজাইন বা দেয়াল আলমারীর মাপ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত ঠিক সময় মত না পৌঁছানোর দরুন কাজে নানান ছোটখাট ভুল বা দেরী হয়ে যায়। এতে চিড় খায় মালিক ঠিকেদার সম্পর্ক। সময়মত এগুলি কাজের পিঠে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব মালিক বা তাঁর স্থপতির।

পাঁচ নম্বর : কাজ করতে করতে দু পাঁচটা দফা এসেই যায় যা দফাওয়ারী দরপত্রের বাইরে। ফলে এই সব দফার বিল কি দরে করা হবে সে সম্বন্ধে একটা যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে হয় মালিক এবং ঠিকেদারকে। যে কোন এক পক্ষের গাফিলতিতে এই সিদ্ধান্ত যদি যৌথভাবে না নেওয়া হয় তা হলে দু ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—এক, বিল করা যাবে না, দুই, ঠিকেদার এক-তরফা ঠিক করা নিজের মতলব মাফিক রেট বসিয়ে বিল করবে। উভয় ক্ষেত্রেই পারস্পরিক স্বার্থের বিরোধে একটা ধুন্দুমার লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেতে খুব বেশী সময় লাগে না।

এই সব কারণে মালিক-কনট্রাক্টারে বিরোধ বাধলে, দোষটা যারই হোক, ক্ষতিটা কিন্তু হয় দু-পক্ষেরই। কাজেই দু পক্ষেরই উচিত এ সব ঝগড়া-কাজিয়া যতটা পারা যায় এড়িয়ে চলা। এসব ঝগড়া-কাজিয়া এড়াতে দরকার চার দফা সাবধানতা :

পয়লা দফা : কাজ শুরু করার আগেই মালমসলা এবং করণ-পদ্ধতির পূর্ণ বিবরণী, সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিসের নকশা এবং নিখুঁততম দফাওয়ারী সর্বসম্মত দরপত্র সংগ্রহ ও রক্ষণের কাজ শেষ করে রাখা (গুণী পাঠক স্মরণ করবেন প্রথম খণ্ডে রহমনের দু নম্বর হাঁক 'ইষ্টিমেট কুথায়?') এগুলি হাতের কাছে মজুত থাকলে ঠিকেদারও যেমন পারবে না মালিককে ঠকাতে; মালিকও তেমনি নিশ্চিন্ত মনে চট করে ঠিকেদারের বিল-ফিল মিটিয়ে দিতে পারবেন। ফলং কাজ উঠবে তরতর করে। উভয়ের মিষ্টি সম্পর্ক দেখে লোকে ভাববে আপনারা বুঝি মামা ভাগ্নে!

দুসরা দফা : 'শতং লিখ মা বদ'। সংস্কৃত আপ্তবাক্যটা স্রেফ উল্টে যায় ঠিকেদারকে কাজ দেয়ার বেলায়। যা কিছু চুক্তি, সব লেখাপড়া করে করতে হবে। কোন কিছুই মৌখিক নয়। দেখলেন তো, মুখে মুখে তথাস্তু করতে গিয়ে বিশ্বকর্মার মত হাতিপোষা দেবতাকেও কি নাকানি-চোবানিটাই না খেতে হল। অতএব সব কিছুই চাই কাগজে-কলমে।

লিখিত চুক্তিপত্রটি, উচিত আইন-অভিজ্ঞ কোন বাস্তুকার বা স্থপতিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নেওয়া যাতে তার মধ্যে কোন কিছু অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, ঘোলাটে, দ্ব্যর্থক বা অর্থহীন না থাকে।

চুক্তির শর্তগুলি হওয়া দরকার সহজ, সরল, পরিষ্কার, নিরপেক্ষ, ন্যায়সম্মত ও চিরায়ত প্রথা অনুযায়ী। (এখানে একটা মজার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প বলি। আমাদের অফিস থেকে পরিকল্পিত ব্রাইট স্ট্রীটের জনৈক মিঃ আনন্দপ্রকাশের বাড়ীর কাজ দেয়া হয়েছিল আমাদের পূর্ব-পরিচিত এক তরুণ বি. ই. পাস কনট্রাক্টার মিঃ হাণ্ডাকে। মিঃ হাণ্ডা যখন প্রথম বিল পেশ করলেন, দেখা গেল সব দেয়ালগুলি (যেগুলি নকশায় ১০ ইঞ্চি দেখানো আছে) এর চওড়া ১১ ইঞ্চি ধরে বিল করেছেন। কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি বল্লেন, এগুলি সবই কাজের জায়গায় মাপ করে করা হয়েছে কারণ তাঁর চুক্তিপত্রেই লেখা আছে Measurements are to be verified at site (মাপগুলি কাজের জায়গায় যাচাই করে নিতে হবে)। প্রকৃতপক্ষে দুটি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ইটের মাঝে মসলা দিয়ে গাঁথা দেয়াল কমপক্ষেও সাড়ে দশ ইঞ্চি হবেই—যদিও তাকে চলতি ভাষায় বলা হয় ১০ ইঞ্চি চওড়া দেয়াল এবং প্রথাগতভাবে বিল করার সময়ও তাকে ১০ ইঞ্চি চওড়া বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু হাণ্ডা সাহেব আমাদেরই তৈরি করে দেওয়া কনট্রাক্টের শর্ত ধরে আমাদেরই ল্যাং মারতে চাইছেন। দেয়ালগুলিকে ১১ ইঞ্চি পুরু ধরে নিলে তাঁর বাড়তি বিলের পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা। শান্তিপ্রিয় আনন্দপ্রকাশজী এই টাকাটা দিয়ে দিতে রাজী থাকলেও, ব্যাপারটা আমাদের আত্ম-সম্মানে ঘা দিয়েছিল এবং তিনটি বিনিদ্র রজনী কনট্রাক্টটিকে তন্নতন্ন করে মুখস্থ করে শেষ পর্যন্ত হাণ্ডা সাহেবকে ঘায়েল করতে পেরেছিলাম আমরা। কনট্রাক্টের আর একটি শর্ত (The contractor must execute the work exactly as per drawing— নকশায় ঠিক যেমনটি দেখান আছে, ঠিকেদার ঠিক তেমনটি করে কাজ করতে বাধ্য) আমাদের যুগিয়েছিল মোক্ষম অস্ত্রটি। আমাদের দেয় সার্টিফিকেটে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে চুক্তিপত্রের প্রথম শর্তানুযায়ী ওই সাড়ে ছয় হাজার টাকার বাড়তি দাবী খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবেই হাণ্ডা সাহেবের প্রাপ্য। তবে নকশায় উল্লেখিত ১০ ইঞ্চি দেওয়াল-গুলি ১১ ইঞ্চি পুরু করে গেঁথে হাণ্ডা সাহেব চুক্তির দ্বিতীয় শর্তটি ভঙ্গ করেছেন। অতএব এই দেয়ালগুলি ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় ১০ ইঞ্চি পুরু করে গাঁথতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এবং যেহেতু আমাদের সন্দেহ যে নবনির্মিত দেয়ালগুলির মোট মাপে হেরফের হবে, কাজেই এই বিলটি দেয়াল নির্মিত হলে পর নতুন মাপ সহ নতুন ভাবে পেশ করা হোক। এই 'ঘুরিয়ে নাক দেখানো' সার্টিফিকেট পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন হাণ্ডা সাহেব। নতুন করে দেয়ালগুলি গাঁথতে তাঁর বাড়তি খরচ হত প্রায় চল্লিশ হাজারের মত। তাও দশ ইঞ্চি পুরু করে গাঁথা ছিল অসম্ভব ; অথচ না গাঁথলেও নিজের সই-করা চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গের দায়ে দায়ী হতেন তিনি যার ফলে পুরো কাজটাই খোয়াতে হত

তাঁকে। এগোলেও নির্বংশ, পিছোলেও নির্বংশ। তারপর? (তারপর মশাই, সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ রক্তিম গৌরাভ ৯২ কেজি পাঞ্জাবী তনয়ের ৪৬ কেজি ধনুরাকৃতি কেলটিশ বাঙ্গালী পুঁটিমাছের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে "হুজুর মাই বাপ" বলার বহর দেখলে বুঝতেন, একবার নয়, আমরা বার বার সিংহল দ্বীপ জয় করেছি।)

তিসরা দফা : অনেক মালিক এবং স্থপতির একটা বদ অভ্যাস আছে কাজের জায়গায় এসে ক্ষণে ক্ষণে নানান ধরনের মৌখিক নির্দেশ দিয়ে যান নকশার এবং করণ-পদ্ধতির পরিবর্তন করে। এই মৌখিক নির্দেশগুলি উভয় পক্ষের পক্ষেই বিপজ্জনক। অনেক সময় মালিক ও স্থপতি এই সব নির্দেশ দেওয়ার কথা ভুলে যান এবং নকশা থেকে বিচ্যুতির দায়ে দায়ী করেন ঠিকেদারকে। এর আবার ঠিক উল্টোটাও ঘটতে পারে। যেহেতু প্রদত্ত নির্দেশাবলীর কোন তালিকা থাকে না, কনট্রাক্টার তার প্রয়োজন ও সুবিধা মত পরিবর্তন করে তা মালিক/স্থপতি/বাস্তুকারের নির্দেশ বলে চালিয়ে দেয়। প্রত্যেক কাজের জায়গায় একটি নির্দেশ খাতা বা ইনস্ট্রাকশন বুক রাখা দরকার এবং প্রতিটি নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত যাতে তারিখ সহ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাতে লিপিবদ্ধ করা হয় সেদিকে প্রত্যেকেরই নজর রাখা একান্ত কর্তব্য।

চৌথা দফা : এত সব করেও যদি বিভেদ এড়ানো না যায় তা হলে গোড়াতেই একজন নিরপেক্ষ ও যোগ্য লোককে সালিশ (**Arbitrator**) মেনে উভয় পক্ষের ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়া দরকার। সালিশের যাতে আইন ও ইঞ্জিনিয়ারীং বাবদ পুরো জানকারী ও অভিজ্ঞতা থাকে সেটা দেখে নেওয়া বিশেষ দরকার।

কোর্টঘর করার থেকে এ ধরনের সালিশীর মারফত কাজিয়া মেটানোর সুবিধা বহুতর : (১) কম সময়ে (২) সস্তায় ও (৩) প্রযুক্তিগত ভাবে সুষ্ঠুতর উপায়ে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই কারণে চুক্তিপত্রে সালিশী মানার ব্যাপারে একটি শর্ত গোড়া থেকেই রাখা প্রয়োজন।

মালিকের পক্ষে নিচের কাজগুলি ঠিকেদারের ক্ষতির কারণ হতে পারে :

(ক) সহসা কাজ বন্ধ করে দেওয়া বা শুরু না হতে দেওয়া ;

(খ) চট করে ও পাকাপাকি ভাবে কাজের জায়গার ভার ঠিকেদারের হাতে তুলে না দেওয়া ;

(গ) জল, আলো, নকশা ইত্যাদি ঠিক সময় মত যোগান না দেওয়া ;

(ঘ) চলতি বিলগুলির প্রাপ্য পয়সা মিটাতে অযথা দেরী করা।

কন্ট্রাক্টারের পক্ষে দোষণীয় কাজগুলি হচ্ছে :

(ক) সময় ও শর্ত মাফিক কাজগুলি শেষ না করা ;

(খ) খারাপ মাল-মসলা সরবরাহ ও করণ-পদ্ধতিতে ফাঁকিবাজি করা ;

(গ) ছলছুতোয় কাজের নিত্যনতুন দফা সৃষ্টি করে রেট ও খরচ বাড়ানো।

উভয়তঃই যদি এই সব দুষ্ট মতলব পরিহার করতে পারা যায় তা হলে কাজটি সহজ, সুষ্ঠু ও সফল হতে বাধ্য। এই সাফল্যের বাবদে সবচেয়ে বেশী যেটা দরকার সেটি হচ্ছে নিরপেক্ষ অথচ কার্যকরী শর্ত সমেত একটি নিখুঁত চুক্তিপত্র। জিনিসটা বোঝাতে (সুকুমারী ভাষায়, 'আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব/না বুঝবি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব।') এখানে একটি সাধারণ চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর উদাহরণ দিলাম। বিভিন্ন কাজে শর্তাবলীর হেরফের হবেই—কাজের ধরন, প্রয়োজন, আর্থিক সংগতি, কায়িক সংগতি—সব বিচার করে। কাজেই প্রতিটি চুক্তির সময় উচিত, বিশেষজ্ঞ দিয়ে ওই কাজটির উপযুক্ত একটি চুক্তিপত্র রচনা করিয়ে নেওয়া।

এই শর্তগুলি ভারতীয় স্থপতি সংঘের প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত চুক্তিপত্রের ফর্মা থেকে নেওয়া ঃ

(১) ঠিকেদার এই চুক্তি মোতাবেক স্থপতির ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত, নির্দেশ মানিয়া লইয়া কার্য সম্পাদন করিবে যাহাতে স্থপতির সন্তুষ্টি হওয়া প্রয়োজন। স্থপতি কাজের প্রয়োজনানুসারে সময় সময় বাড়তি নকশা ও লিখিত নির্দেশাবলী দিয়া ঠিকেদারের কার্যের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(২) সুষ্ঠু কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও সহায়ক মাল সরবরাহ করিতে ঠিকেদার বাধ্য থাকিবে।

(৩) নকশা বা দরপত্রের মাপের সারণিতে কোন ভুল, ফাঁক বা অসঙ্গতি থাকিলে, ঠিকেদারকে তৎক্ষণাৎ তাহা স্থপতির নজরে আনিয়া সংশোধন করাইয়া লইতে হইবে। ঠিকেদার চুক্তিতে সই করিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে সে ওই চুক্তিপত্রের অন্তর্ভুক্ত নকশা ও বিভিন্ন সারণির ত্রুটিহীনতা সম্পর্কে যাচাই করিয়া লইয়াছে। পরে এই ব্যাপারে ঠিকেদারের কোন ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

(৪) হুবহু নকশা মাফিক কার্য সম্পাদন করিতে ঠিকেদার বাধ্য থাকিবে। এই বিষয়ে কোন ক্রমে ভুল-চুক হইলে ঠিকেদার স্বীয় ব্যয়ে তাহা এমনভাবে সারাইয়া দিবে যাহাতে স্থপতির সন্তোষ বিধান হয়।

(৫) ঠিকেদার কর্তৃক সংগৃহীত মালমসলা ও তাহার কৃত করণ-পদ্ধতির মান চুক্তিপত্রের বিবরণীর অনুরূপ হওয়া চাই এবং সেগুলি যাহাতে স্থপতির সন্তোষ বিধান করিতে পারে সে বিষয়ে ঠিকেদারের নিশ্চিত হওয়া দরকার।

(৬) চুক্তিভুক্ত সকল কার্যের জন্য ঠিকেদার ব্যক্তিগত বা/এবং সংস্থাগতভাবে দায়ী থাকিবে। তাহার এই দায়িত্ব কাল শেষ হইবার পরও চুক্তিতে উল্লেখিত 'পরিচর্যামূলক দায়িত্বের কাল' শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ওই সময়ের মধ্যে কোন খুঁত বা ভুল দেখা দিলে তা ঠিকেদার নিজ ব্যয়ে এ ভাবে মেরামত করিয়া দিবে যাহাতে স্থপতির সন্তোষ বিধান হয়।

(৭) স্থপতির লিখিত নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঠিকেদার তার অধীনস্থ যে কোন কর্মচারীকে কাজের স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৮) ঠিকেদার স্থপতি বা তাঁহার নিয়োজিত প্রতিনিধিকে যে কোন উপযুক্ত সময় তাহার কাজের জায়গা, অফিস, কারখানা ও গুদাম পরিদর্শন করিতে দিতে বাধ্য থাকিবে।

(৯) ঠিকেদার কাজের কোন অংশ তাঁহার অধীনস্থ কোন উপ-ঠিকেদারের মারফত করাইতে চাহিলে তাহাকে অগ্রে স্থপতির লিখিত অনুমতি সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন ক্রমেই এই প্রকার উপ-ঠিকেদারি নিয়োগ মারফত ঠিকেদার চুক্তিগত দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না।

(১০) স্থপতির অনুমতি বিনা ঠিকেদার নকশাদি হইতে কোন রূপ ভিন্নতর কাজ করিবে না। যদি সুষ্ঠু কার্য সম্পাদনের জন্য কোন ভিন্নতর কার্যের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে ঠিকেদার অগ্রে স্থপতির লিখিত অনুমতি সংগ্রহ করিয়া তবে ওইরূপ কাজে হস্তার্পণ করিবে।

(১১) দরপত্রের বিভিন্ন দফার মাপগুলি ভারতীয় স্থপতি সংঘের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে (এই অধ্যায়ের শেষে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)।

(১২) স্থপতির নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঠিকেদার কৃত কার্যের মাপ স্থপতির বা তাঁহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লইয়া তাহা লিপিবদ্ধ রূপে স্থপতিকে অর্পণ করিবে। এই লিপিবদ্ধ মাপে ঠিকেদার তারিখ সহ তাহার সই দিতে বাধ্য থাকিবে। ঠিকেদার এই নির্দেশের অন্যথা করিলে স্থপতির গৃহীত মাপকেই সঠিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(১৩) দরপত্রে উল্লেখিত নাই এইরূপ দফার দর স্থপতি ঠিকেদারের সহিত আলোচনা করিয়া ঠিক করিবেন। এই কাজে স্থপতিকে সহায়তা করিতে তাঁহার প্রয়োজন ও নির্দেশ মাফিক ঠিকেদার তাহার খাতাপত্র, মাল কেনার চালান, রসিদ ও কর্মচারীদের হাজিরা খাতা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ স্থপতির সমীপে হাজির করিতে বাধ্য থাকিবে।

(১৪) কাজের জায়গায় মজুত অব্যবহৃত মালমসলা, যন্ত্রপাতি স্থপতির বিনা অনুমতিতে ঠিকেদার স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না।

(১৫) কৃত কাজের মানে স্থপতি সন্তুষ্ট না হইলে, উহা ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্মাণ করতঃ স্থপতির সন্তোষ বিধানে ঠিকেদার বাধ্য থাকিবে।

(১৬) এই চুক্তিপত্রের শেষে যুক্ত সংযোজন পত্রে 'দায়বদ্ধ কাল' বলিয়া উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নির্মিত কাজে কোন দোষ বা বিকৃতি দেখা দিলে ঠিকেদার তাহার জন্য দায়ী থাকিবে এবং নিজ ব্যয়ে উহা মেরামত করাইয়া দিবে। না দিলে মালিক স্থপতির লিখিত সম্মতি সাপেক্ষে উহা মেরামত করাইয়া লইবেন এবং মেরামতের খরচ ঠিকেদারের প্রাপ্য হইতে উশুল করিয়া লইবেন। এই প্রকার উশুল যাহাতে সম্ভব হয় চুক্তিপত্রের শেষে প্রদত্ত সংযোজন পত্রে উল্লেখিত জামানতের অংশ কাটিয়া বাকি বিলের টাকা দিতে হইবে। 'জামানত অংশ' দায়বদ্ধ কাল পার হইলেই দেয়া যাইবে। কবে হইতে দায়বদ্ধ কাল শুরু হইবে তাহা স্থপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হইবে।

(১৭) মালিক স্থপতির সম্মতি সাপেক্ষে কাজের জায়গায় একই ধরনের বা অন্য ধরনের কাজের দফাগুলি অংশতঃ বা সর্বতোভাবে অন্য ঠিকেদারকে দিয়া করাইতে পারেন এবং এই ব্যাপারে ঠিকেদারের মত ভিন্ন হইলে সে স্থপতির মারফত এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করিতে পারিবে কিন্তু কোনক্রমেই কাজের জায়গায় এমন কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না যাহাতে উপরোক্ত অন্য ঠিকেদারের পক্ষে কাজ করা শক্ত বা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(১৮) ঠিকেদার তাহার অধীনস্থ সমস্ত কর্মচারীকে নিজ খরচায় যে কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা আঘাতের বিরুদ্ধে বীমা করাইয়া রাখিবে। এই শর্ত কেবল মাত্র ঠিকেদারের বেতনভুক কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে না। ঠিকেদারের অধস্তন ঠিকেদার বা উপ-ঠিকেদারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এই রূপ কোন ক্ষতির জন্য মালিক বা স্থপতি কোন প্রকারেই দায়ী হইবেন না। কাজের জায়গায় অধিক মূল্যের দাহ্য পদার্থ থাকিলে ঠিকেদারকে নিজ ব্যয়ে অগ্নিবীমাও করাইয়া রাখিতে হইবে।

(১৯) সংযোজন পত্রে উল্লেখিত কার্য সমাপ্তির কাল চুক্তিপত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ঠিকেদার ওই সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করিতে বাধ্য থাকিবে। ওই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হইলে স্থপতি বিলম্বের প্রতি দিন পঞ্চাশ টাকা হারে ঠিকেদারের প্রাপ্য হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কাটিয়া লইবেন। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা এমন কোন ঘটনা যাহার উপর ঠিকেদারের কোন হাত নাই তদ্বারা এইরূপ বিলম্ব ঘটিলে, ঠিকেদারকে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দায়ী করা যাইবে না। এই ব্যাপারে স্থপতি বিচার করিয়া যাহা স্থির করিবেন, মালিক ও ঠিকেদার তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(২০) চুক্তিবদ্ধ হইবার পর যদি ঠিকেদার—

(ক) দেউলিয়া ঘোষিত হয়, বা

(খ) ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী কারারুদ্ধ হয়, বা

(গ) আদালতের নির্দেশে কারবার গুটাইতে অথবা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, বা

(ঘ) সময় মত চুক্তিপত্র অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিতে অপারগ হয়, বা

(ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে স্থপতি বা মালিকের হুঁশিয়ারী না মানিয়া কাজে অবহেলা করে, বা

(চ) চুক্তিবদ্ধ কাজ বিনা অনুমোদনে অপর ঠিকেদার বা উপ-ঠিকেদারকে সমর্পণ করে তা হইলে স্থপতি সাত দিনের নোটিসে চুক্তিপত্র খারিজ করিয়া দিতে পারিবেন।

(২১) ঠিকেদার সময় সময় স্থপতির মারফত সম্পাদিত কাজের দরুন বিল পেশ করিবে। স্থপতি ওই বিলের মাপ ও দর সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া উহা পাস করিলে মালিক জামানতের অংশ কাটিয়া বাকি প্রাপ্য ঠিকেদারকে ১৫ দিনের মধ্যে মিটাইয়া দিবেন। প্রাপ্য পাইতে দেরী হইলে স্থপতির অনুমতি সাপেক্ষে ঠিকেদার সংযোজন পত্রের নির্ধারিত হারে প্রাপ্যের উপর সুদ দাবী করিবে ও মালিক তাহা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২২) এই চুক্তিপত্রের বিষয়ভুক্ত সর্বপ্রকারের মতানৈক্য, বিভেদ বা মালিক ও ঠিকেদারের মধ্যে কলহ প্রথমতঃ স্থপতির মাধ্যমে মিটাইবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হইবে এবং দুই পক্ষই স্থপতির রায় মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। এই রায়ের বিরুদ্ধে কোন পক্ষের যদি কোন ক্ষোভ থাকে তা হইলে ওই পক্ষ স্থপতির মারফত লিখিত নোটিসে সালিশীর ব্যবস্থা অনুরোধ করিবে। উভয় পক্ষ সম্মত হইলে একজন সালিশী বা ঐকমত্য না হইলে দুই পক্ষে দুইজন সালিশী নির্বাচন করিতে হইবে। সালিশীরা ভারতীয় স্থপতি সংঘের ফেলো (Fellow) হইবেন। সালিশীরা প্রয়োজন বোধ করিলে যৌথভাবে একজন আম্পায়ার নির্বাচন করিবেন এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য হইলে আম্পায়ারের ভোটে প্রতিষ্ঠিত মত মানিয়া লইবেন। এইভাবে সালিশীরা ভারতীয় আরবিট্রেশান আইন অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করিয়া সর্বপ্রকার ঝগড়া মিটাইবেন। উভয় পক্ষ বিনা ওজর-আপত্তিতে সালিশীদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

[বুঝতে পাচ্ছি, কেতাবী ভাষার ওজনে পাঠকদের প্রায় দমবন্ধ হবার জোগাড়। নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছেন এমন ঘরোয়া লেখকের এ আবার কি বিদ্যাসাগরী রোগে ধরল? কি করব বলুন। ব্যাপারটা পুরোপুরি আইনের আওতায় পড়ে। এবং আইন মানেই তো মোটা মোটা কেতাব ভর্তি সাধু ভাষার মারপ্যাঁচ! 'যে ফুলে যে পূজো হয়' আর কি। কলেজে যার কানে সকাল সন্ধ্যে আওড়াতেন, 'তুমি আমার, আমি তোমার' অগ্নিসাক্ষী অনুষ্ঠানে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বলেননি 'যত্র তিষ্ঠতি তব হৃদয়ং, তত্র তিষ্ঠতি মম হৃদয়ং···ইত্যাদিং ইত্যাদিং'! অথচ সবাই জানে সংস্কৃতের শেষ পরীক্ষায় আপনি পেয়েছিলেন এক, শ্রীমতী 'আরো কম'। তবে, আইনের কচকচি প্রায় মেরে এনেছি, সেই সঙ্গে ভাষারও। বাকি কেবল সংযোজন পত্র। ···]

সংযোজন পত্র (Annexure)—১

(১) দায়বদ্ধ কাল (Defect Liability period)—কার্য সমাপ্তির পর চুক্তি ভেদে ৬ মাস হইতে ১ বছর।

(২) জামানত অংশ—(Percentage Retention)—বিলের ৫ হইতে ১০ শতাংশ পর্যন্ত।

(৩) বিলম্বের দরুন ক্ষতিপূরণের হার—(Rate of Compensation per day)—দৈনিক ৫০-১০০ টাকা (চুক্তি ভেদে)।

(৪) কার্য সমাপ্তির কাল (Period of virtual Completion) কাজের বহর হিসাবে স্থপতি আন্দাজ করিয়া দিবেন।

(৫) বিলম্বিত প্রাপ্য আদায়ে সুদের হার (Rate for interest of Delayed Payment)— ১২% (বাৎসরিক) বা ১% (মাসিক)।

(৬) পরিচর্যামূলক দায়িত্বের কাল—(Guaranteed Service Period)—চুক্তি ভেদে ৬ মাস হইতে এক বছর।

কন্ট্রাক্টার যাতে বাড়ীওয়ালা নিকুঞ্জবাবুদের (ওরফে দিগ্বিজয় বাবুদের) ঠকাতে না পারে তার জন্য, দেখছেন তো কি রকম কড়া দাওয়াই-এর ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। সুকুমারী ভাষায় বলা যেতে পারে কাঠ বুড়োর গান ঃ

"কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক শব্দ,
বলে, জানি কোন্ কাঠ কিসে হয় জব্দ।
কাঠ কুটো ঘেঁটে ঘুঁটে জানি আমি পষ্ট,
এ কাঠের বজ্জাতি কিসে হয় নষ্ট।
কোন্ কাঠ পোষ মানে, কোন্ কাঠ শান্ত,
কোন্ কাঠ টিমটিমে, কোনটা বা জ্যান্ত।
কোন্ কাঠে জ্ঞান নেই মিথ্যা কি সত্য,
আমি জানি কোন্ কাঠে কেন থাকে গর্ত।"

চুক্তিপত্রের কাঠ বুড়োকে অবহেলা করেছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। তাই বেখেয়ালে কাঠের গর্তে পা পড়ে জান যাবার দাখিল (মনে নেই, অ্যান্টিসিপেটারী বেল চাইতে হয়েছিল তাঁকে ব্রহ্মার আদালতে ?)!

এ অধ্যায় শেষ করার আগে দরপত্রের বিভিন্ন দফার ভারতীয় স্থপতি সংঘের নির্ধারিত মাপ নেওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল চুক্তিপত্রের ১১নং শর্তে। অতএব পাঠক, তুমি তো সর্বংসহা ; আর একটু সহ্য কর ঃ

(১) মাপ নেওয়ার সময় সেন্টিমিটারের ভগ্নাংশকে অগ্রাহ্য করা হবে।

(২) স্থিরীকৃত মূল্যমানের মধ্যে অব্যবহৃত নষ্ট মালের দাম, মাল তোলা, নামানো, সরানো, পৌঁছানোর সকল খরচা সামিল আছে ধরে নিতে হবে।

(৩) মাটি কাটার দরের মধ্যে মাটি আটকানোর জন্য প্রয়োজনীয় তক্তা বা খুঁটির খরচ সামিল আছে বলে ধরে নিতে হবে।

(৪) ঢালাই পিটিয়ে ঘন সংবদ্ধ করবার পরই তার মাপ নেয়া হবে ঘন মিটারে।

(৫) ঢালাইয়ের দরে প্রয়োজনীয় তক্তার যোগান ও ফিটিং খরচ সামিল বলে ধরে নিতে হবে।

(৬) যে সমস্ত ফাঁক বা ফুকর মাপে ০'২ বর্গমিটারের থেকে বড়, দেয়ালের মাপ নেয়ার সময় সেগুলির মাপ বাদ দিতে হবে।

(৭) লিনটেল, দেয়ালের ভিতর বসানো বেডপ্লেট, বীম, পিলার বা বর্গার আয়তনও দেয়ালের মাপ থেকে বাদ যাবে।

(৮) কৃত দেয়ালের চওড়া যাই হোক না কেন, আয়তন মাপবার সময় নকশায় দেখানো চওড়াকেই প্রকৃত বলে ধরে নিতে হবে।

(৯) ৫ সেন্টিমিটার বা বেশী বার করা প্লাস্টারের কাজ (বিট, বর্ডার, মোটিফ ইত্যাদি অলঙ্করণ) এর জন্য আলাদা দর আদায় করা যাবে।

(১০) দেয়ালের কোণে গোল করা বা পলকাটা প্লাস্টারের জন্য আলাদা দর আদায় করা যাবে না।

(১১) ঢেউ খেলানো চাদর দিয়ে ছাদ করলে তার আয়তন মাপবার সময় ঢেউগুলিকে অগ্রাহ্য করে ধরে নিতে হবে চাদরগুলি সমতল।

(১২) রং করার দরের মধ্যে ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কার করা, মরচে, ময়লা বা পুরানো রং ছাড়ানো, প্লেন করা, পালিশ করা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিকরণের সামিল বলে ধরে নিতে হবে।

(১৩) কাঠে রং করার সময় যাবতীয় অলঙ্করণকে প্লেন সমতল বলে ধরে নিয়ে আয়তন মাপতে হবে।

(১৪) খড়খড়ি রং করার সময় প্রকৃত আয়তনের দেড়গুণ ও কাঁচের জানলা রং করার সময় প্রকৃত আয়তনের অর্ধেক মাপ ধরে নিতে হবে। গ্রীলের মাপও প্রকৃত আয়তনের অর্ধেক হবে।

(১৫) ঢেউ-চাদর রং করলে, মাপ নেওয়ার সময় চাদর ঢেউ-বিহীন বলে ধরে নিতে হবে।

(১৬) পাইপ লাইনের কাজে মিটার প্রতি দরে প্রয়োজনীয় জোড়াই ইত্যাদি সামিল বলে ধরে নিতে হবে।

উপরের এই নিয়মগুলি ভারতীয় স্থপতি সংঘ কর্তৃক ১৯৭০ সালে গৃহীত ও প্রকাশিত। ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলে যে কোন কাজে ঠিকেদার এগুলি আইনতঃ মানতে বাধ্য। গৃহাভিলাষী মানুষ যাতে অযথা না ঠকেন, তাই এই সব নিয়ম চালু করেছেন স্থপতি সংঘ। মেনে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারেরা। শুধু স্থপতি সংঘই নয়, অসংখ্য প্রযুক্তিবিদ ও তাঁদের কার্যকরী সংস্থা, সাধারণ মানুষের আবাসন যাতে সস্তা ও আরামদায়ক হয় তার জন্য চিন্তা করে চলেছেন নিরন্তর। আসুন না, আমরাও একটু আধটু চেখে দেখি এই চিন্তা-ভাবনার ফসল……

৩ উই শ্যাল ওভারকাম

● **একটি করুণ গল্প**

মানিকতলা মোক্তবের মৌলবী রহিমচাচা থাকতেন ইস্কুলের লাগোয়া দেড়-কামরা কোয়ার্টারে। ওয়াকাফ কমিশনারের হুকুমে রিটায়ার করলেন ষাটের কোটায় পড়ে। নতুন মাস্টার-সাহাবকে জায়গা দিতে রহিম চাচাকে ছাড়তে হল স্কুল কোয়ার্টার। ঠ্যালায় ট্রাঙ্ক চাপিয়ে বেরিয়ে এলেন চাচা। পেছনে চাচী নাজমা বিবি, তিনছেলে মাকসুদ, সামসুল আর সুলেমান, বুড়ি বেওয়া মা জামিলা বিবি আর মেয়ে জারিনা। অনেক চেষ্টা করেও কোন ফ্ল্যাট ভাড়া পাননি রহিমচাচা। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে এক দু ঘরের যাওবা পায়রার বাসার খোঁজ মিলেছিল, শুনলেন সেখানে সেলামী দিতে হবে কোথাও পাঁচ হাজার, কোথাও সাত হাজার। শেষে এসে উঠলেন রিপন স্ট্রীটের বস্তির কুঁড়ে ঘরে। মাটির দেয়াল, খোড়ো চাল, বাঁশের ব্যাতা দিয়ে বোনা ঝাপ দরজা। ছাদের খড় সবই পচে গেছে। বছর বছর দু তিন কাহন নতুন খড় চাপিয়ে কোন রকমে ঠেকা দিতে হয় ভাড়াটেকেই। এক জায়গায় দশ মিনিট দাঁড়ালে ড্যাম্প উঠে মেঝেটা সপসপে হয়ে যায়। ড্যাম্পে দেয়ালও ভিজে জবজবে, শুকোতে পায় না। ঘরে কোন জানলা নেই তো।

খাটের অভাবে নিত্যিকার অভ্যাসে মেঝেতেই শুয়েছিলেন জামিলা বিবি। দু পাশে ছোট নাতি সুলেমান আর নাতনি জারিনা। ভোরবেলা দেখা গেল কপাল তাঁর পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। চোখ দুটো ঘোলাটে লাল। সুলেমানেরও বুকেপিঠে সর্দি বসে গেছে। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আল্লা-রসুলের কাছে চলে গেলেন দাদী আর আদরের নাতি সুলেমান। ঘটনার তীব্র আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি রহিম-চাচা ডাক্তারের পরামর্শে পাগলের মত খুঁজতে লাগলেন একটু শুকনো, একটু আলো বাতাসওয়ালা আস্তানা।

ব্যর্থতার হতাশায় ক্রমে ছেয়ে ফেলতে লাগল চাচাকে। সস্তায় একটু ভাল আস্তানা কোলকাতায় পাওয়া অসম্ভব। ডাক্তার সেদিন রেগে বেরিয়ে গেলেন চাচার ঘর থেকে, যেদিন কাশতে কাশতে লাল তাজা রক্ত বেরিয়ে এল জোয়ান ছেলে মাকসুদ আলীর গলা চিরে। মাকসুদ চলে যেতে প্রায় পাগল হয়ে গেলেন চাচা। ছেড়ে দিলেন সকাল সন্ধ্যের টিউশানী দুটো। বাকি পড়ল ঘর ভাড়া, ইলেকট্রিকের বিল। ধার বাড়তে লাগল মুদিখানায়, কয়লার দোকানে। হতাশ মানুষটার ক্রমেই বেশী সময় কাটতে লাগল বিশে ডোমের ভাটিখানায়। নাজমা বিবি একদিন জারিনার হাত ধরে ভিক্ষে করে ফিরে এল নিউ মারকেট থেকে। সেই রাত্রেই ফারসীর এক প্রাক্তন মৌলবী শেখ রহিমুদ্দীন আলী হাতে তুলে নিলেন একটা চকচকে সিঁদকাটি।

গালগপ্পো? আজ্ঞে হ্যাঁ, নেহাতই গালগপ্পো। রূপকথার বেশ খানিকটা রং চড়ানো জারক মাখানোও। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে বাস্তব অবক্ষয়ের রূপটা ধরা পড়ে যায় বইকি! বাংলার শহরে-

গঞ্জে পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে এই পতনের, এই পচনের। গৃহই মানুষকে করে গৃহী, সংসারী। মানুষ নিজের বাড়ীটুকুকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে এক সোনালী স্বপ্নমাখা পরিবার ··· সুখী পরিবার, নিশ্চিন্ত পরিবার। এই রকম শত সহস্র পরিবার নিয়েই গড়ে ওঠে সুস্থ সমাজ, শক্তিমান দেশ। তাই মানুষ গৃহহীন, বাস্তুহারা হলে একে একে ভেঙ্গে পড়ে তার সংসার, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ—সব কিছু।

● চাই বামুনের গরু

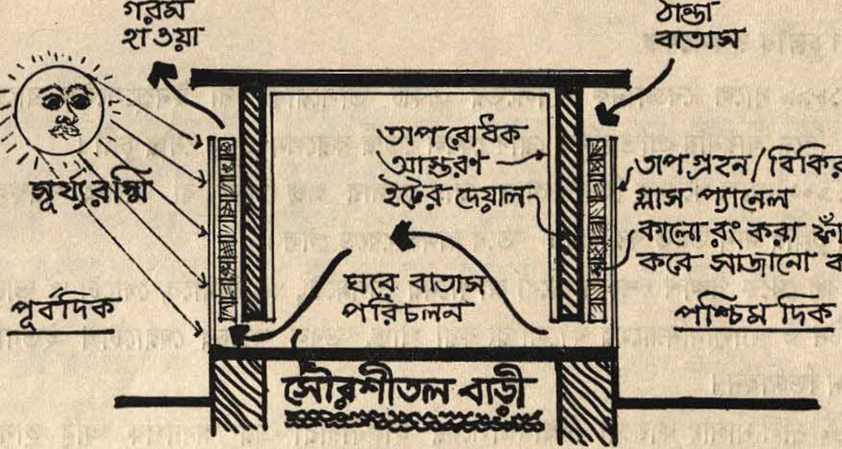
কিন্তু এ সর্বনাশ তো হতে দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের আবাসন সমস্যার মোকাবিলা করতে দরকার বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে শুধু কোলকাতার জন্যই প্রয়োজন ৫০০ কোটি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন খাতে বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ ১৫ কোটি টাকা! প্রয়োজনের অর্ধ শতাংশ !! প্রতি বছর সমস্যা জমে যাচ্ছে সাড়ে নিরানব্বই শতাংশ হারে। (পাঠক, এটা কিন্তু গপ্পো কথা নয়, বাস্তব ; কঠিনতর বাস্তব যা রহিমচাচার গল্পের থেকেও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর)। স্তম্ভিত করা এই অকল্পনীয় বিপুল আর্থিক প্রয়োজনের মূলে রয়েছে বাড়ী করার খরচ যা সাত থেকে আট শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে বছর বছর। প্রকৃতির হাত থেকে আবাসিককে রক্ষা করতে পারে এমন আরামদায়ক আস্তানা সস্তায় তৈরি করতে পারাই একমাত্র সমাধান! সে সমাধানে পৌঁছতে পারলে তবেই আমরা পল রোবসনের মত হুঙ্কার দিয়ে গাইতে পারব : We shall overcome some day !

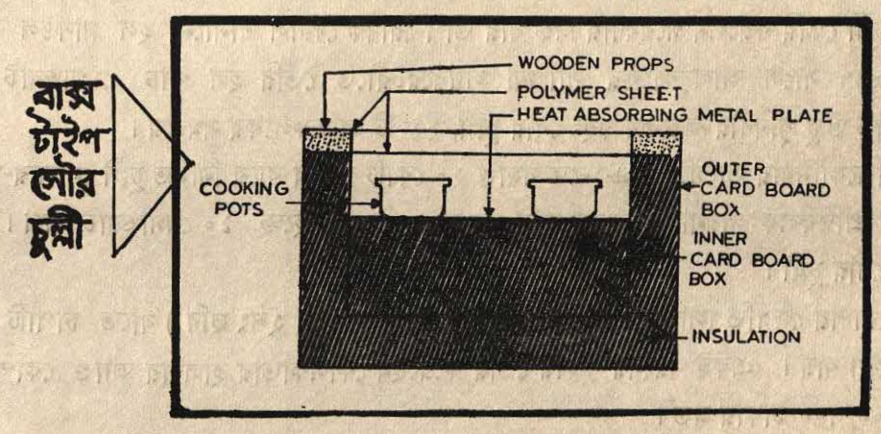
আসুন আমরা সমাধান খুঁজি দু তরফা : ১. আরামপ্রদ, স্বাস্থ্যকর, নির্ভরযোগ্য বাড়ী, ২. পাকা-পোক্ত দীর্ঘজীবী অথচ সস্তার নির্মাণকৌশল। অর্থাৎ বামুনের গরু।

● সূর্য শীতল বাসস্থান

বিশ্বাস করুন, আমি বা কম্পোজিটার কেউই গাঁজা খাই নি। সত্যি সত্যি ইজরায়েলের বীরসেবা শহরে নেগেভ ইনস্টিটিউটে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে প্রফেসার আলটেন কার্কের আবিষ্কৃত সৌরতাপে শীতল বাড়ী। ১৯৬০ সাল থেকে ডঃ ডেনিসের নেতৃত্বে পরীক্ষা চালাচ্ছেন ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারী অব ইজরায়েলের অ্যাডলার, লেভিট, ট্যাবর প্রমুখ গবেষক প্রযুক্তিবিদের দল। চতুষ্কোণাকৃতি বাড়ীটির অধিকতর লম্বা ধার দুটি পূর্ব ও পশ্চিমমুখী ভাবে রাখা হয়েছে। ৫নং নকশায় দেখুন এই দেয়াল দুটি ফাঁপা—মাঝে কালো রং করা কাঠের টুকরো ফাঁক ফাঁক করে সাজানো। এগুলি প্রবাহিত ও বিকীর্ণ তাপ বাতাস ও সূর্যালোক থেকে শুষে নেয়—কাজেই এগুলিকে বলা হয় তাপ-শোষক (ABSORBENT)। দেয়ালের বাইরের দিকের পর্দাটা কাঁচের, যাতে সূর্যালোক অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে ভিতরে। ভিতরের পর্দাটি কিন্তু পুরু ইটের গাঁথনী যাতে তাপ ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে। এবার আবার নকশায় দেখুন সকাল বেলা পূব দেয়ালে পড়ছে সূর্যালোক, কাঁচ ভেদ করে পৌঁচচ্ছে তাপ-শোষকের গায়ে। তপ্ত শোষক তার ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা বাতাসকেও তপ্ত এবং লঘু করে তুলছে। এই গরম বাতাস উপর দিকে উঠে চিমনীর মত পূব দেয়ালের মাথার উপর রাখা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং এই বাতাসের শূন্য স্থান পূরণ করতে ঘরের বাতাস পূব দেয়ালের

তলার ফোকর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে ফাঁপা দেয়ালের মধ্যে। ঘরের বাতাসের স্থান পূরণ করতে ঠাণ্ডা বাতাস পশ্চিম দেয়ালের তলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে আসছে। পশ্চিম দেয়ালে বাতাসের যোগান আসছে মাথার উপরের ফাঁক দিয়ে বাইরের বাতাস ঢুকে। বাইরের এই বাতাস থেকে পশ্চিম দেয়ালের তাপ শোষক তাপ শুষে নেয়ার ফলে ঘরে ঢোকবার সময় তা বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে বিনা যন্ত্রপাতিতে, বিনা শক্তি খরচে আলটেনকার্ক আবিষ্কৃত সৌরশীতল বাড়ীটির ভিতর আপনা আপনিই ঠাণ্ডা বাতাস চলাচল করছে—ফলে বাড়ীর ভিতরটা বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠছে প্রায় নি-খরচাতেই। সকাল





৫নং নকশা

বেলার প্রক্রিয়াটা ঠিক উল্টে যায় বিকেল বেলা। পশ্চিম দেয়ালে সঞ্চিত হয় সৌরতাপ। ফলে পূর্বদেয়াল সাপ্লাই করে ঠাণ্ডা হাওয়া। 'কল করেছে আজব রকম আলটেন খুড়ো!'

এই রকম খুড়ো মার্কা আর একটি কল হল বাক্স টাইপ সৌর চুল্লী (**৫নং নকশা**)। আলটেনকার্ক বাড়ী আপনাকে নিখরচায় ঠাণ্ডা রাখবে আর সৌরচুল্লী নিখরচায় সেরে দেবে আপনার রান্নাপাট। আর

কত রকম ঝামেলা এড়াতে পারবেন বলুন তো—গ্যাস ডিলার আর কয়লা-ওয়ালাকে তেল দিতে হবে না, কেরাসিনের দোকানে লাইন দিতে হবে না, ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে গাল পাড়তে হবে না, ধোঁয়া কালিতে দমবন্ধ, হাঁপানী বা চোখ খারাপের ভয়ে গ্যাস-মাস্ক পরতে হবে না—এমন কি বাড়ীতে ঝুল ঝাড়া, চুনকাম, এসবও অনেক দেরীতে দেরীতে করলেও চলবে। আর সিলিণ্ডার ফেটে মারা যাবার ভয়ে দেবী গ্যাসেশ্বরীর মানত করা একদম বন্ধ করে দিলেও চলবে। অতএব আসুন বাড়ীতে ফিট করে ফেলা যাক সস্তাদরের সৌর চুল্লী। চিন্তামণিই জ্বালানী যোগাবেন—অতএব এটিও উই শ্যাল ওভারকামের পথে একটি বড় হাতিয়ার।

● খুড়ো মার্কা চুল্লীর রকমফের

(ক) ১৮৯৯ সালে বৈজ্ঞানিক ক্যালভের একটি তাপরোধক বা ইনসুলেটেড বাক্সের কাঁচের দরজার ভিতর দিয়ে আয়নায় প্রতিফলিত রোদ ফেলে তৈরি করলেন প্রথম সৌর চুল্লী।

(খ) ১৯০২ সালে গবেষক ডি-লা-গ্রাজা রোদ ফেলার জন্য লেনস বা কাঁচের পরকলা ব্যবহার করে ক্যালভের চুল্লীর মান উন্নত করলেন। তবে দামও বেড়ে গেল।

(গ) বিশ থেকে পঞ্চাশ দশকের মধ্যে জাপানের সুগিমটো, ওয়াটানাবে, গোটো ও ভারতের ঘাই তেরছা কাঁচ, টিন ও অ্যালুমিনিয়ামের কালো রং করা পাত, ডবল কাঁচের ঘেরাটোপ ইত্যাদি লাগিয়ে বানালেন নানান ডিজাইন।

(ঘ) ৬০ সাল নাগাদ কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারীং-এর অধ্যাপক আবু হাসান চৌকো তাম্র পাত্র যুক্ত চুল্লী তৈরি করলেন গবেষণার জন্য যার তাপ-রোধক দেয়াল বানানো হল গ্লাসউল দিয়ে।

(ঙ) ১৯৭৭ সালে আলবুকার্কের সাণ্ডিয়া ল্যাবরেটরীতে তৈরি হল পাঁচ মেগাওয়াট তাপ উৎপাদক ১১৪ ফুট উঁচু পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সৌর চুল্লী, ২২২টি প্রতিফলকের সমন্বয়ে।

(চ) কালিফোর্নিয়ার ডাগেটে ১৯৮২-তে সমাপ্ত ২০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত চুল্লী সোলার-ওয়ানে রয়েছে ১৮১৮ টি প্রতিফলক আয়না ২২ একর জমি জুড়ে। উৎপন্ন হচ্ছে ১০ মেগাওয়াট তাপ। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সৌর চুল্লী।

(ছ) বরোদার জ্যোতি লিমিটেড তৈরি করেছেন বক্স কুকার (**২নং ছবি**) যাতে চাপাটি ছাড়া সব কিছু রান্না করা যায়। একই ধরনের কুকার তৈরি করেছেন কোলকাতার হালদার অ্যাণ্ড কোম্পানী। এগুলির দাম ৬০০/৭০০ টাকার মত।

(জ) দিল্লী আই. আই. টি-র গ্রামীণ উন্নতি ও সঠিক প্রযুক্তি কেন্দ্র গ্রামীণ ব্যবহারের উপযোগী কার্ড বোর্ডের তৈরি সৌরচুল্লী বানিয়েছেন (**৫নং নকশা**) যার দাম পড়বে ২০/২৫ টাকার মধ্যে। গ্রামীণ মানুষ নিজেই তৈরি করে নিতে পারবেন। গরম কালে ঘন্টা খানেকের মধ্যে ১১০° সেন্টিগ্রেড তাপ পাওয়া যাবে যাতে ভাত, ডাল, তরকারী রাঁধা যাবে অনায়াসেই। ২০ টাকা থেকে ২০ কোটি ডলার দামের চুল্লীর ক্যাটালগ বানিয়ে দিলাম। পছন্দ করে নিতে আজ্ঞা হোক।

'সোনার মেঘে আলতা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়
সকাল সাঁঝে সূর্যিমামা নিত্যি আসে যায়।
নিত্যি খেলে রঙের খেলা আকাশ ভরে ভরে
আপন ছবি আপনি মুছে আঁকে নূতন করে।
....
সেই খেলা, যে ধরার বুকে আলোর গানে গানে
উঠছে জেগে—সেই কথা কি সূর্যি মামা জানে?'

['আজব খেলা'—৺সুকুমার রায়]

● আঃ কি আরাম/এসো দুখীরাম

স্বগৃহে দুখীরামের সাথে আড্ডা দিতে দিতে সুখীরাম হতে হলে কিছু সুখ ও আরামের দরকার অর্থাৎ ঘরটি সুখদায়ক ও আরামদায়ক হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে সস্তায় কি ভাবে কাজ হাসিল করা যায় তার কিছু শুলুক সন্ধান জুগিয়েছিলেন অধুনালুপ্ত অ্যাসোসিয়েশন অব্ আর্কিটেক্টস, ইনজিনীয়ারস অ্যাণ্ড টাউন প্ল্যানারস তাঁদের পাঁচ খণ্ড কেতাব 'অ্যানুয়াল অব্ আর্কিটেকচার, স্ট্রাকচার অ্যাণ্ড টাউন প্ল্যানিং' মারফত।

ঘরটি যদি খুব ছোট হয় বা ছাদ খুব নিচু হয়, তা হলে ঘরে একটা দম আটকানো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আবার খুব বড় ঘর বা খুব উঁচু ছাদের খরচও মেলাই। এ ক্ষেত্রে জানা প্রয়োজন সঠিক মাপগুলি। নানান ধরনের ঘর বলতে আমরা প্রধানতঃ বুঝি, থাকবার ঘর, রান্নাঘর, স্নান পাইখানা এবং স্টোর। ইংল্যাণ্ডের ট্রপিক্যাল ডিভিশন, বিল্ডিং রিসার্চ স্টেশনের মতে, থাকবার ঘরের জন্য প্রতি ৪৩ বর্গফুট (৪ বর্গ মিটার) জায়গা থাকা দরকার। স্বামী-স্ত্রী ও একটি বাচ্চার ঘর সেই হিসাবে (৪৩ × ২·৫ = ১০৭·৫ বর্গফুট) ১০ ফুট × ১০ ফুট ৯ ইঞ্চি হওয়া দরকার ন্যূনপক্ষে। ১০ × ১২-এর চেয়ে বড় মাপের ঘর এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। থাকবার ঘরের চওড়া ৮ ফুটের কম না হওয়াই উচিত। ১০৭·৫ বর্গফুটের ঘরটি এ ভাবে ৮ ফুট × ১৩ফুট ৬ ইঞ্চি হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ব্যবহারের দিক দিয়ে লম্বাটে ঘরে খাট পাতবার পরও বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা থেকে যায়। কাজেই ব্যবহারের পক্ষে ১০′ × ১০′৯″ ঘরের থেকে ৮ × ১৩′৬″ ঘর বেশী কাজের, বেশী আরামপ্রদ। অনেকেরই একটা ভুল ধারণা থাকে চার চৌকো ঘর সব চেয়ে উপযুক্ত বলে। এই রিসার্চ স্টেশনের মতে অন্যান্য ঘরের ন্যূনতম মাপগুলি হওয়া উচিত—

রান্নাঘর—	৩০ বর্গফুট (২·৮ বর্গ মিঃ)	—ন্যূনতম চওড়া	৫ ফুট (১·৫ মিঃ)
স্নানঘর—	১৬ বর্গফুট— (১·৫ বর্গ মিঃ)	ঐ	৩ ফুট (০·৯ মিঃ)
পাইখানা—	১২ বর্গফুট (১·১ বর্গ মিঃ)	ঐ	২½ ফুট (০·৭৫ মিঃ)
স্টোর	ঐ	ঐ	ঐ

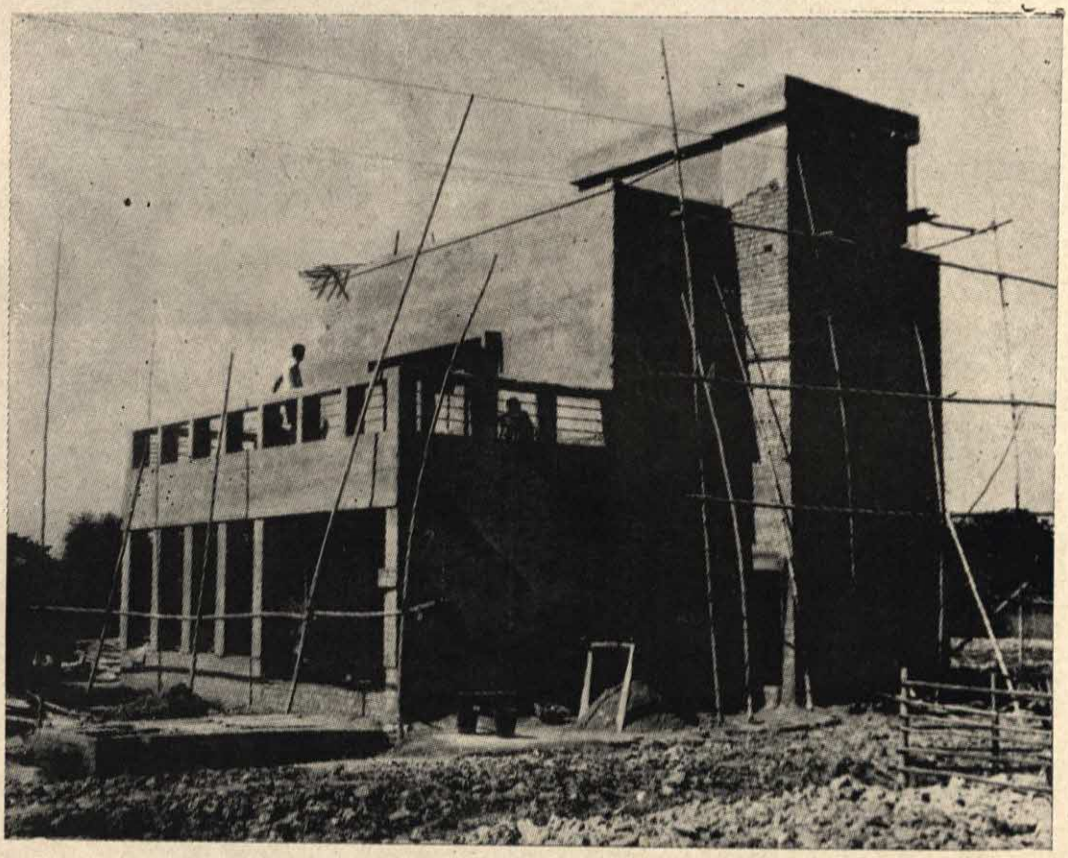
বাড়ীতে যদি একটিই থাকবার ঘর থাকে তা হলে ওই ঘরের আয়তন ১৫০ বর্গ ফুটের (১৩.৯ বর্গ মিটার) কম না হওয়াই উচিত। দুটি ঘর থাকলে বড়টি ১২০ বর্গ ফুট (১১.২ বর্গ মিটার) ও ছোটটি ৮০ বর্গ ফুট (৭.৫ বর্গমিটার) হতে পারে।

ছাদ ন্যূনপক্ষে কতটা নিচু হতে পারে, এ নিয়ে, আমাদের মধ্যে নানান ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকের ধারণা ঘরের উচ্চতা কমপক্ষে ১০ ফুট (৩ মিটার) হওয়া একান্ত দরকার। প্রকৃত-পক্ষে ঘরের উচ্চতা জনস্বাস্থ্য ও মানসিকতার দিক দিয়ে ৮ ফুট ২ ইঞ্চি (২.৫ মিটার) যথেষ্ট। সিলিং পাখা লাগাতে হলে অবশ্য এই উচ্চতা ৯ ফুট (২.৭৫ মিটার) করতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঘরের তাপমানের দিক দিয়ে ১২ ফুট (৩.৬৭ মিঃ) উঁচু ঘর ও ৮ ফুট (২.৪৪ মিঃ) উঁচু ঘরে কোন পার্থক্য নেই। খরচের দিক দিয়ে পার্থক্য অন্ততঃ ২৫ শতাংশ। স্নান, পাইখানা ও স্টোরের উচ্চতা ৭ ফুটে (২.১৪ মিঃ) কমিয়ে আনা যায়। এই ন্যূনতম মাপগুলি ইজরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, সিংহল, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের গবেষকরাও সমর্থন করেন।

● **আরাম হারাম নেহি হ্যায়**

ঘরে আরাম ও সুখানুভূতির জন্য ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং রিজিওনাল হাউসিং সেণ্টার কিছু 'ভালমন্দ' বিচার করেছেন ঃ

ভাল	মন্দ
(১) নতুন ছাদের রং ঘরের তাপ কমায়।	(১) পুরোনো ছাদের রং তাপ বাড়িয়ে তোলে।
(২) লম্বা টানা ভেন্টিলেটার ঘরকে ঠাণ্ডা রাখে।	(২) ঘুল ঘুলি জাতীয় কাটা কাটা ভেন্টি-লেটার কোন কাজের নয়।
(৩) ঘরকে আরামপ্রদ করতে ঘরের মধ্য দিয়ে সরাসরি বায়ু চলাচলের (Cross Ventilation) তুলনা নেই।	(৩) ফ্যান, এয়ার সার্কুলেটার বা একজস্ট দিয়ে এ আরাম পাওয়া যায় না।
(৪) খড়খড়ি-যুক্ত সাবেকি জানলা প্রয়োজনমত আলো বাতাস কম বেশী করে ঘরকে স্নিগ্ধ রাখত।	(৪) আজকালকার ফিক্সড লুভার বা অনড় পাখি ঘরকে ততটা স্নিগ্ধ করতে পারে না।
(৫) ঘরের লাগোয়া ঘাস জমি ও কাছের গাছ ঝলসানো রোদকে আটকে দেয়।	(৫) ঘরের লাগোয়া বাঁধানো চাতাল ঘরকে রৌদ্রতপ্ত করে তোলে।
(৬) আমাদের আবহাওয়ায় দরজা-জানলায় কাঁচ যত কম থাকবে, ঘর তত ঠাণ্ডা থাকবে।	(৬) বিলাতী অনুকরণে কাঁচের লম্বা চওড়া পাল্লা হট-হাউসের মত ঘরকে ক্রমাগত গুমোট করে তোলে।
(৭) কানা বার করা ছাদ ঘরের দেয়ালে ছায়া ফেলে ঘরকে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক করে তোলে।	(৭) কার্নিশ যত ছোট হবে, রৌদ্রদগ্ধ দেয়াল ঘরের পরিবেশকে ততই ক্রমাগত অসহনীয় করে তুলবে।



১নং ছবি

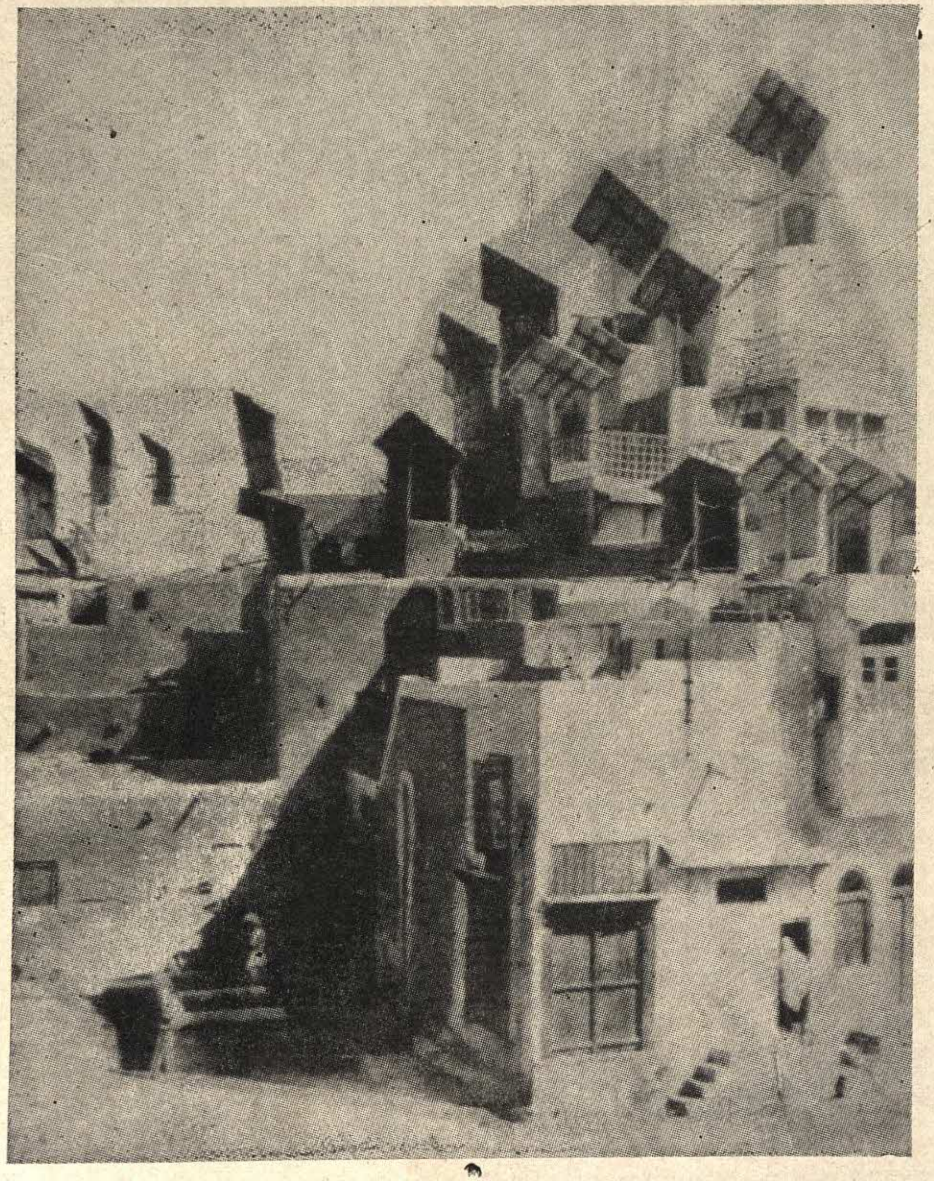
পিলার ও পাতলা দেয়ালের গঠন কৌশলে ১৯৭০ সালে ঠাকুরপুকুরে তৈরী শিক্ষিকা দম্পতীর বাড়ী। তখন খরচ পড়েছিল ৩০০০০৲। বাড়ীটি আজও অটুট। বর্তমানে চলতি পদ্ধতিতে তেরী করলে খরচ পড়বে পৌনে দু'লক্ষ টাকা।

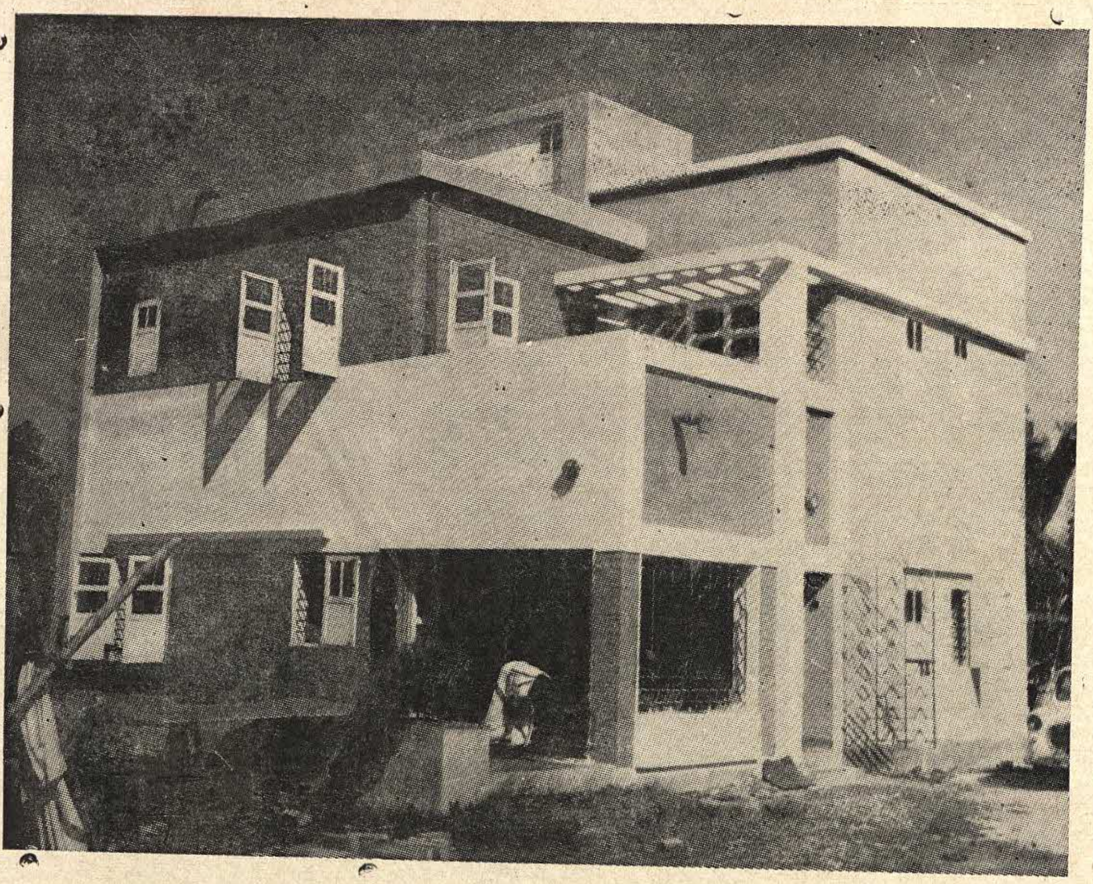


২নং ছবি

বক্স কুকার সৌরচুল্লী

পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকার 'বাদগীর' বা হাওয়া ধরা চিমনী। ঘন সংবদ্ধ বহুতল শহুরে বাড়ীতে আকাশ পথে বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা, টাটকা বাতাস মাথার উপর বসানো পাখনার সাহায্যে ধরে নিচের তলায় পাঠিয়ে দেয় এই বাদগীর।





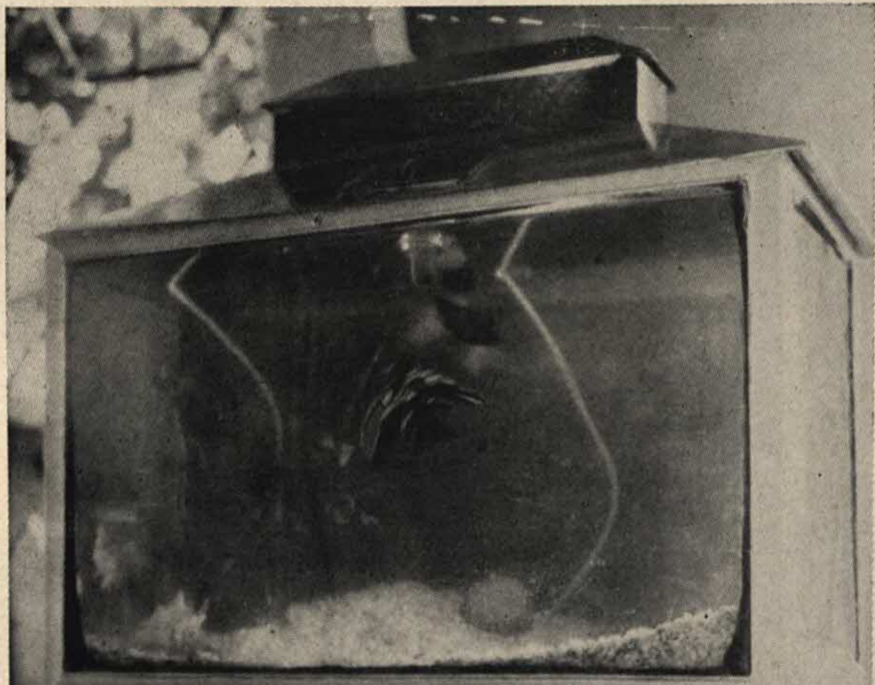
৪নং ছবি

নরেন্দ্রপুরে লেখকের বাড়ী। বাড়ীর মাঝখান দিয়ে ওঠা সিঁড়ির ঘরটি চিমনীর মত গরম হাওয়া টেনে নিয়ে এক ও দুতলার ঘরগুলিতে বাতাস চলাচলে সাহায্য করে।



৫নং ছবি

অস্ট্রেলিয়ার স্থপতি রবার্ট বায়ার্ড ও তাঁর পরিবেশ প্রাসাদ।

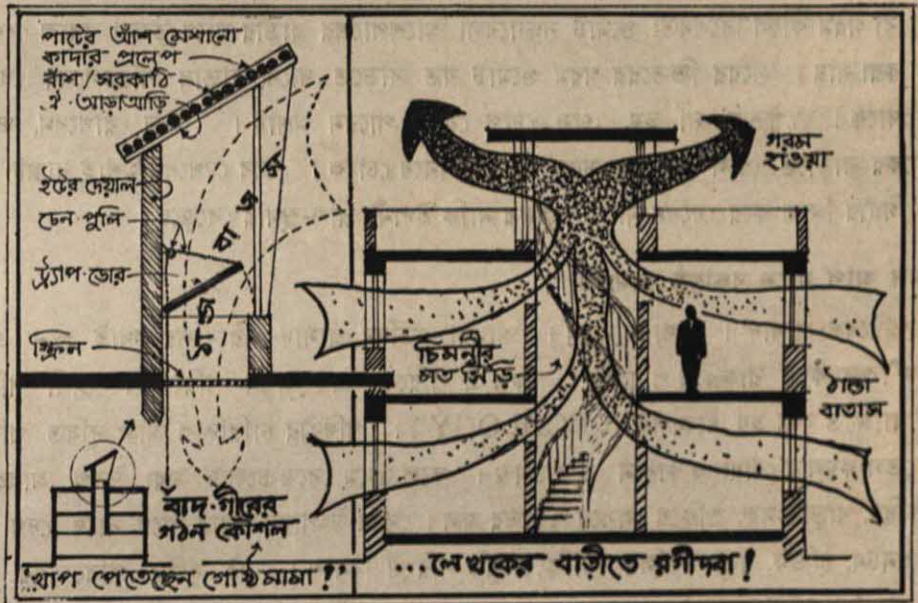


৬নং ছবি

বৈঠকখানার মৎসপুরাণ

● **গুড় গুড় গুড় গুড়িয়ে হামা**
খাপ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা
এইবার বাণ চিড়িয়া নামা—চট !

৩নং ছবিতে দেখুন, হায়দ্রাবাদ শহরের বাড়ীগুলির মাথায় যে গোঠা কুড়ি মানুষপ্রমাণ ঘুড়ি ফণা তুলে রয়েছে ও-গুলি কিন্তু বিশ্বকর্মা পূজোর মত কোন যুৎসই সময়ে টেক-অফ করার অপেক্ষায় নেই। ও-গুলি আসলে গোষ্ঠ মামার বাগানো ধামা—উদ্দেশ্যটা অবশ্য চিড়িয়া নামানো নয়, হাওয়া ধরা। ঘিঞ্জি শহরের উপরের খোলা আকাশ দিয়ে যে পরিষ্কার ঠাণ্ডা সমীরণ বয়ে যায় তাকে ধরে চিমনীর সুড়ঙ্গ পথে নিচের এক-তলা দো-তলার ঘরগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (**৬নং নকশা**)। নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার এই হাওয়া ধরা কৌশল প্রায় পাঁচশো বছরের পুরানো। নাম বাদ-গীর। ছবিতে যে ভাবে



৬নং নকশা

আকাশ জুড়ে ফণা তুলে রয়েছে বাদগীররা, তাতে সন্দেহ নেই, কৌশলটা খুবই ফলপ্রদ। দক্ষিণ বাংলাতেও প্রায় সারা গরম কালটা প্রতিদিন বয় জোর দখিনা সমীরণ। দক্ষিণ বাংলার পাঠকরা যাতে বাদ-গীর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন তাই ৬নং নকশায় তার গঠন-কৌশলটা এঁকে দেওয়া হল।

● **রগীদবা !**

অধমও দক্ষিণ বাংলার বাসিন্দা। বাদ-গীর নয়, ঠিক তার উল্টো একটা পরীক্ষা (কি নাম দেয়া

যায় ? রগীদবা ?) করেছিলাম অধমের কুঠিরে। পরীক্ষা মোটামুটি সফল। (এই সুযোগে একটু নিজের ঢাক পিটিয়ে নিচ্ছি আর কি, গোস্তখি মাপ করবেন)।

লেখকের বাড়ীতে (**৪নং ছবি**) সিঁড়িটি ঘিরে রাখা হয়েছে ঘরগুলি দিয়ে। মাঝের পার্টিশন দেয়ালগুলি ছাদ অবধি না তুলে দরজার মাথায় মাথায় শেষ করে দেওয়া হয়েছে। চিমনীর মত সিঁড়ির মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতরের গরম হালকা হাওয়া উপরে উঠে চিলে-কোঠার দরজা ও জানলা (পরীক্ষার সময় দুটিকেই খোলা রাখতে হয়—যদিও ছবিতে বন্ধ দেখা যাচ্ছে) দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওই গরম বাতাসের স্থান পূরণ করতে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকে ভিতরের পার্টিশনের উপর দিয়ে চলে আসে সিঁড়ির মধ্যে। ইতিমধ্যে ঘরে মানুষ, পোষ্য কুকুর, বেড়াল, উনুন, হিটার, বাতি ইত্যাদির সংস্পর্শে নতুন ঢোকা বাতাসও ক্রমে গরম ও হালকা হয়ে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। এইভাবে একতলা-দোতালার প্রায় সব কটি ঘরের মধ্য দিয়ে একটি বায়ু পরিচলন হতে থাকে (**৬নং নকশা**) বা গরম কালে বিশেষতঃ গুমোট সন্ধ্যাবেলা আশেপাশের বাড়ীর সাথে তুলনা করলে বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ঘরের ভিতরের গরম গুমোট যত বাড়তে থাকে, বাতাস পরিচলনের বেগ তত বাড়তে থাকে। 'পেত্যয়' না হয়, এসে দেখে যেতে পারেন মশাই। মনে রাখবেন, ভদ্রলোক ভদ্রলোকের বাড়ীতে এলে বড়-সড় সন্দেশের বাক্স নিয়ে ঢোকে। তবে দেখবেন মশাই বাক্সটা আবার আমার গিন্নীর জিম্মা করে দেবেন না। আমার নাকি ইদানীং ব্লাড-সুগার বেড়েছে।

● থামস আপ মানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন

'পরিবেশ-প্রাসাদ'। কথাটা নতুন। আমরা এতদিন প্রাসাদ-পরিবেশের কথাই শুনে এসেছি। অর্থাৎ জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় পরিবেশ। কিন্তু এ পরিবেশ এক নতুন পরিবেশ। ভাবী পরিবেশ। যাকে ইংরাজিতে বলা হয় একোলজী (ECOLOGY)। পৃথিবীর চারিদিকে আজ দূষিত পরিবেশ। বাতাস তেল-কয়লার ধোঁয়া ও কার্বনে ভারাক্রান্ত। ফলে ক্রমে বেড়ে চলেছে খরা, উত্তপ্ত আবহাওয়া। কমছে উদ্ভিদ, বাড়ছে মরু, শুকিয়ে আসছে ভূগর্ভের জল। কৃষি উৎপাদন কমার সাথে সাথে দেখা দিচ্ছে খাদ্যের অনটন, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু···কলির সমাপ্তিতে বুঝি পরিপূর্ণ বিনাশ! এই দূষিত পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়তে জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের এক নবতর শাখা—একোলজী। একোলজীর পণ্ডিতেরা পরিকল্পনা করেছেন 'পরিবেশ-প্রাসাদ'—যেখানে মানুষ নিশ্চিন্তে আশ্রয় পাবে সব রকম পরিবেশ-গত প্রাকৃতিক দুর্দৈবে। এই প্রাসাদে আশ্রিত মানুষ ধ্বংসশীল পরিবেশকে দেখাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ—থামস আপ। আসুন আমরাও শিখেনি, কি করে বানাতে হবে এই নোয়ার জাহাজ, যা আমাদের রক্ষা করবে প্রাকৃতিক সংপ্লাবনের সংকট কালে।

● বায়ার্ড সাহেবের পরিবেশ-প্রাসাদ

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী মেলবোর্ন থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে এক গণ্ডগ্রাম ফ্লিণ্ডার্স। সেখানে

কোন মিউনিসিপ্যালিটি নেই যে জল সরবরাহ করবে, কোন পাওয়ার হাউস নেই যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে, কোন বাজার নেই যে খাদ্য সরবরাহ করবে, এমন কি কোন রাস্তাঘাটও বিশেষ নেই যে তেল, কয়লা, লোহা, সিমেন্ট—আমদানি হবে। এ হেন অচিনপুরীতে ২০ একর জমি নিয়ে এক খামার গড়ে তুলেছেন তরুণ স্থপতি রবার্ট বায়ার্ড। তারপর ভোজবাজি ঘটিয়েছেন তাঁর পরিবেশ-প্রাসাদে (**৫নং ছবি**)। গনগনে গ্যাসের উনুনে রান্না হচ্ছে খামারের সবজিবাড়ী থেকে তোলা সবজি, খামারের লেক থেকে তোলা হেরিং, ট্রাউট মাছ আর প্রাসাদের বৈদ্যুতিক আটাচাক্কিতে পেষা খামারের গমজাত আটার রুটি। সারা বাড়ী ঝলমল করছে বৈদ্যুতিক আলোতে, হাওয়া কলে চালানো পাম্প দিয়ে তোলা ভূগর্ভ জল সৌর-চুল্লীতে ফুটিয়ে পাইপে করে পাঠানো হচ্ছে রান্নাঘরে, বাথরুমে, সুইমিং পুলে—প্রয়োজন মত গরম বা ঠাণ্ডা অবস্থায়। সৌরব্যাটারী-চালিত ট্র্যাক্টার চাষ করছে, ফসলের ওয়াগন টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিক্টোরিয়ার হাটে। এই প্রাসাদের প্রত্যেকটি মালমসলাও এসেছে খামারের জঙ্গল আর কৃষিক্ষেত্র থেকে। একমাত্র ছাদে ব্যবহৃত অ্যাসবেস্টস সিটগুলি মেলবোর্ন থেকে আনা হয়েছে। এ ছাড়া সিলিং-এর স্ট্র-বোর্ড, দেয়াল, দরজা ও জানলার পাইন কাঠ ও সামান্য পোড়া ইট, বীম, বর্গার অরেগন কাঠ ও মেঝের কর্কের টালি সবই খামারের আঙ্গিনাতেই উৎপাদিত। ৫০০০ গ্যালনের সুইমিং পুলটি অবশ্য কংক্রীটে নির্মিত। জলের সরবরাহ হয় ছাদ থেকে বৃষ্টির (বছরে গড় ৩৬ ইঞ্চি বা ৯১৪ মিঃ মিঃ) জল ধরে। খাবার জল ও স্নানের জলও এই পুল থেকে নেওয়া হয়। পরিবর্ত ব্যবস্থা হিসাবে ঘাটতি পূরণ করবার জন্য আছে উইণ্ড মিল-চালিত ডিপ-টিউব ওয়েল। সারা বছর ধরেই ঘণ্টায় ১৩ কিঃ মিঃ থেকে ৪০ কিঃ মিঃ বেগে বাতাস বইছেই। কাজেই জলের কোন অভাবই নেই। জলের অপ্রতুলতা না থাকলেও অপ্রতুলতা আছে বিদ্যুতের।

বায়ু-চালিত কুইর্ক জেনারেটারে ১১০ ভোল্টের ৩ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় যা ২০টি ৬ ভোল্টের অ্যাসিড ব্যাটারীতে (যে ব্যাটারী, মোটর গাড়ীতে লাগানো হয়) জমা রাখা হয়। সঞ্চিত বিদ্যুৎ দিয়ে পাঁচ দিন অবধি আলো পাখা চালানো যাবে যদি বাতাসের অভাবে জেনারেটার নাও চলে। জেনারেটারটি বাড়ী থেকে ৫০ মিটার বা ১৫০ ফুট উঁচু একটি টিলার উপর বসানো আছে এবং গত সাত বছরে এরকম একবারও হয় নি যখন পর পর পাঁচদিন বাতাসের অভাবে জেনারেটার অকেজো হয়ে রয়েছে। এই বিদ্যুতে আলো পাখা চলে, চলে ৪০০ ওয়াট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। সুইমিং পুল থেকে বাড়ীর ছাদে রাখা ট্যাঙ্কে জল তোলবার ছোট পাম্পটিও এই বিদ্যুতেই চলে। তবে যেসব যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুতের খরচ বেশী যেমন কুকিং রেঞ্জ, গিজার ইত্যাদি চালানো সম্ভব হয় নি এখন পর্যন্ত। গিজার নেই, তাই কলে কলে গরম জলের সরবরাহ করা হয় সৌরচুল্লী মারফত। সৌর চুল্লীতে শক্তি জোগায় মোট ৩৬ বর্গ ফুট (৩'৩ বর্গ মিঃ) আয়তনের তিনটি তাপ শোষক প্যানেল। এই প্যানেল তিনটি বাড়ীর ছাদে উত্তরমুখী করে সাজানো আছে। বর্ষাকালে সৌরচুল্লীর ক্ষমতা কমে গেলে রান্না-ঘরে রাখা একটি কাঠের চুল্লীতে আংশিক ভাবে জল গরম করে ঘাটতি পূরণ করা হয়।

তবে রান্না হয় মিথেন গ্যাসে। বাড়ীতে পাইখানার সেপটিক ট্যাঙ্কের পরিবর্তে রয়েছে একটি মিথেন ডাইজেস্টার ('গৃহীর গাইডে'র প্রথম খণ্ডে যে গোবর গ্যাস মেসিনের গঠনকৌশল দেওয়া আছে মিথেন ডাইজেস্টার তারই সাহেবী সংস্করণ)। এতে পাইখানার ময়লা ছাড়াও পোলট্রি ও গোয়ালের আবর্জনাও কাজে লাগানো হয়। তরল সারটুকু ডাইজেস্টার থেকে বেরিয়ে পাইপে চালান হয়ে যায় সবজি বাড়ীতে। অন্য পাইপে বায়ো-গ্যাস বা মিথেন গ্যাস চলে আসে রান্নাঘরে—জ্বালানী হিসাবে। পরিবর্ত জ্বালানী হিসাবে অবশ্য সঞ্চিত থাকে খামারের ইউক্যালিপ্টাস জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা কাঠকুটো—যা দরকার মত ব্যবহার করা যায় কাঠের চুল্লীতে।

একটা কথা খেয়াল রাখবেন, কুইর্ক জেনারেটারে উৎপন্ন বিদ্যুৎ, সৌর চুল্লীর তপ্ত জল, উইণ্ড মিলে তোলা জল, মিথেন ডাইজেস্টারের বায়ো-গ্যাস—সবই পাওয়া যায় নিঃখরচায়—প্রাকৃতিক শক্তি বা খামারের জৈব আবর্জনাকে কাজে লাগিয়ে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন তেল বা কয়লাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় না বলে কোন ধোঁয়া, কালি বা অঙ্গার গ্যাস (কার্বন ডাই-অক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইড) পরিবেশকে দূষিত করে না। প্রয়োজনীয় শক্তি ও জ্বালানী উৎপাদনের ক্ষেত্রে বায়ার্ড সাহেবের বাড়ীটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্ব-নির্ভর। পরিবেশ-প্রাসাদের (ইকোলজী হাউস বা ইকো-হোম) মূল তত্ত্বই হচ্ছে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই প্রাসাদ হবে এমন বাড়ী যা তার আবর্জনাকে প্রাকৃতিক শক্তির (বায়ু, সূর্যালোক, জলের স্রোত বা জোয়ার-ভাঁটা) সাহায্যে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় জ্বালানী নিজেই সৃষ্টি করে নেবে পরিবেশকে কোন ভাবে দূষিত না করে। এর জন্য বাড়ীপ্রতি প্রয়োজনীয় বনাঞ্চল, চারণ ক্ষেত্র ও পালিত পশুপাখীর সংখ্যা বজায় রাখাকেই বলে পরিবেশ সংরক্ষণ (Ecological Conservation) এবং এই সংরক্ষণের নির্দিষ্ট হারকে বলা হয় পরিবেশগত ভারসাম্য (Eco-balance)।

রবার্ট বায়ার্ডের বাড়ীটি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সার্থক পরিবেশ-প্রাসাদ। ১৯৭৫ সালে এটি তৈরি করতে খরচ পড়েছিল ১৫০০০ ডলার। নির্মাতা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন রবার্ট নিজে। নকশা ও খুঁটিনাটি ডিজাইন করাতে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর স্থপতি ভাই জন বায়ার্ড ও তস্য পার্টনার জন কুথবার্ট। ওয়েস্টার্নপোর্ট উপসাগরের কোলে বসানো এ নয়নাভিরাম ভিক্টোরিয়া উপত্যকায় রবার্ট বায়ার্ড যে রূপকথার বাস্তবায়ন করেছেন, আমাকে তা অনুপ্রাণিত করেছিল শ্রীভূমি প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বই 'নিরাপদর লড়াই'-এর নিরাপদর চরিত্রটি সৃষ্টি করতে। নিরাপদর 'ফুলবাড়ী'ই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও অদ্বিতীয় পরিবেশ-প্রাদাদ।

● এবার অগ্নিপুরাণ

প্রাসাদ তো হল। কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণও তো চাই। কাজেই আপনাকে জানতে হবে অগ্নি-প্রতিরোধের কৌশল। 'আগুন কেন লাগে বা বিস্ফোরণের মূল কারণ কি, সে সম্পর্কে অধিকাংশ

মানুষেরই কোন ধারণা নেই। গৃহিণীদের রান্নাঘরে যে আগুনের দুর্ঘটনা ঘটে তার কারণ ওই ধারণার অভাব।' এ খেদোক্তি ন্যাশনাল সেফ্‌টি কাউন্সিল (পশ্চিমবঙ্গ অধ্যায়)-এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীকে. কে. ঘোষের।



৭নং নকশা - অগ্নি ত্রিকোণ

আগুন লাগে তিনটি কারণে—তাপ, দাহ্য বস্তু ও অক্সিজেনের সংযোগে। ৭ নং নকশায় দেখুন খোলা সসপ্যানে গরম তেলে বেগুন ভাজা হচ্ছে খোলা উনুনে। বাতাসের অক্সিজেন মিশছে উনুনের তাপে ও সসপ্যানের দাহ্যবস্তু তেলে। জলে ভেজা বেগুনের তেল যদি ছিটকে পড়ে উনুনের বুকে, অমনি শুরু হবে লাল ঘোড়ার দৌড়। মিসেস সাবধানীর রান্না কিন্তু হচ্ছে ঢাকা হট প্লেটে বন্ধ প্রেসার কুকারে। তাপ বন্দী হট প্লেটে, দাহ্যবস্তু কুকারে। আগুন লাগার কোন সম্ভাবনাই নেই। স্প্রিং আঁটা ঢাকনাওয়ালা ছাইদানীতে জ্বলন্ত সিগারেট ফেল্লে ঢাকনাটি আপনি বন্ধ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য—তাপ ও দাহ্য বস্তু থেকে অক্সিজেনকে আলাদা করে দেওয়া। এবার দেখা যাক কোথায় কি ভাবে এই তিন মস্তানকে আলাদা রাখা যায়।

আগুনের সম্ভাব্য কারণ	অগ্নিরোধক ব্যবস্থা

দাঙ্গা —বাড়ীর মালমসলা, আসবাব ও তৈজসপত্রে ব্যবহার করুন—কাঠ, খড়, কাপড়, প্লাস্টিকের বদলে অদাহ্য অ্যাসবেষ্টাস, লোহা, কংক্রিট, পাথর, পোড়ামাটি, অ্যালুমিনিয়াম, কাঁচ; গ্লাস উল।

বাজি — বাজি পোড়ানো হক কেবলমাত্র উৎসবের নির্দিষ্ট দিনে বড়দের চোখের সামনে। উড়ন তুবড়ি, রকেট, ছুঁচোবাজি একদম বাদ।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা— কনসিল্ড ওয়ারিং করুন দেয়ালে পাইপ বসিয়ে। প্রত্যেক লাইনে ঢাকনাওয়ালা ফিউজ ও ঢাকা সুইচ রাখবেন। ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন, শুধু যন্ত্রগুলি বাঁচাতে নয়, নিজেকেও বাঁচাতে।

তেল/গ্যাসের আলো —কাঁচের ঠুলি বা ঘোমটা পরিয়ে রাখুন। তৈলাধার পাত্রটা কাঁচের না হয়ে ধাতুনির্মিত হওয়া দরকার।

যান্ত্রিক গোলযোগ —গিজার, প্রেসার কুকার, গ্যাস সিলিণ্ডারের ভ্যালভ, পাইপ, সুইচ বা চাবি নিয়মিত পরীক্ষা করবেন।

অসাবধানতা—ঘরে একটি কার্বন ডাই-অক্সাইড সিলিণ্ডার বা অগ্নি নির্বাপক রাখুন এবং বাড়ীর সকলকে সেটি ব্যবহার করতে শেখান। ৮ নং নকশা মাফিক ফায়ার অ্যালার্ম বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। আগুন লাগলে জোড়া পাতের পিতলটি টিনের থেকে তাপে কম প্রসারিত হওয়ায় টিনের পাতটি বেঁকে উঠে স্ক্রুটিকে ছুঁয়ে ফেলবে ও ব্যাটারীর বিদ্যুৎ কলিং বেলে পৌঁছে ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে।

এ ছাড়াও আরো কিছু করণীয় নির্দেশ রয়েছে ঃ

(১) প্রতি ঘর, ফ্ল্যাট ও বাড়ীর দুটি করে প্রবেশপথ রাখবেন। দ্বিতীয় দরজাটির ছিটকানি হবে কেবল ভিতর দিকে। দরজার পাল্লা খুলবে বাইরের দিকে। ন্যূনতম মাপ ৬′ × ৩′।

(২) ৫ তলা বা উঁচু বাড়ীতে ২টি ন্যূনতম পৌনে চার ফুট চওড়া সিঁড়ি (ঢাল ৩০°-৪০° এর বেশী নয়) রাখবেন।

(৩) প্রতি তলায় একটি করে কার্বন ডাই-অক্সাইড (৯ লিটার) নির্বাপক, হাজার বর্গফুট প্রতি ২ বালতি জল ও দু বালতি বালি সিঁড়ির গোড়ায় মজুত রাখবেন।

(৪) সিঁড়ির মাথায় থাকবে ধোঁয়া বার করা চিমনী বা এক্সট্র্যাক্টার (**৮নং নকশা**)।

(৫) ইনসিনারেটার বা চুল্লী ঢাকনাযুক্ত টাইপের হতে হবে। খোলা উনুন হলে, তার উপর একটা চওড়া ফুটন্ত জল পাত্র (কানাউঁচু বগী থালা জাতীয়) রেখে তার উপর রান্না সারুন। উনুনের হুড থাকা ভাল।

(৬) যথাসম্ভব আসবাব হবে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের। কাপড়, কাগজ, বই রাখুন লোহার বন্ধ আলমারীতে।

(৭) কাঠের চেয়ে লোহার (কাঁচের বা অ্যাসবেস্টসের প্যানেল-যুক্ত) জানলা ও দরজা বাঞ্ছনীয়।

(৮) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অগ্নিরোধক হওয়া চাই। জলের পাম্প এক নাগাড়ে ২০ মিনিটের বেশী চালাবেন না। ১৫ মিনিট বিশ্রাম দিয়ে ফের চালাবেন প্রয়োজন হলে।

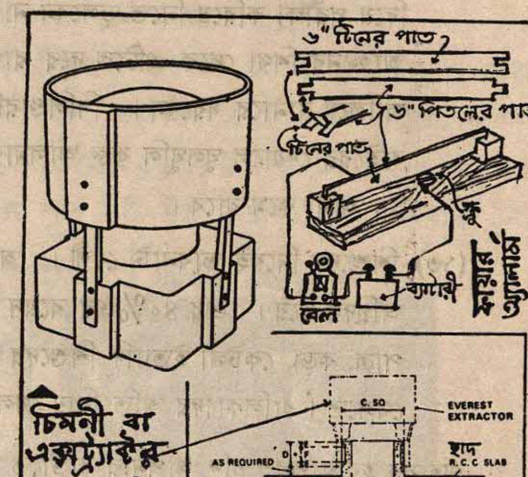
(৯) দেয়াল ও ছাদের ড্যাম্প থেকে বৈদ্যুতিক আগুন লাগে।

(১০) কেরোসিন, অ্যালকোহল ও স্পিরিটের বোতলের গায়ে নাম লিখে রাখুন। জলন্ত লণ্ঠন বা স্টোভে তেল ভরবেন না।

(১১) রাতে শোয়ার আগে, গ্যাস গিজার বন্ধ আছে কিনা দেখে নিন। নিবন্ত উনুন একেবারে নিবিয়ে দিন ('খারিজ' দেখেছেন ?)। বাড়ী ও আসবাবের অগ্নিবীমা করিয়ে রাখবেন।

(১২) রান্নাঘর বাবদ আছে কয়েকটি অনুশাসন ঃ

(ক) রান্নাঘর হবে ধুমপান নিষিদ্ধ এলাকা। (খ) সিন্থেটিক কাপড় পরে এখানে ঢোকা বারণ।



৮নং নকশা - অগ্নিপুরাণ-

(গ) রান্নার সময় আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেবেন ; আরো ভাল অ্যাপ্রন পরে নেবেন। রাঁধবার সময় এলোচুল একদম নিষিদ্ধ। চোখে চশমা বা গগ্‌লস পরে রান্না করা ভাল অভ্যাস। (ঘ) রান্নাঘরের আশেপাশে পেট্রল মজুত রাখা বিপদজ্জনক।

(ঙ) রান্নাঘরে এক বালতি জল হামেশা মজুত রাখবেন। (চ) গ্যাস সিলিণ্ডার কখনও শুইয়ে রাখবেন না, খোলা-লাগানোর ব্যাপারটা নিজে না করে ডিস্ট্রিবিউটারের মেকানিককে দিয়ে করাবেন। রিফিল সিলিণ্ডার লাগানোর সময় আশেপাশের সব অগ্নিশিখা নিবিয়ে ফেলুন। লাগানোর পর, রেগুলেটারের জয়েন্টগুলি সাবানের ফেনা দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে ভুলবেন না। রাবার টিউবটি কখনও টেনে খুলবেন না এবং আগুনের শিখা থেকে এটিকে দূরে রাখবেন। বার্নার ট্যাপ খোলার আগে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বার্নারে ধরবেন। সিলিণ্ডারটি কাউন্টারের তলায় একটি অ্যাসবেস্টসের ডালা ও বাইরের দেয়ালে ঘুলঘুলি যুক্ত আলমারীর মধ্যে রাখলে (৮ নং নকশা) আগুনের সম্ভাবনা ১৪ আনা কমে যাবে।

(১৩) শিশুদের নিয়েই ভাবনাটা বেশী। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার মৃত্যু ঘটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে। এর ৪০%এর বয়েস ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। গরম জল বা দুধের পাত্র, কড়া, কেটলী ইত্যাদি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। বাচ্চাদের দেশলাই নিয়ে খেলতে (বালিকাদের অতি প্রিয় খেলা-রান্নারান্না) দেবেন না।

এত সব হবার পরও যদি আপনার বাড়ীতে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায় তা হলে আপনার কর্তব্য হবে ৭ দফা ঃ

(১) সতরঞ্চি, তোষক, লেপ, কম্বল জাতীয় ভারী যে জিনিস হাতের কাছে পাবেন, জ্বলন্ত জায়গায় তাই দিয়ে চেপে ধরলে আগুন চট করে নিবে যাবে।

(২) ঘরোয়া আগুন সাধারণতঃ নিম্নাঙ্গেই লাগে। এক্ষেত্রে জ্বলন্ত মানুষটিকে জোর করে শুইয়ে দেবেন যাতে উর্ধ্বাঙ্গে আগুনের বিস্তার না হয়।

(৩) পোড়া জায়গা পরিষ্কার নেকড়া বা রুমালে মুড়ে ৫/১০ মিনিট ঠাণ্ডা জলে বা বরফে ডুবিয়ে রাখুন—ফোস্কা পড়বে না, যন্ত্রণা কমবে।

(৪) ফুলে ওঠার আগেই টাইট গেঞ্জি, মোজা, ব্লাউস, ব্রেসিয়ার, ঘড়ি, চুড়ি, আংটি, টাই, বেল্ট, জুতো খুলে দিন।

(৫) অ্যাসপিরিন জাতীয় অষুধ হাতের কাছে পেলে বড়দের গোটা একটা, ছোটদের আধখানা খাইয়ে দেবেন। ব্যথা কম হবে।

(৬) পোড়া জায়গায় সুফ্রামাইসিন বা বার্নল জাতীয় মলম লাগিয়ে গরম দুধ, চা, কফি বা অভাবে গরম জল কয়েক চুমুক খেতে দেবেন।

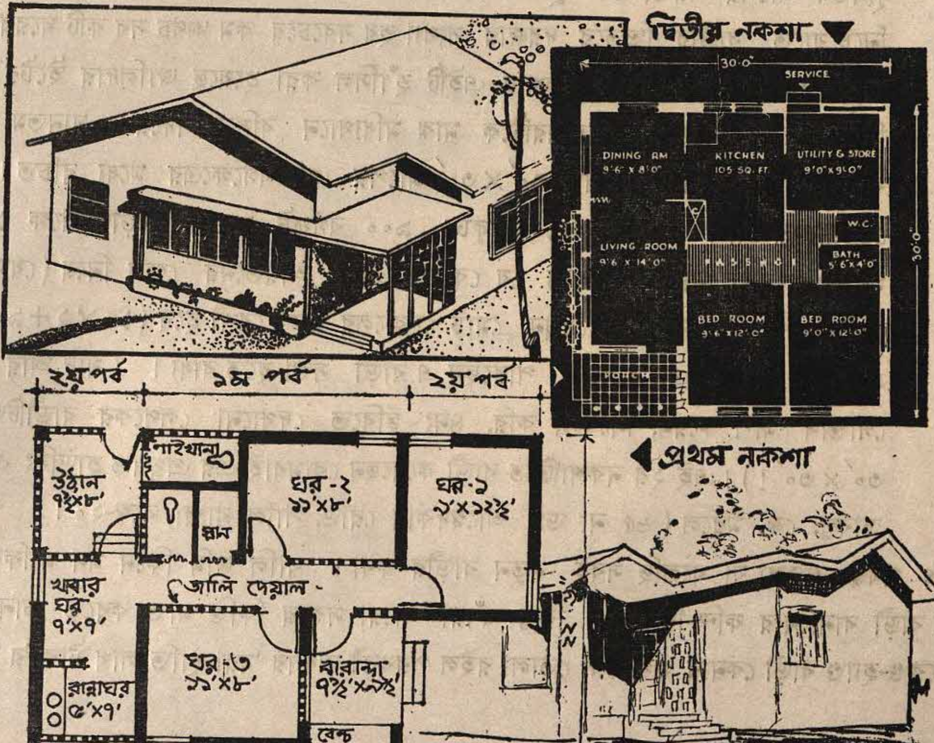
(৭) দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। (বই লেখা অতিশয় অপকর্ম্মো। তাই লিখতে হচ্ছে এ সব দফাওয়ারী উপদেশ। কিন্তু ভগবানের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা করি

নিরর্থক হোক এই সব দফা : কোন পাঠককে যেন কখনোই কাজে না লাগাতে হয় এই সব উপদেশ।)

● ওস্তাদের মার শেষ রাতে

পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে আমরা আর এক দফা সস্তায় বাড়ী করার প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করব মধ্যবিত্তদের উপযোগী দুটি চমৎকার নকশা ঘিরে (**৯নং নকশা**) :

১মটির আয়তন ৭৮০ বর্গফুট (৭২ বর্গ মিটার) বারান্দা ও উঠান ছাড়াও রয়েছে রান্না/খাওয়ার ঘর, স্নানঘর, একজোড়া পাইখানা এবং তিন তিনটি প্রমাণ সাইজের থাকবার ঘর। নিম্নবিত্ত বড় পরিবারের পক্ষে আদর্শ। তৈরী হয়েছে ত্রিবান্দ্রামের সেণ্টার স্টাডিজে। নকশাটি দুটি পর্বে তৈরি করা যায়—পয়লা পর্বে ২টি ঘর, বারান্দা, স্নান-পাইখানা নিয়ে



৯নং নকশা

৪৫০ বর্গ ফুটের (৪১ বর্গ মিঃ) মত ও দুসরা পর্বে ৩৩০ বর্গফুট (৩১ বর্গ মিঃ)। এই নকশায় প্রধান কৌশল হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ইটের জালিদার দেয়াল গঠন করা। এই দেয়াল খুব সস্তা, ঘরে প্রচুর আলো-বাতাস দেয় অথচ আব্রু বজায় রাখে। দামী দামী দরজা-জানলা ও গ্রীলের খরচ কমিয়ে দেয়। এ বাড়ীর গাঁথনীতে ব্যবহার করা হয়েছে

চুণ সুরকীর মসলা যা সিমেন্ট বালির তুলনায় অনেক সস্তা, ছোট বাড়ীর ক্ষেত্রে সমান মজবুত ও অনেক সহজে প্রাপ্য। এ বাড়ীর ঢালু ছাদ পোড়ামাটির টালির তৈরি—ঢালাই ছাদের থেকে সস্তা তো বটেই; জল ছাদেরও প্রয়োজন নেই। বর্ষার জল আপনি সরে যায়—রেন ওয়াটার পাইপ বাহুল্য মাত্র।

২য়টির আয়তন ৯০০ বর্গফুট (৮৩.৫ বর্গ মিঃ)। লম্বা খাবার-বসার ঘর ও ১০৫ বর্গফুট (৯.৭৫ বর্গ মিঃ) প্রকাণ্ড রান্নাঘর ছাড়াও রয়েছে ৩টি প্রমাণ সাইজের থাকবার কাজ করবার ঘর, বাথরুম, পাইখানা ও ছোট বারান্দা। নির্মাণকৌশলে ১ম নকশাটির সাথে বেশ মিল আছে। চুন সুরকীর দেয়াল, হালকা ঢালু ছাদ (অতএব ন্যূনতম ভিত) এবং প্ল্যানে প্রতিটি জায়গার সদ-ব্যবহার। এ ধরনের বাড়ীর যেটা মূল প্রয়োজন অর্থাৎ ন্যূনতম মাপের ঘরগুলিকে খুব সংবদ্ধ বা কমপ্যাক্ট করে সাজানো ন্যূনতম মাপের ছাদের নিচে যাতে বাড়ীর ভিতরে দরজার সংখ্যা হয় সবচেয়ে কম অথচ সব কটি ঘরের নিজস্ব আব্রু বজায় থাকে। ১ম নকশায় এইটি হাঁসিল করা হয়েছে জালিদার ইটের দেয়াল দিয়ে, এ ক্ষেত্রে দেখুন, রান্নাঘরটিকে মাঝ মধ্যিখানে বসিয়ে দিয়ে। ন্যূনতম ছাদের ব্যাপারটা দেখুন। নকশাটি ৩০´×৩০´ মাপের এক বর্গক্ষেত্রের মধ্যে রচিত। মোট দেওয়ালের মাপ ৩০´×৪=১২০ ফুট। ৯০০ বর্গফুট মাপের বাড়ীর পক্ষে ১২০ ফুট মাপের দেয়াল নিম্নতম। অন্য যে কোন একই আয়তনের ক্ষেত্র নিয়ে (যেমন ধরুন ১০´×৯০´=৯০০ বর্গফুট) দেখুন, মোট দেয়ালের মাপ বেশী হবে (১০×২+৯০×২=২০০ ফুট!)। অতএব বুঝতেই পারছেন এ বাড়ী সস্তা হতে বাধ্য। (যদি আর একদফা গোস্তখি মাপ করেন, নিবেদন করি, ৪নং ছবিতে দেখানো লেখকের বাড়ীটিও প্ল্যানে ৩০´×৩০´!)। এই ২য় নকশাটিতে বাড়ী করেছেন বোমবাই-এর প্রখ্যাত হাউসিং প্রমোটার ডাবলু. জে. মরলে (৬৫ নং ডঃ আম্বেদকার রোড, পালি, বান্দ্রা, বম্বে-২০।)

এ পর্যন্ত আমরা যা বলেছি সবই নতুন বাড়ীর কথা। খালি জমি কিনে মন মাফিক নকশা অনুযায়ী বাড়ী বানানোর ফন্দি-ফিকির। কিন্তু যাঁরা আরো সস্তায় কিস্তি মাত করতে চান, তাঁদের জন্য সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বাড়ী কেনার গুপ্ত কথা তোলা রইল পরবর্তী অধ্যায় 'মরা হাতি লাখ টাকা'য় '...'

৪

মরা হাতি লাখ টাকা

আমি ৬৩-৬৪ সালে সোনারপুর অঞ্চলে একটা বাড়ী করেছিলাম। সেই সময়কার কিছু বিল্ডিং মেটিরিয়ালের ক্যাশমেমো-ভাউচার সমেত একটি পুরানো হিসেবের খাতা আমার কাছে আছে। তাতে মালপত্রের যে সব দরদাম লেখা আছে তা শুধু কৌতুকবহই নয়, কৌতূহলও জাগায়। তুলনামূলক ভাবে কয়েকটির বর্তমান ও সেকালের দাম এখানে তুলে দিলাম:

নির্মাণ দ্রব্য	সেকালের দাম	একালের দাম	শতকরা মূল্যবৃদ্ধি
ইট—ফার্স্ট ক্লাস	৬৮ টাকা প্রতি হাজার	৭৫০ টাকা প্রতি হাজার	১১০৩%
বালি—মাঝারী	৬২ টাকা ট্রাক প্রতি	৪৩০ টাকা ট্রাক প্রতি	৬৯৪%
কাঠ—শাল	১২ টাকা কিউবিক ফুটে	১০০ টাকা কিউবিক ফুটে	৮৩৩%
কাঠ—সেগুন	১৬ টাকা " "	১৮০ টাকা " "	১১২৫%
সিমেন্ট	৬ টাকা ব্যাগ প্রতি	৬৫ টাকা ব্যাগ প্রতি	১০৮৩%
সেলিং ইট—	৬০ টাকা প্রতি হাজার	৭০০ টাকা প্রতি হাজার	১১৬৭%
লোহার ছড়	৩৮০ টাকা টন প্রতি	৫৫০০ টাকা টন প্রতি	১৪৪৭%
লোহার গ্রীল	২ টাকা বর্গফুটে	১৮ টাকা বর্গফুটে	৯০০%
মোজাইক টালী (সাদা ও রঙ্গীন)	১/২৫ পঃ "	১৫ টাকা "	১২০০%
নির্মাণের গড় খরচ	১৬ টাকা বর্গফুটে	১২৫ টাকা বর্গফুটে	৭৮১%

● আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ

আমার ৯০০ বর্গফুটের দোতলা বাড়ীটি (**৪নং চিত্র**) বানাতে খরচ পড়েছিল ২৯,০০০ টাকার মত। সেই সাথে যোগ করতে হবে কাঠা প্রতি ৮০০ টাকা দরে পাঁচকাঠা জমির দাম ৪০০০ টাকা। একুনে ৩৩ হাজার। গত দুই দশকে এ বাড়ীর যৌবনে ছিড় খেয়েছে, চুলের ফাঁকে ফাঁকে ধরেছে রূপালী রং, রংচটা দেয়ালে ছাদে দেখা দিয়েছে সূক্ষ্ম ফাটল—বিগত যৌবনার বিবর্ণ ত্বকে ফুটে ওঠা বলিরেখার মত। তাই তার বাজারদরও এবার পড়তির দিকে, নিম্নমুখী। মূল্যায়ক (valuer)-দের মতে এই

দাম বছরে ·৫% করে কমতে থাকে। তবে সাধারণ নিয়মেই জমির দাম বছর বছর বেড়ে চলেছে বলে (এ বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ১০%) এ পড়তি পুষিয়ে যায়। যেমন ধরুন ৪নং চিত্রের বাড়িটির ৮২ সালের মূল্যায়ন :

(ক) বাড়ী—২৯০০০ টাকা – ২৬১০ টাকা = ২৬,৩৯০ টাকা

(খ) জমি — ৪০০০ টাকা + ৭২০০ টাকা = ১১,২০০ টাকা

মোট ৩৭,৫৯০ টাকা

অর্থাৎ ৮২ সালে আমার বাড়ী বিক্রি করতে চাইলে যদি আপনি হাজার চল্লিশেক দর দিতেন তাহলে আমার ড্যাম গ্ল্যাড হয়ে বাড়ী বেচে দেওয়া উচিত ছিল।

যেহেতু আমি দিই নি অতএব আপনাকে বাড়ী তৈরি করতে হয়েছে। যেহেতু আমার বাড়ীটা আপনার 'বহুৎ পসন্দ' হয়েছিল আপনার বাড়ীটিও ঠিক ৪নং ছবির ডুপ্লিকেট। এবং ধরে নেওয়া যাক তৈরিও হয়েছে ৮২ সালেই। দেখা যাক এ বাড়ী বানাতে আপনার নগদ কত খসল :

(ক) বাড়ী — ১৮০০ বর্গফুট ১২৫ টাকা দামে — ২,২৫,০০০ টাকা

(খ) জমি — ৫ কাঠা (আগের হিসাব মাফিক)— ১১,২০০ টাকা

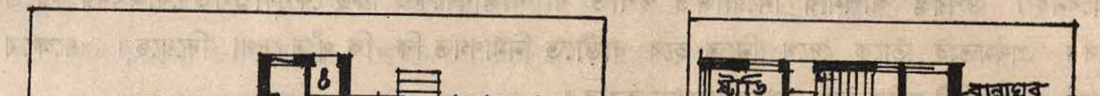
মোট ২,৩৬,২০০ টাকা

বাড়ীটি অবশ্যই আপনার নবযৌবনা, আর শতবৎসর আয়ু থেকে ১৮ টি বছর খসে যায় নি কিন্তু এ ছাড়া সবদিক দিয়েই আপনার আমার দুটি বাড়ীরই পাল্লা সমান ভারী। যেহেতু আপনার বাগানের গাছে টাকা ফলে না অতএব এতক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছেন যে চল্লিশে বেঁকে না বসে পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশের বাউন্সার হাঁকড়ে, আমাকে ক্লিন-বোল্ড করে আমার গেটে আপনার নেমপ্লেট ঝুলিয়ে দেওয়াই আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হত। তাই তো বলছিলাম '**মরা হাতি লাখ টাকা**'। আপনার পুঁজি যদি লাখ না ছাড়ায়, তা হলে মরা হাতিই সওদা করুন ; আখেরে জিতবেন।

● সুবুদ্ধির জয়

এমনি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন জঙ্গীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত সরকার (বিচক্ষণ তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানী, ডক্টরেট পেতে চলেছেন)। ওঁর জন্যে আমি ওঁর জঙ্গীপুরের জমিদারীতে (১·৬ কাঠা জমি) তৈরি করার জন্য প্ল্যান বানিয়েছিলাম (**১০ নং নকশা**) ১৯৭৬-৭৭ এ। দোতলার ভিত দিয়ে ৭৬০ বর্গফুটের এই একতলা বাড়ীটির তৎকালীন এস্টিমেট এসেছিল ৪৯,৮০০ টাকা। নকশা পাস করানোর সময় সত্যবাবুর ছেলে রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর স্কুলে ভর্তি হল। সত্যবাবুও দীর্ঘমেয়াদী স্টাডি-লিভে কোলকাতার সায়েন্স কলেজে যোগ দিলেন। কাজেই তখনকার মত ভেস্তে গেল জঙ্গীপুরে বাড়ী করার উদ্যোগ। ইত্যবসরে আমাদের উভয়ের সাধারণ বন্ধু (সাধারণ কথাটা Common-এর তর্জমা মাত্র, আসলে বন্ধু হিসাবে উনি অসাধারণ) নরেন্দ্রপুর মিশনের পোলট্রি ও ডেয়ারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী ঔদার্যময়

মিত্র মশাই (নামে স্বভাবে এমন মিল খুব কম দেখা যায়) খোঁজ আনলেন সোনারপুর থেকে সিকি মাইল দূরে দোতলা ভিতের একতলা বাড়ীর সন্ধান। ৮৬৪ বর্গফুট আয়তন (**১০ নং নকশা**)। সওদা হল ৩০,০০০ টাকায়। পাঠক, আপনি তো গৃহীর গাইডের পয়লা ভাগ বেমালুম হজম করে এবার একেবারে কড়মড়িয়ে কামড় বসিয়েছেন তুসরা ভাগে। অর্থাৎ আপনারও তো মেলাই এলেম। ১০ নং নকশা দেখে নিজেই যাচাই করে নিন সত্যবাবু জিতলেন, না হারলেন।



আপনি অবশ্য একটা তর্ক তুলতে পারেন। সত্যবাবুর জঙ্গীপুরী নকশায় যে যে চাহিদা মেটান হয়েছিল (তুটি শয়ন ঘর, আলাদা আলাদা বাথরুম পাইখানা, বড়সড় খাবার হল, ছাত্র পড়ানোর পুচকে ঘর, বারান্দা, ছাদের সিঁড়ি) সবই প্রায় দেড়া সাইজে তিনি পেয়ে গেছেন সোনারপুরী বাড়ীতে। এটা কিন্তু ভাগ্যবানের বোঝা যা ভগবান বয়ে দিয়েছেন শরীফমেজাজে। সবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেটা হবে না। তৈরি বাড়ীর নকশায় ও গঠনে চাহিদার সঙ্গে খানিকটা ফারাক থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিঃসন্তান 'ক' সাহেবের তৈরি আড়াই কামরার বাড়ী কিনে কি ভাবে কুলোবেন এগারোটি নাবালক সন্তান-সন্ততির পিতা 'খ' বাবু কিম্বা বিশ্বনাস্তিক 'গ' মিঞার বাড়ীতে কোথায় পূজো পাঠ সারবেন পরম বৈষ্ণব পূজ্যপাদ 'ঘ' দাস ?

● **নবীভবন**

আজ্ঞে হ্যাঁ, এর উত্তরে আসবে পূর্তবিজ্ঞানের সেই অতি-পরিচিত শব্দটি—REMODELLING বা **পুনর্গঠন**। পুনর্গঠনের মাধ্যমে সস্তায় কিস্তিমাত হয় বলে এটি পূর্ত বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

দেশ-বিদেশে বহু স্থপতি ও বাস্তুবিদ আছেন যাঁরা সারা জীবন কেবল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ও তদারকী করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এই সব বিশেষজ্ঞের হাতে পড়লে যে কোন জিনিস থেকে চাহিদা মাফিক আবাসন যে গড়ে তোলা যায় তার অতি বিস্ময়কর প্রমাণ রয়েছে এই অধ্যায়ের শেষাংশে বিচিত্র সব বাসস্থানের বিবরণে। আপাততঃ আমরা শিখব পুরানো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বাড়ী কেনার ধরন-করণ পদ্ধতি। জমি কেনার সময়ও বেশ কিছু গোয়েন্দাগিরি করা হয়। বাড়ী কেনার সময় সেগুলি তো উকিল বাবু করবেনই। উপরন্তু আপনার নিয়োজিত স্থপতি বা বাস্তুবিদকেও কিছু ফেলুদাসুলভ খোঁজখবর করতে হবে। প্রথমতঃই তাঁকে দেখে নিতে হবে বাড়ীতে নির্মাণগত কি কি খুঁত দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে নিচের প্রশ্নমালাটি সঠিক উত্তর পেতে সাহায্য করবে ঃ

● **প্রশ্নমালা (ফেলুদার জেরা)**

(১) ছাদে কোন ফাটল আছে কি ? থাকলে তা দিয়ে বর্ষাকালে জল পড়ে কি ?

(২) দেয়ালে কোন ফাটল আছে কি ? থাকলে তা ছাদ ও মেঝের সাথে সমান্তরাল, আড়াআড়ি, না খাড়া ?

(৩) দেয়াল ও ছাদে কোন ড্যাম্পের চিহ্ন আছে কি ? চিহ্ন থাকলে সেগুলো শুকনো জলের দাগ —না, সাদা গুঁড়ি গুঁড়ি নোনার দাগ ?

(৪) ছাদ ও দেয়ালের প্লাস্টার কি কোথাও ফোস্কার মত ফাঁপা ঢপঢপে ? লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলে কি তা খসে খসে পড়ে ?

(৫) ঘরের ভিতর বাইরের রং কি জাতীয় (চুনকাম, সিমেন্ট পেন্ট, প্লাস্টিক পেন্ট বা ডিস্টেম্পার) ও তা কি বিবর্ণ হয়ে গেছে বা চটা উঠে গেছে ?

(৬) মেঝে কোথাও ফেটে, বসে বা বিবর্ণ হয়ে গেছে ?

(৭) দরজা-জানলার চৌকাঠ বা পাল্লাতে কোথাও উই বা ঘুন লেগেছে কি ?

(৮) ছিটকানিগুলো ঠিক মত লাগে কি ?

(৯) ছাদের রেন-ওয়াটার পাইপগুলি কি জ্যাম হয়ে আছে ?

(১০) পাইখানার জল ঠিক মত নিষ্কাশিত হয় কিনা ?

(১১) জলের পাইপগুলি লিক করে কি ? সেডিমেন্ট জমে পাইপের ধারা কি সরু ক্ষীণ হয়ে গেছে ?

(১২) জলছাদ থাকলে তার অবস্থা কি রকম ? কোন মেরামতি দরকার কি ?

এই এক ডজন প্রশ্নোত্তরের সাথে বাস্তুবিদকে মাটি খুঁড়িয়ে দেখে নিতে হবে ভিত কতটা মজবুত ও ভবিষ্যতে আরো কয়তলা যোগ করা যাবে। টিউবওয়েল থাকলে সম্ভবক্ষেত্রে যে মিস্ত্রী টিউবওয়েল পুঁতেছিল তার কাছ থেকে গোপনে জেনে নিতে হবে টিউবওয়েলের গভীরতা। বাড়ী কর্পোরেশন বা মিউনিপ্যালিটির এলাকাধীন হলে তাঁদের দপ্তর থেকে খোঁজ নিতে হবে বাড়ীর কোন অংশ নকশা-বহির্ভূত বেআইনী ভাবে নির্মিত কিনা এবং এ বিষয়ে কোন নোটিস বা মামলা জারী করা হয়েছে কিনা।

● **কারো যদি শখ থাকে ট্যাঁশ গরু কিনতে,**
সস্তায় দিতে পারি, দেখ ভেবে চিন্তে।

এই সব খবর ও বাড়ীর সঠিক নকশা পেলে আপনার স্থপতি বা বাস্তুবিদ ওই বাড়ীর বর্তমান মূল্যমান (Present Valuation) ও মেরামতি বাবদ এস্টিমেট তৈরি করে দেবেন। এইবার আপনি বর্তমান মালিকের সাথে দরাদরি শুরু করতে পারেন। দরে পট্‌লে এবার আসরে নামাতে হবে উকিল বাবুকে। বায়নানামা রচনা করে আগাম দেওয়া ; কাগজপত্র হস্তান্তর ; রেজিস্ট্রী অফিসে খোঁজখবর, সার্চ ; দলিল রচনা ও রেজিস্ট্রী। শেষমেশ মিষ্টির হাঁড়ি বগলে গৃহপ্রবেশ।

এরপর আবার আসরে ঢুকবেন বাস্তুবিদ। ছোটখাট মেরামত তো বটেই ; প্রয়োজনে পরিকল্পনা নিতে হবে বড়সড় পুনর্গঠন বা রিমডেলিং-এর।

এইবার আমরা ঢুকছি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে দরকারী অংশে (অতএব পাঠক—সোজা হন, সজাগ হন, মনোযোগী হন)···আমরা এবার হাতেকলমে শিখব মেরামতি ও পুনর্গঠনের নানান কলাকৌশল।

ক. দেয়াল ঘামা বন্ধ করতে হবে।

সাধারণতঃ বাইরের দেয়ালের ভিতর পিঠে বাইরের দিক থেকে ড্যাম্প লিক করে এসে দেয়ালকে ভিজিয়ে তোলে। এতে রং নষ্ট হয়, দেয়ালের গায়ে ছোপ ধরে, ওয়াল পেপার থাকলে নষ্ট হয়ে যায় এবং সাধারণ ভাবে ঘরের ভিতরটাকে অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এই ড্যাম্প বাইরে থেকে না এসে ভিত থেকেও উঠে আসতে পারে—বিশেষতঃ পুরানো বাড়ীতে যেখানে দেয়ালের গোড়ায় জল-নিরোধক স্তর (ড্যাম্পপ্রুফ কোর্স) দেওয়া হত না।

প্রথমেই একটা স্বীকারোক্তি করে নেওয়া যাক। এই বাবদে মেলাই পণ্ডিত পাওয়া যায় যে সব মুনিরা ড্যাম্প সারাইয়ের বাবদে নানান মত, নানান পথ বাৎলে থাকেন। ড্যাম্প বন্ধ করা দাওয়াই বাজারে পাওয়া যায় অন্ততঃ বিশ রকম। কেউ গ্যারান্টি দেন ৫ বছরের, কেউ ১০ বছরের। ওই সব গ্যারান্টি-ওয়ালারা নিজেরা ১০ বছর টিকে থাকবেন কিনা তার কোন গ্যারান্টি অবশ্যই নেই। (এক ক্ষেত্রে, এই রকম এক গ্যারান্টি-ওয়ালাকে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করি শ্রীমান তাঁর বিলাতী মেম সাহেবের ন্যাজ, থুড়ি, আঁচল ধরে সটকে পড়েছেন শ্বশুর বাড়ীতে। এদেশীয় ব্রিচ অব্ কনট্রাক্টের সমন নাকি ওদেশে আর জারী করা যায় না)। যাক, মোদ্দা স্বীকারোক্তিতে আসা যাক। ড্যাম্প হয় 'ক্যাপিলারী অ্যাকসান' নামক এক প্রাকৃতিক নিয়মে···ওপরওয়ালার আদেশে। যে যতই বুকনী ঝাড়ুক, মানুষের ক্ষমতা নেই তাকে বন্ধ করার। বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেটাকে মেনে নিয়ে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে কুশ্রীতাটুকুকে চোখের আড়াল করা (আমাদের বন্ধু বাদাম ঘোষ তার টেরা বউ পেস্তাকে ডাইভোর্স না করে স্রেফ গগসল্ পরিয়ে রেখে সব দিক সামলে নিয়েছে)।

বাজারে যে সব অনুপান পাওয়া যায় তা মসলায় মিশিয়ে নতুন প্লাস্টার করলে দু চার বছর ঠেকাতে পারবেন ড্যাম্পকে। তারপর যে-কে সেই! পণ্ডিতেরা আর একটি পথ বাৎলান তা হল জলরোধক

পেন্ট লাগানো। ১১ লিটার প্যারাফিন, ৯ লিটার বেনজোলিন ও ৬ কেজি রেজিন, ১১ কেজি হোয়াইটিং এর সাথে মেড়ে মেশাতে হবে। এই মিশ্রণটি ভিজে অবস্থায় ড্যাম্প দেয়ালে মাখিয়ে দিলে, দেয়াল শুকোলে ড্যাম্পের দাগ মিলিয়ে যাবে। পেন্টটির সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবে অভিজ্ঞ বন্ধুদের কাছে শুনেছি ভাল ফল পেতে হলে পেন্টটি বছর বছর লাগিয়ে যেতে হয়। অনেকে স্কার্টিং বরাবর দেয়ালের প্লাস্টার এক ইঞ্চি চওড়া করে কেটে ফেলতে বলেন। করবেন না, ওতে প্লাস্টার জখম করা ছাড়া কোন ফল হয় না।

সত্যিকার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা যদি নিতে হয়ই (এটি কিন্তু একটু খরচ সাপেক্ষ) তাহলে নোনাধরা দেয়ালের গায়ে ৬০ সেন্টিমিটার বাদ বাদ ২৫ মি. মি. চওড়া, ১২ মি. মি. পুরু কাঠের ব্যাটেন (যা দিয়ে ইলেট্রিকের সারফেস ওয়ারিং করা হয়) আটকে দিন। এর উপর পিতলের স্ক্রু দিয়ে লাগাতে হবে ৬০ সে. মি. × ৬৪ সে. মি. মাপের ১২ মি. মি, পুরু প্লাস্টার বোর্ড।(ফল্‌স সিলিং কনট্রাক্টারের কাছে তৈরিই পাবেন)। বোর্ডের জোড়গুলো মিলিয়ে রং করে দিলে অন্য দেয়ালের সাথে কোন তফাৎ খুঁজে পাবেন না, গগল্‌স পরানো পেস্তার মত।

খ. ভাঙ্গা-ফাটা মেঝেকে দিতে হবে নবজীবন।

পুরো ঘরটিতে মনোমত রং-এর লিনোলিয়াম টালি বা মার্বেলেক্স টালি লাগিয়ে নিন। এ গুলি মাত্র ৪/৫ মি. মি. পুরু হয় ও পাতলা আঠা দিয়ে মেঝেতে সাঁটা হয় বলে পাশের ঘরের মেঝে থেকে বেমানান ভাবে উঁচু হয়ে যায় না। এই টালিগুলি খুব টেঁকসই ; শীতে গরম এবং গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকে বলে আরামপ্রদ হয়। উজ্জ্বল বর্ণ বৈচিত্র্যও এর বিশেষত্ব। দাম মোটামুটি সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে।

গ. জলছাদ জখম : ঘরে বর্ষার জল পড়া বন্ধ করতে হবে।

জলছাদের উপরের অর্ধেক গভীরতা হালকা ছোট ছেনি দিয়ে তুলে ফেলে অবশিষ্ট জলছাদের উপরটা ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে ধুলোময়লা, ভাঙ্গা জলছাদের গুঁড়ো বা আলগা টুকরো থেকে না যায়। এবার নতুন করে মাখা টাটকা জলছাদের মসলা অর্ধেক গভীরতার সমান করে বিছিয়ে যথারীতি কাঠের থাপি দিয়ে পিটিয়ে (জলছাদ করার পদ্ধতি ১ম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে দেয়া আছে, দেখে নেবেন। এখানে তার পুনরুল্লেখ করে পাতা নষ্ট করলাম না। ১ম খণ্ড এখনো কেনেন নি ?? সে কি মশাই, আপনি তো দেখছি অরুণবাবুকে ডোবাবেন ; সেই সঙ্গে এই অধমকেও !) আগের মত পুরু ও ঢাল করে মেজে নিন। আগামী ১২/১৪ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। তবে বর্গফুটে খরচ পড়বে আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা মত।

যদি মনে হয় খরচটা আপনার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে তা হলে ছাদের আয়তনের বর্গমিটার প্রতি ১ কেজি হিসাবে পিচ কিনে আনুন। তাকে গরম করে গলিয়ে তারের বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার ছাদে ভাল করে নিশ্ছিদ্র প্রলেপে মাখিয়ে দিন। পিচের প্রলেপ অযথা মোটা করবেন না। পিচ মাখানো

ছাদের উপর শুকনো বালি ছড়িয়ে দিন। দেখবেন জল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, অন্ততঃ ৪/৫ বছরের জন্য। জলছাদের তুলনায় খরচা অতি সামান্যই। পিচের বদলে বাজারে এই বাবদ যে সব জল নিরোধক সলিউশন পাওয়া যায় তাও লাগাতে পারেন। তবে এ সবের কোনটার স্থায়িত্বই ৪/৫ বছরের বেশী না।

টিন বা অ্যাসবেস্টাসের ছাদ হলে পিচ-চট (Tar Felt) লাগানোই একমাত্র সমাধান। চটের আয়ু ৫/৭ বছর।

ঘ. পলেস্তারা ফুটিফাটি : মেরামতি চাই।

প্লাস্টারে ফাট ধরতে পারে দু কারণে :

(ক) গভীর ফাটল—দেয়াল ও ভিত বসা বা হেলে যাওয়ার দরুন সৃষ্টি হয় এই ফাটলের, যা অনেক সময় দেয়ালের এপার থেকে ওপার অবধি প্রসারিত হয়। সাধারণতঃ বেশ মোটা ছাদের সঙ্গে সমান্তরাল বা আড়াআড়ি ভাবে ঢালু স্পষ্ট একটি ফাটল দেখা দেয় দুই দেয়ালের বা ছাদ ও দেয়ালের কোণে অথবা দরজা-জানলার মাথা বরাবর।

(খ) অগভীর ফাটল—প্লাস্টার শুকনো হলে, প্লাস্টার করার আগে-পরে যে দেয়াল ভিজানোর নিয়ম আছে তাতে অপ্রতুলতা থাকলে বা সিমেন্ট কিম্বা বালিতে মাটি মিশেল থাকলে শুকোনোর পর প্লাস্টারের এক ধরনের সূক্ষ্ম জালি জালি ফাটল দেখা দেয়। এগুলি মেরামত করার দরকার হয় না—কালক্রমে রং-এর তলায় চাপা পড়ে যায়।

এ ছাড়া পুরানো প্লাস্টার অনেক সময় দেয়াল থেকে আল্গা হয়ে ঢপ্ ঢপ্ করেও কালক্রমে খসে পড়ে। বাড়ী কেনার পর আপনার উচিত এই সব খসে পড়া প্লাস্টার ও গভীর ফাটলগুলি মেরামত করে নেওয়া। এগুলি বাড়ীর দীর্ঘায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর।

গভীর ফাটলগুলিকে চওড়া ও গভীরতর করে কেটে নিন। খসে পড়া প্লাস্টারের চারপাশ থেকে আরো কিছুটা করে শক্ত ভাল প্লাস্টার খসিয়ে নিন। এবার জায়গাটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে ৪ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেন্টের মসলা দিয়ে চেপে চেপে প্লাস্টার করুন দেয়াল ভিজে থাকা অবস্থাতেই। কোথাও মসলার গভীরতা যদি ২৫ মি. মি. এর বেশী হয়ে যায় তা হলে প্লাস্টার করবেন দুই স্তরে এবং তলার স্তরে কিছু ছোট (১/৪ ইঞ্চি মাপের) পাথর কুচি মিশিয়ে নেবেন। এক এক সময় দেখা যায় এক আধটা বিচ্ছু ফাটল কিছুতেই বাগ মানতে চায় না। যতই সযত্নে মেরামত করুন, বছর বছর নতুন করে ফুটে ওঠে একই জায়গায়। এ ক্ষেত্রে ফাটল বরাবর ৪/৬ ইঞ্চি বাদে বাদে দেয়াল কেটে ৬ মি. মি. মোটা লোহার ছড়ের তৈরি 'ইউ' হুক ('U' hook) ফাটলের উপর আড়াআড়ি করে বসিয়ে কংক্রীট (১ : ১$\frac{১}{২}$: ৩) দিয়ে জ্যাম করে দিতে হবে। একে মিস্ত্রীদের ভাষায় বলে দেয়াল সেলাই করা। এর পর প্লাস্টার করে দিলে দেখবেন ফাটল মশাই একদম জব্দ হয়ে গেছেন (**১১ নং নকশা**)।

ঙ. বাথরুম-কিচেনের গ্লেজড টালি পাল্টাতে হবে।

থেকে থেকে ঝপ্ ঝপ্ করে খুলে পড়ে যায় এক আধটা টালি অথবা প'ড়ো প'ড়ো হয়ে ঝুলে থাকে। সব নড়বড়ে ঢপ ঢপে টালিগুলোকে ছুরির আগা দিয়ে খুলে নিয়ে, জায়গাগুলো ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিন। যে নতুন টালিগুলি লাগাবেন তা এক রাত্রি জলে ডুবিয়ে রেখে পরের দিন ৩ : ১ ভাগের সিমেন্ট মসলা পিছনে লাগিয়ে চেপে বসিয়ে দিন ভিজে দেয়ালে। ভিজে অবস্থাতেই চারপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা বাড়তি মসলা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করে মুছে নিন ও জোড়গুলি সাদা প্লাস্টার অব্ প্যারিস দিয়ে ঢেকে দিন। মসলা না শুকোনো অবধি টালিগুলি ছোঁবেন না।

চ. উই লাগার চিকিৎসা দরকার।

চৌকাঠ ও পাল্লার যে সব অংশ উই লেগে ফোঁপরা হয়ে গেছে সেগুলিকে কেটে বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ওই সব অংশে নতুন যে কাঠ লাগানো হবে তাতে ভাল করে আলকাতরা মাখিয়ে নেওয়া দরকার ও পুরানো অংশের সঙ্গে শক্ত করে (প্রয়োজন হলে লোহার পাত দিয়ে) স্ক্রু লাগিয়ে এঁটে নেওয়া দরকার। নতুন কাঠ লাগাবার আগে কেরোসিনে ৫ শতাংশ অলড্রিন বা ডায়ালড্রিন অথবা হেপ্টাক্লোর সলিউশন তৈরি করে উই-এর গর্ত ও ফাঁকফোকর বেশ করে ভাসিয়ে দিতে হবে। মেঝে ও দেয়ালের সংযোগস্থলে ফাটল থাকলে তার মধ্যেও ওই অষুধ চালান করে দিতে হবে। চৌকাঠ ও দেয়ালের মাঝে ইনজেকশনের সিরিঞ্জে করে অষুধ ঢুকিয়ে দিতে পারলেও ভাল ফল হয়। সবচেয়ে ভাল ফল পেতে হলে কাঠের পুরানো রং তুলে ফেলে কাঠের গায়ে তুলি দিয়ে বারবার অষুধ লাগাতে হবে যাতে কাঠ ভিজিয়ে অষুধ তার আঁশের ভিতর ঢুকে যায়। এরপর কাঠ শুকোলে তার উপর তেল রং করে দিন। সাত পুরুষেও ওই কাঠে উই লাগবে না।

তবে অলড্রিন মারাত্মক বিষ বলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হলে লাইসেন্স দরকার হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, উই পোকা দমনের কাজটা ওই ধরনের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ কোন কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দিন। তাতে কাজটা হবে সুষ্ঠু, দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকবে না বিশেষ।

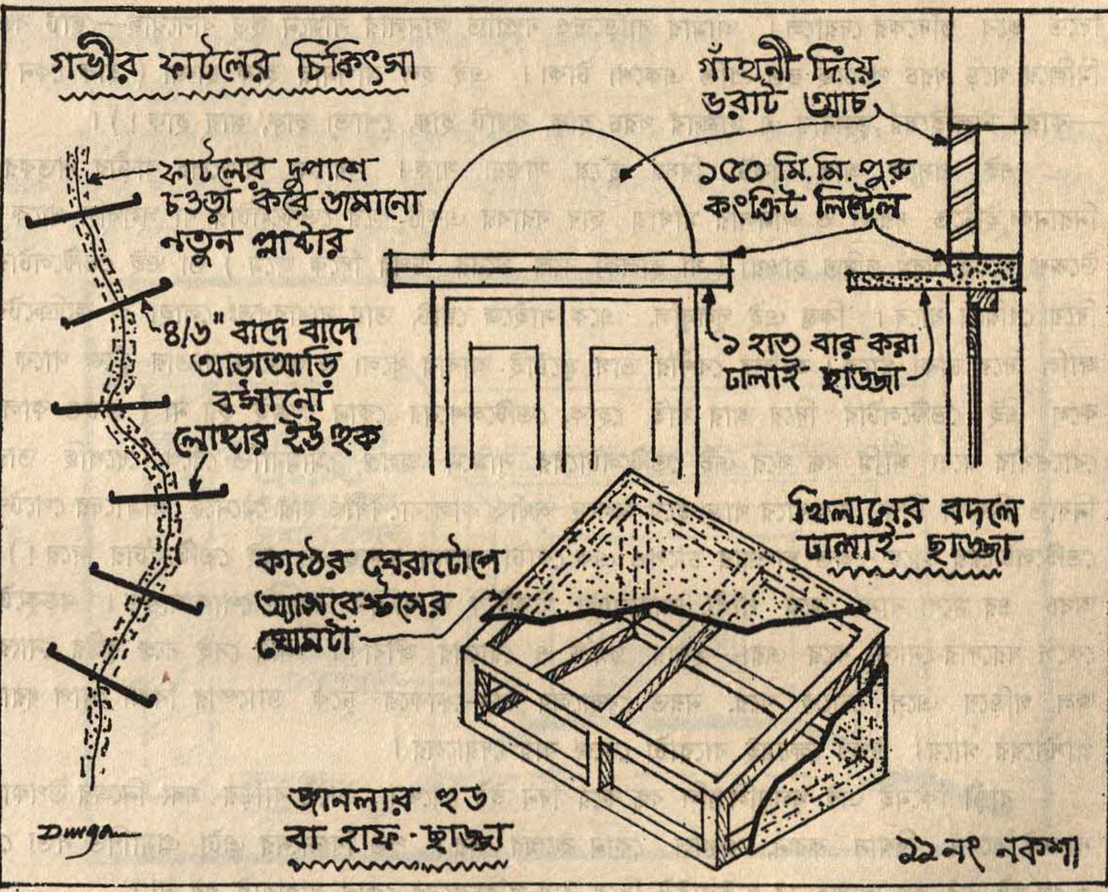
ছ. বৃষ্টির ছাঁটে ঘর ভেসে যায় : ব্যবস্থা চাই।

পুরোনো আমলের বাড়িতে দরজা বা জানলার উপর খিলান করা থাকে। তার উপর বড়জোর পলেস্তারা জমিয়ে অগভীর বাহারী কার্নিশ থাকে যা রোদ-বৃষ্টি আটকানোর কাজে কোন সাহায্যই করতে পারে না। কালক্রমে এই সব দরজা-জানলার চৌকাট, ভাঁজপাল্লা বা সাবেকি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জল ঢুকতে থাকে, ভাসিয়ে দেয় ঘরদোর।

আধুনিক বাড়িতে দরজা-জানলার মাথায় একটা টানা কংক্রীটের ঢালাই থাকে যাকে বলে লিনটেল। বাইরের দেয়ালে বসানো দরজা-জানলার ক্ষেত্রে একদেড় হাত বেরিয়ে থাকে একটি ঢালাই কার্নিশ বা ছাজ্জা (chajja)। অনেকটা ক্রিকেটের কাউন্টি ক্যাপের সামনে যে হাতলের মত অংশটা

বেরিয়ে থাকে (উভয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই—কাউন্টি ক্যাপের এই অংশটা ক্রিকেটারের চোখজোড়াকে বাঁচায় রোদের ঝলসানি থেকে) তার মত। বাড়ির সাদামাটা চেহারায় জাঁকজমক আনা ছাড়াও ছাজ্জার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘরকে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানো।

পুরোনো বাড়িতে যদি খিলানের শোভা বাদ দিতে রাজি থাকেন তা হলে এ ধরনের ছাজ্জার ব্যবস্থা করা যায় (**১১ নং নকশা**)। প্রথমে খিলানটিকে কাঠের তক্তা ও বাঁশ বা শালখুঁটি দিয়ে খুব ভাল ভাবে ঠেকা দিয়ে নিন। তারপর দরজার বা জানলার মাথা বরাবর যেখান থেকে খিলান শুরু হয়েছে সেখানে



দুপাশের দেয়ালে ১৫০ মি. মি. গভীর করে দেয়াল কেটে নিন এপার থেকে ওপার। কাটা দুটির উচ্চতাও হবে ১৫০ মি. মি.। এবার ডানদিকের গর্তের ডান প্রান্ত থেকে বাঁ দিকের গর্তের বাঁ প্রান্ত অবধি দেয়ালের সমান চওড়া করে ১৫০ মি. মি. পুরু কংক্রীটের লিনটেল ঢেলে নিন। সেই সঙ্গে ১ হাত বার করা ছাজ্জাও। কেবল লিনটেল হলে (ধরুন ঘর থেকে ঘরে যাবার কোন দরজার মাথায়) মেঝেতে

আলাদা করে ঢেলে নিয়ে, জমাট বেঁধে গেলে তা খিলানের নিচে বসিয়ে দেওয়া যায়। তাতে খিলানের তলদেশে কাঠের তক্তা দিয়ে আর সাটারিং করার দরকার হয় না। তবে ছাজ্জা করার বায়নাক্কা থাকলে খিলানের তলায় সাটারিং করে ঢালাই করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে ছাজ্জার গঠনগত মজবুতি বাড়ে। এভাবে ঢালাই পর্ব শেষ হলে লিনটেলের উপরে যে আধখানা চাঁদের মত খোলা জায়গাটা থাকবে তা গাঁথনী করে ভরে দিন। ছাজ্জা যদি ঢালাই করে করার রেস্ত ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করার ক্ষমতা আপনার না থাকে তা হলে কাঠের ব্রাকেট বা ঘেরাটোপ (**১১ নং নকশা**) বানিয়ে তা প্লেন গ্যালভানাইজড টিন বা প্লেন অ্যাসবেস্টাস চাদর দিয়ে ছেয়ে পুরো ঘোমটাটাকে বড় স্ক্রু ও রাওল প্লাগ দিয়ে খিলানের সামনে আটকে দিতে হবে দুদিকের দেয়ালে। আমার বাড়িতেও সম্প্রতি জানলার সামনে হুড বসিয়েছি—ছোট বড় মিলিয়ে গড়ে খরচ পড়েছে হুড প্রতি একশো টাকা। এই হল আপনার হাফ ছাজ্জা (হাফ কেন? —কারণ ঢালাইয়ের তুলনায় এ ছাজ্জার খরচ হাফ, ঝঞ্ঝাট হাফ, শোভা হাফ, আয়ু হাফ!)।

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় ছুঁয়ে যাওয়া যাক। পুরানো আমলের বাড়ীর শতকরা নিরানব্বুইটিতে দরজা ও জানলার মাথায় ছাদ বরাবর একটি করে ভেন্টিলেটার বা ঘুলঘুলি থাকে। উদ্দেশ্য ঘরের গরম দুষিত হাওয়া (যা হালকা বলে ঘরের উপর দিকে জমে) তা ওই ভেন্টিলেটার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এই ঘুলঘুলি, একে সাইজে ছোট, তায় সাধারণতঃ লোহা বা কংক্রিটের জালি দিয়ে ঢাকা থাকে। জালির বেশীর ভাগ ফুটোই আবার ধুলো ও শুকনো পাতায় বুঁজে থাকে। ফলে এই ভেন্টিলেটার দিয়ে আর যাই হোক, ভেন্টিলেশনের কোন কাজই হয় না (প্রচণ্ড কাল-বোশেখীর মধ্যে আমি বন্ধ ঘরে এই ভেন্টিলেটারের সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে দেখেছি তার নিবাত নিষ্কম্প শিখা একেবারে খাড়া হয়ে জ্বলছে অর্থাৎ কালবোশেখীও হার মেনেছে আমাদের পেটেন্ট ভেন্টিলেটারের কাছে···অত হাওয়ার চাপেও এক ফোঁটা বাতাস ঢুকছে না এই ভেন্টিলেটার দিয়ে!)। অথচ এর মধ্যে বাসা করে পাখী, আরসোলা, টিকটিকি ও নানান বিষাক্ত পোকামাকড়। খড়কুটো ফেলে ঘরদোর নোংরা করে এরা···ছড়ায় দুর্গন্ধ ও রোগের জীবাণু। আর সেই সঙ্গে বৃষ্টির নোংরা জল গড়িয়ে এসে ঢোকে ঘরে, নয়ত দেয়ালের ফাঁক-ফোকরে ঢুকে ড্যাম্পের বিশ্রী ছোপ ধরায় প্লাস্টারের গায়ে। উভয় ক্ষেত্রেই বারোটা বেজে যায় দেয়ালের।

বাড়ী কিনেই এই ঘুলঘুলিগুলি বন্ধ করে দিন ইট গেঁথে। তাতে বাড়ির এবং নিজের উপকার সাধনই হবে। বিশ্বাস করুন, ওগুলি কোন কম্মের নয়। পূর্ত বিজ্ঞানের এটা প্রমাণিত সত্য যে ৩ বর্গফুট এর কম আয়তনের স্কাইলাইট দিয়ে বায়ু-পরিচলনের কোন সাহায্যই হয় না।

জ. বাথরুম পাইখানার পুরো তদারকি করে নিতে হবে।

বাড়ী কেনার সময় পাইপ লাইন ও ড্রেনেজ লাইন (রেনওয়াটার পাইপ ও খোলা নর্দমা সমেত) পুরো পরীক্ষা করে নিতে হবে যে কোথাও জল লিক করছে কিনা বা কোথাও পাইপ বুঁজে জল জমে যাচ্ছে কিনা। কল দিয়ে যদি ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, ওয়াশার পাল্টে নিলেই তা বন্ধ হবে। চৌবাচ্চা,

সিঙ্ক, বেসিন, কমোড, বা পাইখানার প্যানের জমা জল সরতে যদি অস্বাভাবিক বেশি সময় লাগে বা জল নেবে যাবার সময় যদি গুড়্গুড়্ করে শব্দ হয়, বুঝতে হবে পাইপে ময়লা জমে নর্দমা বুঁজে আসছে—বাঁশের কঞ্চি খুঁচিয়ে বা অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে ময়লা সাফ করে দেওয়া দরকার। পাইখানার ট্যাঙ্কের ফ্লাশচেন টেনে দেখে নেবেন তা কাজ করছে কিনা। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হওয়ায় খুব সম্ভবতঃ তার বল-ভাল্‌ভের ভিতর জল ঢুকে গেছে। সেরকম হলে পাল্টে দেওয়াই বিধেয়। অষ্টম অধ্যায় দেখুন। সেপটিক ট্যাঙ্ক গৃহপ্রবেশের আগে পরিষ্কার করিয়ে নিলে ১৫/২০ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। বাড়িতে বাস করতে করতে এই ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করানো একটি নরক যন্ত্রণাবিশেষ।

ঝ. গৃহপ্রবেশের আগে বাড়িটিকে শোধন করে নিতে চাই।

যা যা করতে হবে ঃ

(১) জলে পাঁচ শতাংশ ফিনাইল মিশিয়ে তা দিয়ে খুব ভাল করে ঘসে ঘসে ধুতে হবে মেঝে, তাক, লফ্‌ট, জানলার সিল, বেসিন, সিঙ্ক, কমোড, পাইখানা, জলের ট্যাঙ্ক, দরজা ও জানলার পাল্লা, গ্রীল, সিঁড়ির ধাপ ও রেলিং-এর হ্যাণ্ডেল।



১২ নং নকশা

(২) জলে পাঁচ শতাংশ ডেটল মিশিয়ে বন্ধ ঘরে সকাল বিকেল স্প্রে করতে হবে তিনদিন। ওই সময়ের মধ্যে ঘরের দরজা-জানলা খোলা চলবে না।

(৩) দু-কোট চুনকাম করতে হবে ভাল টাটকা ঝাঝালো চুন দিয়ে ও সেই সঙ্গে উঠোনে, বাগানে, নালা-নর্দমায় ছড়িয়ে দিতে হবে ব্লিচিং পাউডার।

ঞ. দুটি ছোট ঘর মিলিয়ে একটা বড় ঘর চাই।

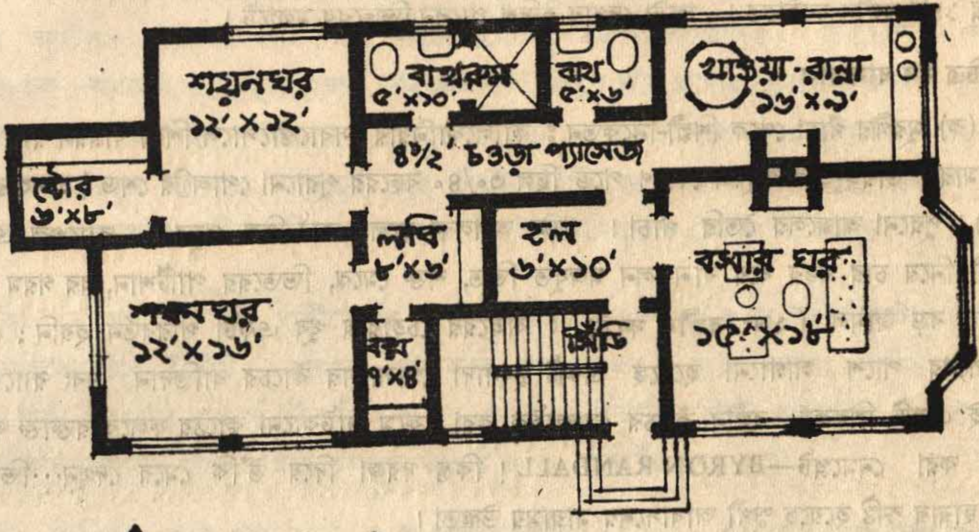
'ভেঙ্গে ফেল, কর রে লোপাট,
সিমেন্ট জমাট
ওই মদ্দি খানের প্রাচীর ভেদি।'
(প্রয়াত নজরুল, ক্ষমা করবেন)

লোপাট তো করতেই হবে কিন্তু সিমেন্ট-জমাট প্রাচীর ভেদের পদ্ধতিটা কি? ব্যাপারটা বুঝতে হলে নজর করুন **১২ নং নকশায়**। যে প্রাচীরটিকে লোপাট করতে হবে তার একদিকে ছাদের যতটা কাছ বরাবর সম্ভব দেয়ালটি টানা এ-মাথা ও-মাথা কেটে ফেলতে হবে দেয়ালটি যত মোটা তার অর্ধেক গভীর করে। এবার এই গর্তের মধ্যে ৬ বা ৮ ইঞ্চি লোহার জয়েস্ট (**I-section** বা **channel**) কংক্রীট (১ : ১½ : ৩) দিয়ে ভাল করে জ্যাম করে দিতে হবে। এরপর একই ভাবে উল্টো দিক থেকে গর্ত করে আর একটি জয়েস্ট বা বীম জ্যাম করে দিতে হবে আগের জয়েস্টটির পাশেই। এবার জয়েস্ট দুটির তলার দেয়াল শাবল হাম্বরে ভেদ করে লোপাট করুন বাড়ীভাঙ্গা রাবিশ হিসাবে। দেখবেন দেয়াল সরে গিয়ে দুই ঘর মিশে এক হয়ে গেছে। ছাদের ভার দিব্যি বইছে উপরের লোহার বীম জোড়া। অবশ্য বীমের দুই প্রান্তে কিছুটা করে দেয়াল রেখে দিতে হবে বীমের ভার বইবার জন্য। তাক মাফিক প্ল্যান করে নিলে এই ভাবে যে কোন সাবেকী বাড়ীকে আপনার আধুনিক রুচি ও চাহিদা মাফিক পুনর্গঠন করে নেওয়া যায়।

● **চিচিং ফাঁক**

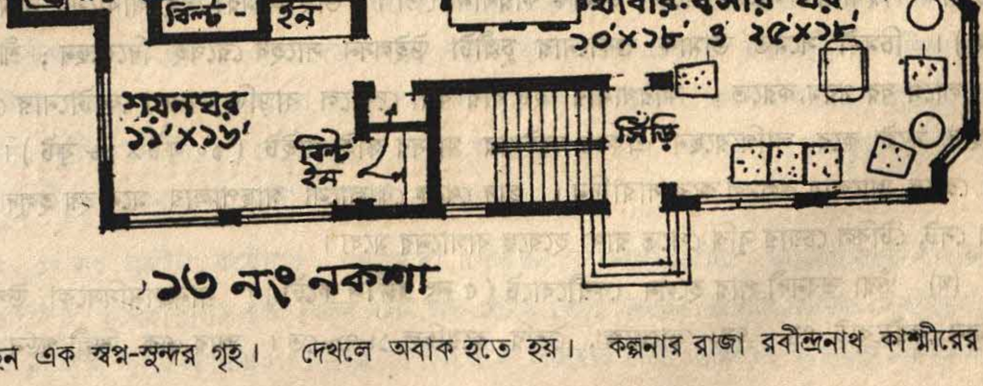
১৩ নং নকশায় দেখুন, এইভাবে একটি সাবেকি প্ল্যানের বাড়িকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। সাবেকি ড্রইং রুম, রান্নাঘর, লবী ও প্যাসেজের একাংশ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আধুনিক লিভিং রুম—বসার ও খাবার জায়গার বিশাল সমাহার; যার বিশাল মাপ অভ্যাগতের মনে বাড়ীর বিশালতা সম্বন্ধে এক দৃষ্টিবিভ্রমের সৃষ্টি করে। সাবেকি বাথরুম পাইখানাগুলিকে ভেঙ্গে চুরে সৃষ্টি করা হয়েছে আধুনিক রান্নাঘর ও বড়সড় টয়লেট। ছোট হয়েছে শয়নকক্ষদুটি। স্টোরটি সৃষ্টি করেছে বহু-প্রয়োজনীয় লাগোয়া বাথ রুমের। অকেজো বক্সরুমের জায়গায় জন্ম নিয়েছে দুটি বিল্ট-ইন আলমারী। ১৯৪০ সালে নির্মিত বাড়ীটিতে রূপ নিয়েছে ১৯৮০ সালের নকশা। এতক্ষণ আমরা দশটি ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলাম সেই সব প্রধান প্রধান সমস্যার উত্তর যা পুরাতন সম্পত্তির হস্তান্তরের সময় প্রায়শই দেখা দেয়। এ ছাড়াও আরো বহুতর ছোটখাট পুনর্গঠনের প্রয়োজন হয়—যার দাওয়াই, আপনার অভিজ্ঞ বাস্তুবিদ আপনার কেনা সম্পত্তির বয়স ও আয়তন এবং আপনার ক্ষমতা ও চাহিদা বিচার করে ঠিকই বাৎলে দেবেন। অভিজ্ঞ পূর্তবিদের কাছে এটা মোটেই শক্ত নয়। আসলে কিছুটা পূর্তবিদ্যার জ্ঞান ও বেশ কিছুটা কল্পনা শক্তি থাকলেই যে কোন বস্তু থেকে মনের মত আবাসন আপনি গড়ে তুলতে পারেন,

অনায়াসে, অতি অল্প খরচে (আমাদের বন্ধু প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীরণেন আয়ান দত্ত বালীগঞ্জে প্রায় জলের দরে একটা পোড়ো গুদাম কিনে তাকে তাঁর শিল্পীসুলভ কল্পনার রসে জারিয়ে ভেঙ্গে-চুরে গড়ে



△ মা যা ছিলেন

মা যা হইয়াছেন ▽



১৩ নং নকশা

তুলেছেন এক স্বপ্ন-সুন্দর গৃহ। দেখলে অবাক হতে হয়। কল্পনার রাজা রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীরের ডাল

লেকের হাউস বোটের সঙ্গে নিজের কল্পনা শক্তিকে মিশিয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব নৌকাবাস)। এই কল্পনা শক্তি যে গৃহপিয়াসী মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার অতি বিস্ময়কর বিবরণ পাবেন মলাটের ১৪টি রঙ্গীন ফটোতে। ফটো দেখার হদিশ পাবেন ভিতরের মলাটে।

● **বিচিত্র সব বাসস্থান**

(ক) মুরগীর খাঁচা থেকে শিল্পী-নিকেতন : কালিফোর্নিয়ার সেবাস্তোপোলে শিল্পী বায়রন র‍্যাণ্ডেলের কৃষি খামার। তারই এক জঙ্গুলে কোণে পড়ে ছিল ৩০/৪০ বছরের পুরানো পোলট্রির শেড (**১ নং রঙ্গীন ফটো**)। পুরনো আমলের তৈরি খাঁচা। গড়ন অপলকা হলেও কাঠ ছিল প্রচুর। র‍্যাণ্ডেল একজন সহকারী নিয়ে চার বছর ধরে বানালেন মজবুত ভিত, শক্ত মেঝে, ভিতরের পার্টিশান, ঘর গরম করার চুল্লী, বড় বড় জানলা (**২নং রঙ্গীন ফটো**)। বাইরের চেহারায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি ; কেবল প্রবেশপথের পাশে লাগানো হয়েছে একটি দুধসাদা গোলাকার কাঁচের বাতিদান এবং র‍্যাণ্ডেলের নিজেরই একটি শিল্পকর্ম—রঙ্গীন কাঁচের মোজাইক করা ফ্রেমে আটকানো কাঠের ফলকে রক্তাক্ত অক্ষরে খোদাই করা নেমপ্লেট—BYRON RANDALL ! কিন্তু দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখুন···ভিতরের আলো ছায়ায় সৃষ্টি হয়েছে সুখী আবাসনের মায়াময় উষ্ণতা।

(খ) ট্রাম গাড়ী হল আরাম-বাড়ী (**৩ নং রঙ্গীন ফটো**) : ৮৬ ফুট লম্বা ৯½ ফুট চওড়া বগীটি তিরিশ দশকে চিকাগো থেকে পশ্চিম উপকূল অবধি যাতায়াত করত গ্রেট নর্দার্ন রেলরোড কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে। ১৯৫৫ সালে লুসিয়াস বিবে ও চার্লস ক্লেগ কিনে নিলেন ৯০ টন ওজনের বগীটি ; নিয়ে এলেন নেভাডায় নিজেদের সাইডিং-এ। বাইরেটা রইল অটুট; মায় বগীর ১০০ নম্বর অবধি। ভিতরে তৈরী হল ১২।১৪ জনের উপযোগী বসবার ঘর, অপূর্বভাবে সাজানো ডাইনিং, দুটি শয়ন কক্ষ, বাথরুম, রান্নাঘর এবং বিশ্বাস করুন চাই না করুন, ড্রইংরুমের লাগোয়া ফায়ার প্লেস ! বিবে ও ক্লেগ সাহেব তাঁদের গাড়ী-বাড়ীর নাম দিয়েছেন 'দি ভার্জিনিয়া সিটি'।

(গ) নিউ ইয়র্কে ধূমধাম (**৪ নং রঙ্গীন ফটো**) : নিউইয়র্কে ফ্ল্যাট জোগাড় করা কোলকাতায় বাসা ভাড়া করার থেকেও অনেক, অনেক শক্ত ! এই সমস্যার সমাধান করলেন স্থপতি টিম উইলসন এক তামাক কারখানায় আড্ডা গেড়ে (তামাক কারখানা তো। তাই আমরা এই আবাসের নাম দিলাম ধূমধাম)। চিমনী সমেত তামাক শুকানোর চুল্লীটা উইলসন সাহেব রেখেই দিয়েছেন ; শীতকালে কাজে লাগে ঘর গরম করতে। কারখানার ইট বার করা দেয়ালে বাড়তি জানলা ফোটানোর চেষ্টা না করে ছাদ ফুটো করে লাগিয়েছেন প্রকাণ্ড ফাইবার গ্লাসের স্কাই লাইট (১০ ফুট × ১৮ ফুট)। সারা বাড়ী রোদে আলোয় ঝলমল করে সারাদিন। ছাদ থেকে ঝোলানো গাছপালায় মনে হয় হলুদ রং-এর সোফা সেট, টেবিল চেয়ার বুঝি পেতে রাখা হয়েছে বাগানের মধ্যে।

(ঘ) ওঁরা ভবনদী পার হলেন ফেরীবোটে (**৫ নং রঙ্গীন ফটো**)! সানফ্রানসিসকো উপসাগরে ভাসমান ফেরীবোট এস. এস. ভাল্লেজো, তৈরি হয়েছিল ১৮৭৯-তে। আর এক শিল্পী গর্ডন অনস্লো

ফোর্ড কিনে নিলেন সেই বিশাল তরী। দু ভাগে ভাগ করে এক ভাগে বানালেন তাঁর স্টুডিয়ো। অন্য ভাগটা ভাড়া দিলেন সহশিল্পী জীন ভার্দাকে। অনস্লোর মৃত্যুর পর তাঁর অংশে বাসা বাঁধলেন দার্শনিক অ্যালেন ওয়াটস্। জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে গেলেন এই নৌকাবাসেই। তাঁর মৃত্যুতে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল—অ্যালেন ওয়াট তুলনামূলক দর্শন সমিতি। ওদিকে জীন ভার্দার মৃত্যুতে তাঁর অংশ অধিকার করলেন নাট্যকার ম্যারিয়ন সল্টম্যান। বাইরের ছাই ছাই রং-এর দেয়াল আর নীল সাদা ছক-কাটা পাল্লাওয়ালা সারিবদ্ধ জানলার আড়ালে এই শিল্পী-সাহিত্যিকের জমানো শিল্পসম্ভার, আসবাব, পর্দা, কার্পেটকুশনে, বাসনপত্রে ফেরীবোটটি আজ প্রায় ছোটখাট মিউজিয়ামের চেহারা নিয়েছে।

(ঙ) বোডেগার ডেয়ারী বাড়ীতে ঘর বাঁধলেন মুরহাউস দম্পতি (**৬ নং রঙ্গীন ফটো**)। জলের দরে কিনেছিলেন তাঁরা বাড়ীটি। তারপর গোয়ালঘর হল কাজের ও বসার জায়গা, অফিস রুম দুটো বদলালো শয়ন কক্ষে, দুধ রাখবার ডীপ ফ্রিজ দুটোর একটা হল রান্নাঘর, অন্যটা খাবার ঘর। এই ভাবে নামমাত্র খরচে মুরহাউস পরিবার গড়ে তুললেন তাঁদের ৩০০০ বর্গফুটের বসত বাড়ী।

(চ) ঠাণ্ডিঘর থেকে গরম বাড়ী (**৭ নং রঙ্গীন ফটো**)! ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কানেক্টিকাটের নিউ ক্যাননে তৈরি হয়েছিল এক কাঠের কোল্ড স্টোরেজ। ফাঁপা দেয়ালের ভিতর কাঠের গুঁড়ো ভরে তার দেয়ালকে করা হয়েছিল তাপ পরিবহন শক্তি-রহিত। ভিতরে বরফের গাদায় ডুবিয়ে রাখা হত ঘোড়া ও গরুর মাংস, ট্রাউট আর হেরিং মাছ। দোতলা বাড়ীটার ভিতরের মাপ ছিল ১৩ ফুট × ১৫ ফুট। ৬০ বছর বাদে বাড়ীটার ভিতর মরা জানোয়ারের বদলে আশ্রয় নিল জ্যান্ত মানুষ। এত দিন দেয়াল-গুলোর কাজ ছিল ভিতরের ঠাণ্ডাকে বাইরে আসতে না দেওয়া—এবার কাজ হল ভিতরের গরমকে বাইরে যেতে না দেওয়া। এক তলায় রইল রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় শোওয়া, বসা, স্নানাদি। দোতলার লাল পোস্টে ভর দেওয়া বেরিয়ে আসা চৌকো অংশটি বর্তমান মালিক যোগ করেছেন যার নিচে থাকে তাঁর গাড়ী।

(ছ) ১৮০০ সালে তৈরি হয়েছিল লণ্ডনের ক্যালার্ড অ্যাণ্ড বাওসারের মাখন তৈরির কারখানা প্যাডিংটন স্টেশনের কাছেই। প্রায় দেড়শ বছর বাদে ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ইনডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনার মাইকেল উলফ যখন সেখানে আড্ডা গাড়লেন (**৮ ও ৯ রঙ্গীন ফটো**) তখনও কাঠের প্রতিটি বীম, বরগা, কড়ি, সিঁড়ি, রেলিং ও মেঝে থেকে বেরুত মাখনের সুগন্ধ! এই বিশাল বাসস্থানে উলফ যে কত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন ৯ নং ফটো দেখলেই তা বোঝা যায়।

(জ) **১০ নং রঙ্গীন ফটোতে** আপনারা দেখছেন কানেক্টিকাটের ট্যাকোনিকস্থ-পরিত্যক্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯৬৮ সালে এটি কিনে নেন জন পোগ, তৈরি করেন একটি কাঠের মেজ্যানিন যা পরিণত হয় পোগের শয়ন কামরায়। নিচের বিশাল হলে আসবাব দিয়ে পার্টিশান করে তৈরি হয় বসার,

খাবার ও রান্নার জায়গা ও বাথরুম। বাইরের সাবেকী চেহারাটি বজায় রাখা হয়েছে সযত্নে। আজ পোগ ভবনটি ট্যাকোনিকের সেরা আবাসন।

(ঝ) আবার আমাদের জলযাত্রা! এ বার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে···টুইলারী প্রাসাদের কাছেই। তিনটি লাল, কালো ও সাদা ডিঙ্গি (**১১নং ফটো**) নৌকা নিয়ে ফিলিপ রউফ গড়ে তুলেছেন তাঁর জলীয় (!) প্রাসাদ 'লা আর্চে ডি নাউ'। কোথাও ক্যাপ্টেনের কেবিনে হয়েছে মালিকের শয়ন ঘর, কোথাও প্যাসেঞ্জার ডেকে ডাইনিং, কোথাও পুরো খোল জুড়ে ড্রইং রুম ও স্টাডি।

(ঞ) 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে'—না, আগুন জ্বালানো হল না ; বলতে পারেন আগুন নেবানো বন্ধ হল। সানফ্রানসিসকো মিউনিসিপ্যালিটি '৫৯ সালে কোর্টের মারফত নিলাম করে দিলেন তাঁদের শত বর্ষ পুরাতন ফায়ার বিগ্রেডের ছোট্ট স্টেশনটি (**১৩নং ফটো**)। তাঁদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত ফায়ার ইঞ্জিনের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত সেটি। নিলামে একমাত্র ক্রেতা হিসাবে সেটি কিনে নিলেন খ্যাতিবান ট্যাপেস্ট্রী ও রঙ্গীন কাঁচের মুরাল শিল্পী মার্ক অ্যাডাম্স ও তাঁর ছাপাই-বিশেষজ্ঞা স্ত্রী বেথ ভ্যান হোয়েসেন। অগ্নিনির্বাপক গাড়ী ও ঘোড়ার আস্তাবল পরিণত হল নকশা বানানো ও ছাপাইয়ের স্টুডিয়োতে (**১২নং রঙ্গীন ফটো**)। ওপরে ফায়ারম্যানদের ডরমিটারীকে ভাগ করে বানানো হয়েছে ড্রইং রুম, কিচেন, ডাইনিং ও বেডরুম।

(ট) **১৪নং ফটোর** যে ছোট্ট বাড়ীটির সামনে পাতা রয়েছে সাদা বেঞ্চিটা তা এক কালে ছিল পিছনের চার তলা প্রাসাদের আস্তাবল। গাড়ী আর ঘোড়া থাকত নিচে, সহিস আর খড় উপরে। আজ সেটি লণ্ডনের বিখ্যাত এগলন মিউজ হাউস—আয়ান হেওয়ার্ড ও গুরি হ্যালবার্গের পাঁচ কামরা আস্তানা। দশ বছর ধরে দুজনে একটু একটু করে নিজে হাতে খেটে গড়ে তুলেছেন এই মান মনোহর বাসস্থানটি।

পাঠক—এর কোনোটাই আমার গালগপ্পো নয়। প্রত্যেকটি ফটো সারা বিশ্ব ঘুরে তুলেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিবান চিত্রশিল্পী জেরেমিয়া ব্র্যাগস্টেড—ছাপা হয়েছে নিউ ইয়র্কের ভাইকিং প্রেস প্রকাশিত চার্লস ফ্রাকিয়ার বই 'কনভারটেড ইনটু হাউসেস'এ। কৌতূহলী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন ; প্রায় দু শত এনলার্জ করা রঙ্গীন ছবির বন্যায় চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিষয়টিকে—'যা খুশী থেকে তৈরি করে নেওয়া যায় থাকবার আস্তানা'। এখানের ১৪টি ফটো তো বিষয়টির মুখবন্ধ মাত্র।

তাছাড়া ব্র্যাগস্টেড ও ফ্রাকিয়া সাহেব দুজনেই অধমের মত কেলে মানিক নন···দুগ্ধধবল চর্ম বিশিষ্ট খাঁটি অ্যামেরিকান। অতএব পাঠক এবার নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে 'ভোজনং যত্র তত্র···শয়নং হট্ট মন্দিরে' খুবই সম্ভব যদি থাকে একটু কল্পনা শক্তি আর একটু সস্তায় অ্যাডভেঞ্চারের শখ! কোলকাতার ফ্ল্যাটে বীতরাগ হয়ে পরিত্যক্ত টু-বি বাসে সংসার পেতে ছিল প্রয়াত শিবরাম চক্রবর্তীর

নায়ক শৈল আর তার বোন বিনি। খ্যাতনামা সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত ডিঙ্গি নৌকা কনটিকিতে খুলে ছিলেন ভাসমান রেস্টুরেন্ট যা জনপ্রিয়তায় সারা কোলকাতার মধ্যে রেকর্ড করেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের নরেন্দ্রপুর ক্যাম্পাসে পোল্ট্রি ও ডেয়ারীর মাঝামাঝি একটি পুরানো ওভারহেড জলের ট্যাঙ্কে কয়েকটি জানলা দরজা বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে এক খাসা ঘর···যেখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেছেন শরৎ মহারাজের কৃপাধন্য আমাদের এক টাইপিস্ট বন্ধু। ভারতীয় রেলের ভি. আই. পি. সেলুনের বিলাস ও আরামের কথা কে না জানেন!

অতএব মরা হাতিকে অবহেলা করবেন না। ঝপ্ করে কিনে ফেলুন যে কোন একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সস্তা স্ট্রাকচার। তাকে ধীরে ধীরে ঘরে ঘরে ভাগ করে কি ভাবে "হোম হোম, স্যুইট হোম" (Home, home, sweet home) বানিয়ে নেওয়া যায়···সেই হোম-ইয়োপ্যাথি চিকিৎসার কেচ্ছা শুনুন পরের দুই অধ্যায়ে···

৫ হোম-ইয়োপ্যাথি [বা'রমহল]

কোলকাতার এক অতিশয় পষ্টবক্তা স্থপতি (নাম বলে কাজ নেই, চিনে ফেলবেন ; তাতে কোটেশানের গ্ল্যামার কমে যাবে।) বলেন ঃ

"প্ল্যানাররা গড়ে দিতে পারেন অ্যাট বেস্ট, একটা হাউস (House—বাসস্থান), **তাকে হোম** (Home—নীড়) **করার দায়িত্ব গৃহস্থের।"**

কথাটা খুবই সত্যি। নকশা করে, ইট গেঁথে, সিমেন্ট জমিয়ে, রং বুলিয়ে তুগ্‌গা বোস—রহমন মিস্ত্রির টিম যে বস্তুটি আপনাকে খাড়া করে দেবে, মশকাকীর্ণ, চুনের ও তেল রং-এর গন্ধে ভরপুর, ক্যাকাশে স্যাঁতস্যাতে দেয়াল ও খসখসে ঠাণ্ডা মেঝেযুক্ত নিরাভরণ কামরার সেই সমাহারটিকে 'হাউস'—এর বেশী কিছু বলা যাবে না। সেই বাড়ীতে লোক বাস করতে শুরু করলে, শুরু হয় তার 'হাউস' থেকে হোমে উত্তরণের পর্ব। দেয়ালে ঝোলে ছবি, ক্যালেণ্ডার ; জানলায় পর্দা ; রান্না ঘরের সিলিং-এ ছোপ পড়ে ধোঁয়ার ; ছাদের আলসেতে উকি দিতে শুরু করে টবের বেলফুল, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকারা ; গোবর নিকানো উঠোনের একপাশে বড় হয়ে ওঠে শিউলীর চারা। এরিয়েলের বাঁশ থেকে শিউলীর মগডাল অবধি টাঙ্গানো তারে ঝোলানো কর্তার লুঙ্গির দিকে তাকিয়ে নাক সিঁটকোয় গিন্নীর ব্লাউজ ; বারান্দার গ্রীলে ঝোলানো বাঁশের খাঁচায় টিয়া পাখীটা চেষ্টা করে পাশের ডেক চেয়ারে আয়েস করে রোদ পোয়ানো মিনির ল্যাজ কামড়ে ধরতে। ইমিটেশান দুল পরা খালি গলা, সাদা সিঁথি তন্বী কুমারী হাউসের চেহারাটা ক্রমে ভারিক্কী হয়ে ওঠে। আধ হাত চওড়া লাল পাড় শাড়ী পাঁচ নরী হার কনক চূড় আড়াই ভরি মকর বালা সজ্জিতা বিশাল জমিদার গিন্নী একসাথে জোড়া খিলি পান গালে পুরে, নথ নেড়ে ঘোষণা করেন 'আমি হলুম গ্যে বড় তরফের ওয়াইফ্‌ফ্‌ মিসেস হোম।'

হাউস থেকে হোমায়নের এই পর্বটি সর্বজনীন। সব বাড়ীতেই হয় অল্প বিস্তর। তবে কোন কোন বাড়ীতে সেটি হয় অতি সুচারু ভাবে, পরিকল্পিত চিত্রমালার মত। ঘরে ঢুকলেই সেখানকার শান্ত শ্রী ও পরিপাটি পরিবেশে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। কোন কোন বাড়ীতে সেটি হয় বড় বিশৃঙ্খল ভাবে, নাম-কা-ওয়াস্তে (অনেকটা ঠিক সি. এস. টি. সি. এর স্পেশাল বাসের মত যার স্পেশালত্ব কেবল তার ভাড়ায়, বডির কমলা রং-এ এবং প্রবেশপথের ছিটকানি বিহীন নড়বড়ে পাল্লায়। ওই ঢাউস জাহাজে কনডাক্টর মাত্র একজন থাকায় ওই নড়বড়ে আভিজাত্যটিকে আঁকড়ে বন্ধ করে রাখার দায়িত্ব পড়ে যাত্রীকুলের উপর !)

এই পার্থক্যের মূল কারণ গেরস্তর আনাড়িপনা। রান্না, বোনা বা কনে সাজানোর মত এই 'হোমায়ন'-ও একটি ফলিত কলাবিশেষ (সব বাগানের কলা কি সমান হয় ? কারু চাঁপা কলা, কারু

মর্তমান, সিঙ্গাপুরী আর কারু বা বীচে কলা, নয়ত নেহাৎই প্রদর্শনোপযোগী কাঁচ্‌কলা)। আপনার কলা-কৌশলটি যাতে সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল হয় তাই দুটি অধ্যায় জুড়ে শুরু হচ্ছে এক হোম-যজ্ঞ···হাউসকে হোম করার হোম-ইয়োপ্যাথিক গবেষণা। একটির পর একটি ঘরকে বেছে নিয়ে তার প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবহার, আয়তন, অবস্থিতি, সাজসজ্জাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে আধুনিক স্থাপত্য বিজ্ঞানের তথ্যালোকে ও ভাবধারায়। সেই সঙ্গে দৃষ্টি রাখা হয়েছে যাতে এই আলোচনা মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর কাজে লাগে (আর উচ্চবিত্ত বাঙ্গালী ? ভয় নেই, সোনার পাথর বাটি হয় না)। আলোচনাটি বাঙ্গালী সমাজভিত্তিক করতে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—বা'র মহল (বাড়ীর যে যে ঘরে বাইরের লোক, অতিথি অভ্যাগতের প্রবেশ অধিকার থাকবে সাধারণতঃ) আর অন্দর মহল (হাম আউর তুম যো কাম্‌রে মে বন্দ্‌ হো···)। সাহেবরা দুটোকে গুলিয়ে গুবলেট্ করে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের তো এখনও রুচি, আচারবিচার, পর্দানশীনতা—এক কথায় সভ্যতা খোয়া যায় নি। তাই এই ভাগাভাগি।

আসুন বা'র-মহলে ঢুকে পড়া যাক। প্রবেশপথে সদর দরজা পেরুলেই পাওয়া যাবে···।

● প্রবেশ কক্ষ (এনট্রেন্স লবী)

যে কোন সাবেকী খানদানী বাড়ীতে গেলেই দেখতে পাবেন সিংহদরজার পিছনে ছোটখাট ঘরটি। দু পাশে সান বাঁধানো বেঞ্চি (জমিদার বাড়ী হলে তা হবে মার্বেলে মোড়া। দুই পাশের দেয়ালে সিংহদরজার দুটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। সাধারণতঃ ডান দিকে কর্তা মশাইয়ের বৈঠকখানা ; বাঁ দিকে সেরেস্তা বা জমিদারী অফিস)। পিছনের দেয়ালে আর একটি সিংহদরজা (নবীনতর কাঁচা বয়সী পাঠকদের জানাই···সিংহদরজার সঙ্গে হালুম হুলুমের কোন সম্পর্ক নেই। সিংহদরজা মানে স্রেফ বড় মাপের দরজা। দরজার মাপটা বড় করা হত গৃহস্থের অভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবে। কাতরাসগড় রাজবাটিতে দেখেছিলাম ৮ ফুট চওড়া ৩২ ফুট উঁচু দরজা। গীনেস রেকর্ড বলছে পৃথিবীর বৃহত্তম সিংহদরজাগুলি আছে অ্যামেরিকার কেপ কেনেভেরালস্থ রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের অ্যাসেমব্লী বিল্ডিং-এ। চারটি দরজার প্রত্যেকটি ৪৬০ ফুট উচু। সবচেয়ে পুরু দরজা আছে ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স লিভমোর ল্যাবরেটরীতে। ৮ ফুট পুরু সাড়ে ৪৮ টন ওজনের এই দরজাটি সবরকম তেজস্ক্রিয়তা রোধে সমর্থ)। পিছনের সিংহদরজা দিয়ে ঢোকা যেত বা'রমহল বা চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে।

আজকালকার আধুনিক বাড়ী বা ফ্ল্যাটে মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণেই এই লবীটি প্রায়শই অনুপস্থিত। কোথাও বা তা এক চিলতে বারান্দার রূপ নিয়েছে। বারান্দাই হোক বা দেয়াল ঘেরা ঘরই হোক, একটা ১০ ফুট × ৬ ফুট (অভাবে ন্যূনতম ৮ ফুট × ৬ ফুট) স্পেশ লবী হিসাবে থাকার প্রচুর প্রয়েজনীয়তা আছে। বিশেষতঃ গৃহকর্তা যদি পেশাদার (উকিল, ডাক্তার, অভিনেতা, বাস্তুকার, শিক্ষক বা রাজনৈতিক নেতা) হন যাঁর কাছে প্রচুর অনাত্মীয় ও অচেনা দর্শনার্থী আসেন। এই সব মানুষকে ঠিক বৈঠকখানায় বসানো যায় না, আবার রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখাও বিসদৃশ। পেশাদার না হলেও আপনার কাছে কিছু কিছু লোক আসেন (যেমন ধোপা, পোস্টম্যান, বন্ধুর ড্রাইভার, বেয়াই বাড়ীর

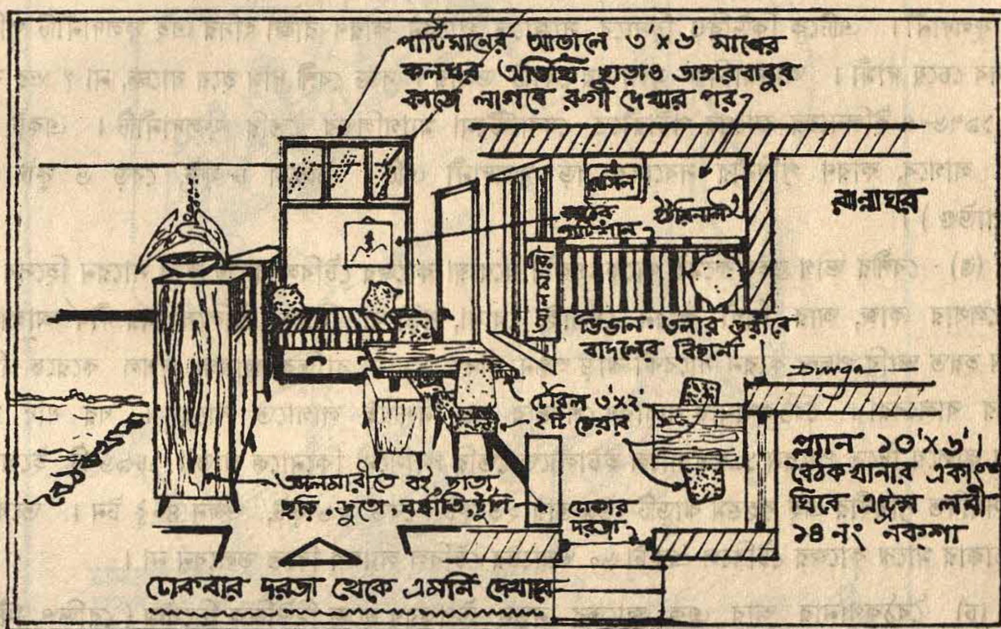
বাজার সরকার, অফিসের পিয়ন যাদের বসতে বলাটা শিষ্টাচার আবার ড্রইংরুমে বসানোটা রীতিবিরুদ্ধ। প্রবেশকক্ষে যদি একটি ডিভান বা ছুটি চেয়ার রাখা থাকে (সেই সাথে টেবিলে খানকতক পুরানো ম্যাগাজিন) তাহলে এই সব লোকের পক্ষে আপনার জন্য অপেক্ষা করা বা আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলাটা সহজ ও আরামপ্রদ হবে। ওঁরা আপনার বাড়ীর ব্যবস্থার প্রশংসা করবেন।

এ ছাড়া পেশাদারদের প্রয়োজন হয় একটি ঘরোয়া অফিস চেম্বারের। ডাক্তারের লাগে রোগী পরীক্ষার ঘর, উকিল, ব্যারিস্টার আর্কিটেক্টের কনসাল্টেশান রুম, শিক্ষকের ছাত্র পড়াবার জায়গা, এমন কি ছাত্রদের প্রয়োজন হয় প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়বার জন্য ছোটখাট স্টাডি রুম। লবীটিতে ২/৩ টি চেয়ার, ১টি ৩´× ২´ ছোট টেবিল ও দেয়ালে আটকানো একটি টানা বুককেসের উপস্থিতি এর সব প্রয়োজনগুলিই মেটাতে পারবে। ডাক্তারবাবু রুগী পরীক্ষা করার জন্য ডিভানটি ব্যবহার করতে পারেন (তবে এগজামিনেশান বেড ও ডিভানের উচ্চতায় বেশ খানিকটা গরমিল থাকায় ডাক্তার বাবুকে হেঁট হয়ে পরীক্ষা করতে হবে। মন্দ কি ? রুগী দেখা, পয়সা কামানো, ভুঁড়ি কমানো—সব এক সাথেই হবে।) ঘরোয়া অফিস ছাড়া আরো নানা কাজে লাগতে পারে প্রবেশ কক্ষটি। আমার এক বন্ধু সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিল এই ঘরে। ছোট বেলায় 'কর, খল' থেকে 'নরঃ নরৌ নরা' পর্যন্ত এই ঘরেই চলত তার পড়াশুনো অহোরাত্র। তার পর যৌবনের যাত্রা-থিয়েটারের নেশায় শুরু হল রিহার্সাল, এই ঘরেই এবং প্রায় অহোরাত্রই। প্রৌঢ় বয়সে খুলেছিল তার জমির দালালীর অফিস—এই লবীতেই। ফের অহোরাত্র চলত খদ্দের ভজানোর কাজ। এই ঘর থেকেই একদিন খাটিয়ায় চাপিয়ে তাকে রেখে এলাম কেওড়া তলায়। এর পর ঘরটি দখল করেছিল বন্ধুর মেয়ে নূপুর। মাস্টার মশাইয়ের সাথে গলা মিলিয়ে সেধেছিল সরগম যতদিন না মাস্টার মশাই ওকে সিঁদুর পরিয়ে তাঁদের নেবুতলার বাড়ীতে নিয়ে যান নি। আর সেই কটা দিন, জোর গলায় বলতে পারি মশাই এ ঘরের জেল্লা কিলাউইর জেড পাথরের কুটিরের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। আপাততঃ ঘরটি প্রতি রাত্রে চলে যাচ্ছে বাদলের অধিকারে। বাদল ও-বাড়ীর একমেব অদ্বিতীয়ম্ চাকর। প্রবেশ কক্ষের এও একটা ভিন্নতর ব্যবহার। এ ঘরের আর একটি সম্ভাব্য ভিন্নতম ব্যবহার নিয়ে আমরা আলোচনা করব বৈঠকখানার উপ-অধ্যায়ে

অনেকে বাড়ীর ভিতর জুতো পরে ঢোকেন না বা ঘরে ব্যবহারের জন্য আলাদা চটি রাখেন (জাপানীদের মধ্যে এই প্রথা খুবই জনপ্রিয়), তাঁরা এই লবীতে একটা আলমারীতে পরিবারের সমস্ত জুতো রেখে দিতে পারেন। সাবেকি বাড়ীতে অনেক সময় এই লবীর ভিতর দিকে ও বাইরের দিকে দরজার ছুপাশে জোড়া জোড়া জানলা বা কুলুঙ্গী থাকে। এই বাড়তি জানলা বা কুলুঙ্গীকে অনায়াসে জুতোর আলমারী করে নেওয়া যায় ঘরের স্পেশ নষ্ট না করে। এ আলমারীতে শুধু জুতো কেন, আরো বেশ কিছু জিনিস রাখা যায় যার সঙ্গে ভিতর বাড়ীর কোন সম্পর্কই নেই, যেমন—ছাতা, টুপি, ছড়ি, বর্ষাতি, স্কুটার-ওয়ালাদের হেলমেট, দস্তানা, প্যারামবুলেটার ইত্যাদি। এই ঘর থেকে রান্নাঘরে যাওয়ার যদি একটি সারভিস দরজা থাকে তা হলে আপনার বাড়ীর বাদল কি মচ্ছিমূলো বাজার করে নিয়ে এল, ড্রইং

রুমে বসে থাকা অতিথি তার বিন্দু বিসর্গ টের পাবে না। বৈঠকখানায় পাওনাদারকে বসিয়ে রেখে স্বয়ং পগার পার হওয়ার পদ্ধতিতেও এ দরজার অবদান অপরিসীম।

লবীটা কত দরকারী দেখছেন তো ? অথচ আপনার ফ্ল্যাটে ব্যাপারটানেই-ই । সদর দরজা খুলেই সোজা ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় ড্রইং-ডাইনিং হলে। আলমারী, রুম ডিভাইডার, মুভেবল পার্টিশান বা পর্দার সাহায্যে সদর দরজার পেছনের অংশটা ঘিরে নিয়ে আপনি কি ভাবে দুধের স্বাদ, থুড়ি দুধের উপকারিতা ঘোলে পেতে পারেন তা-ই দেখানো হল (**১৪ নং নকশায়**)। আপনার নকশা দেখা শেষ হলেই আমরা ঢুকে পড়ব যে ঘরে তার নাম···



● **বৈঠকখানা**

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের সাবেকি বৈঠকখানা রূপ নিয়েছে আধুনিক ড্রইং রুম বা লিভিং রুমের। বনেদী বৈঠকখানায় স-পারিষদ কর্তামশাই ঝাড়লণ্ঠনের আলোয়, গড়গড়া টানতে টানতে দাবার চাল দিতেন ফরাসের তাকিয়াতে আড় হয়ে। বাড়ীর মেয়েদের এ ঘরে বলতে গেলে একরকম প্রবেশ নিষিদ্ধই ছিল। আজকের ড্রইংরুমে নারী-পুরুষের সমানাধিকার। সে সাথে বেড়েছে ঘরের ব্যবহার-বৈচিত্র্য ঃ

(ক) বন্ধু নিয়ে আড্ডার ট্র্যাডিশান পুরো মাত্রায় বজায় আছে। তবে সভার সর্বজনীনতা বেড়েছে বান্ধবীদের যোগদানে।

(খ) খেলাঘরে দাবার পাশে ঠাঁই নিয়েছিল তাসের ব্রীজ। নবতম সংযুক্তি টিভির মাধ্যমে ভিডিও গেমস।

(গ) গড়গড়া বিদায় নিলেও স্মোকিং কর্নার সরগরম করে রেখেছে পাইপ, চুরুট, সিগারেট। মদ্যপান আগেও ছিল, তবে স্টাইলটা এখন বদলেছে। তরুণী সরাব-সহেলী অদৃশ্য। ঘরের এককোণে ছোট্ট বারে রাখা বোতলের পানীয় সহস্তে বিতরণ করছেন গৃহকর্তা।

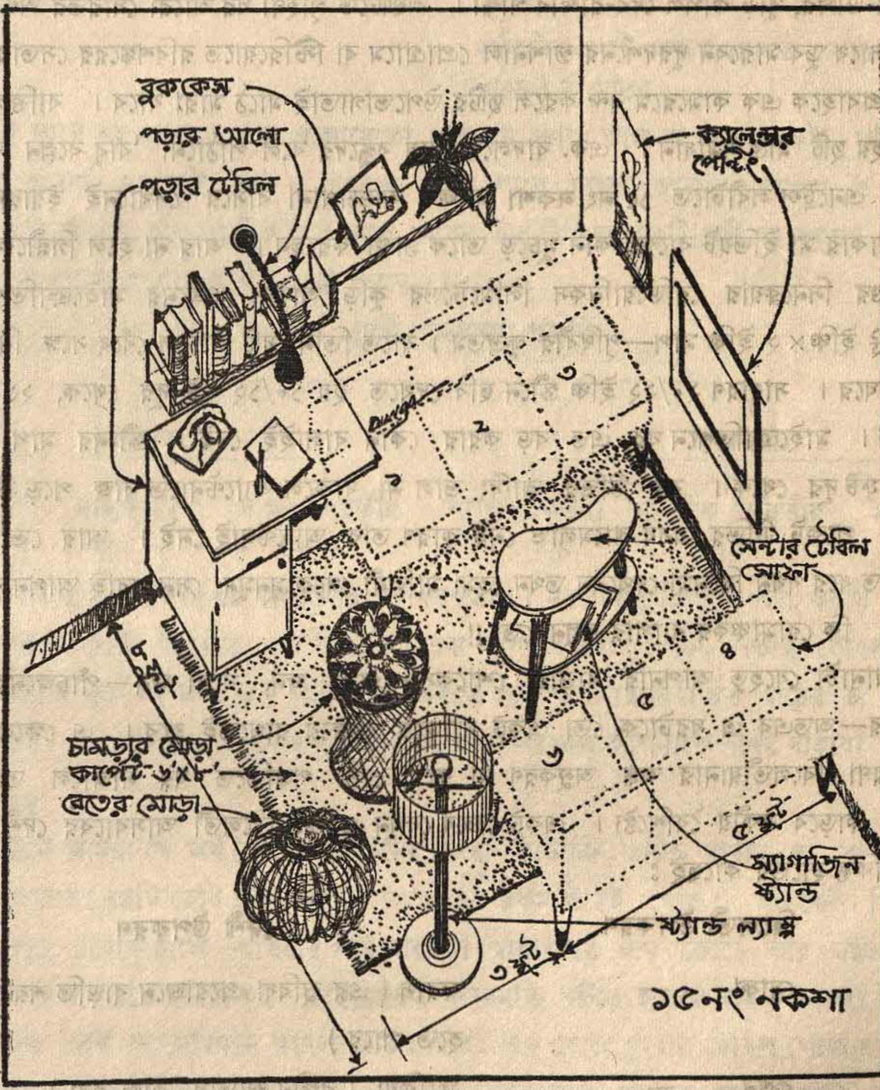
(ঘ) বৈঠকখানার এক নতুন ভূমিকা—যাদুঘর বা মিউজিয়ামের। গৃহস্থের শিল্প সংগ্রহ—পুতুল, ভাস্কর্য, পেন্টিং, ফুলদানী, এমন কি কিছু দুষ্প্রাপ্য বইও অভ্যাগতদের দেখানোর জন্য সাজিয়ে রাখা হয় ড্রইং-রুমের কিউরিও কেস বা দেয়ালে (আরিজনার ফোনিক্স ব্যাঙ্কে রয়েছে ৩৯ ইঞ্চি উঁচু চারকোণা একটা চীনে মাটির ফুলদানী। এটিকে কিউরিও হিসাবে সাজাতে পারেন কারণ রাজা ৎসির এই ফুলদানীটি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দামী। আনুমানিক মূল্য ছয় কোটি ডলার। বড্ড বেশী দাম হয়ে যাচ্ছে, না ? ওর বদলে রাখুন ১৯৭৬-এ ইলিনয়ের হ্যাগের পটারীতে সেবাস্টিনো ম্যাগলিওর তৈরি ফুলদানীটি। একটু বেশী জায়গা লাগবে, কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুলদানী এটি। উচ্চতা ৮ ফুট, বেড় ৬ ফুট, ওজন ৬৫০ পাউণ্ড)।

(ঙ) বেশীর ভাগ ড্রইং রুমেই থাকে একটা ঘরোয়া কাজের টেবিল যাতে কর্তা সারেন হিসেব আর চিঠি লেখার কাজ, আর গিন্নী করেন সেলাই, বোনা, পড়া বা নিছক টেলিফোনের দীর্ঘ আলাপন। আপনি হয়ত ভারি পছন্দ করেন সাবেকী ঝাড় লণ্ঠন যদিও মোম বাতির জায়গা দখল করেছে জিরো ওয়াটের বালবেরা। বৈঠকখানার সাধারণ শোভার জন্য নিশ্চয়ই লাগাতে পারেন। ঘর যদি যথেষ্ট বড় হয় ঝুলিয়ে দিতে পারেন ১৯৫৩ সালে ইটালীতে তৈরি কাসিনো কিনোক্কে ঝাড়। ১৮৯৬ টি ইলেকট্রিক বাতি সমন্বিত পৃথিবীর এই বৃহত্তম ঝাড়টি উচ্চতায় ২৩ ফুট, বেড় ২৬ ফুট, ওজন ৪০½ টন। তবে এই ধূমধাড়াক্কার মাঝে কাজের টেবিলে একটা ৬০ ওয়াটের টেবিল ল্যাম্প দিতে ভুলবেন না।

(চ) বৈঠকখানার আর এক জাতের নতুন উপকরণ হচ্ছে মিউজিক সিস্টেম (রেডিও, স্টিরিও প্লেয়ার, টেপডেক, ক্যাসেট-কর্ডার ও একাধিক স্পীকার মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এই সঙ্গীত জগৎটির) এবং ভিডিও সিস্টেম (টি ভি, ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, ভিডিও ক্যামেরা, ভিডিও গেমস মেসিন ও রেমট কণ্ট্রোল সুইচ নিয়ে সৃষ্টি হয় ছবির ইন্দ্রপুরীটি)। স্বভাবতই যে ঘরের এতগুলি বিচিত্র ব্যবহার সে ঘরের আয়তন সাবেকী বৈঠকখানার তিনগুণ হতেই হবে। সেই হিসাবে আজকের একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ড্রইংরুমের ন্যূনতম্ মাপ ১৪ ফুট × ২২ ফুট। তবে খুব কম ড্রইং রুমেই ছয় দফা ব্যবহারের সবকটিই ঘটে থাকে। সালতামামি নিলে দেখা যায়, আড্ডা এবং টিভি দেখা (অথবা রেডিয়ো শোনা) প্রায় সব বাঙ্গালী বাড়ির বৈঠকখানাতেই কমপালসারী। তাই এই দুটি চাহিদা নিয়ে আমরা আর একটু বিশদে আলোচনা করব।

আড্ডার জন্য আপনাকে ধরে নিতে হবে উপস্থিতির একটা আনুমানিক সংখ্যা। সেই হিসাবে ঠিক

করতে হবে ফরাস, সোফা, ডিভান ও চেয়ারের মাপ ও সাইজ (পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোফা বিক্রি করেন ক্যালিফোর্নিয়ার তালম্যাগভিল ফার্নিচার কম্পানী, নাম কিং তালম্যাগ সোফা, লম্বা ১২ ফুট, ৮ জন বসতে পারে! আর সবচেয়ে বড় চেয়ার আছে আলবামায়। বসতে পারে না একজনও; কারণ, মাপ খাড়াইয়ে ৩৩ ফুট, চওড়ায় সাড়ে ১৯ ফুট।) এক এক জন বসতে জায়গা লাগে, আড়ষ্ট হয়ে বসলে



১৫নং নকশা

১৯ ইঞ্চি × ১৯ ইঞ্চি ও সামনে আরো দশ ইঞ্চি মত পা রাখার জায়গা আর একটু এলিয়ে বসলে ২২ ইঞ্চি × ২২ ইঞ্চি ও সামনে ১৮ ইঞ্চি পা ছড়ানোর জায়গা। ছোট মাপের আসবাব হলে ৮ ফুট × ৫ ফুট জায়গায় ৬ জন লোক মুখোমুখি বসে দিব্যি আড্ডা মারতে পারে (**১৫ নং নকশা**)। এর সাথে চওড়ায় ৩ ফুট যোগ

দিলে কাজ:করার টেবিল, পড়ার আলো, ম্যাগাজিন স্ট্যাণ্ড ইত্যাদির আয়োজন তো হয়ই, চেয়ার ও পাফ কুশন নিয়ে সপ্তম ও অষ্টম জনও যোগ দিতে পারে আড্ডাতে। বাঙ্গালীর ঘরে নবতম সংযোজন টিভি যা বাড়ীর নকশা করার ফরমুলাগুলিকে আমূল নাড়া দিয়েছে। প্রথমতঃ টি ভি ঘরে ঢোকার পর থেকেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ছুটি ড্রইংরুমের। একটিতে কর্তা ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে ঠাণ্ডা বিয়ারের সাথে মারবেন রাজা-উজির, থুড়ি কপিল দেব-রাজীব গান্ধী। অন্যটিতে গৃহিণী ঘর আরো ঘোরতর অন্ধকার করে গরম কফির সাথে ডুব মারবেন দূরদর্শনের ন্যাশনাল প্রোগ্রামে বা স্টিরিয়োতে রবিশঙ্করের সেতার বাদনে। ছুটি ব্যবহার প্রবাহকে এক কামরেমে বন্দ করলে ছুটির উপভোগ্যতাই মাঠে মারা যাবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় ছুটি মাত্র সমাধান। এক. বাদলকে দিয়ে বন্ধুদের বলে পাঠানো 'বাবু বল্লেন বাবু বাড়ী নেই,' অথবা এনট্রেন্স লবীটাতে **১৫ নং নকশা** মাফিক আড্ডাখানা বসিয়ে সেখানেই ইয়ারদারী করা যতক্ষণ না খোকার মা ইডিয়ট বাক্সের কান মুচড়ে তাকে ঠাণ্ডা করছেন। আর না হলে গিন্নীকে আনিয়ে দিন ইংল্যাণ্ডের সিনক্লেয়ার রেডিয়োনিকস লিমিটেডের কুড়ি আউন্স ওজনের মাইক্রোভিশন টিভি (৭ ইঞ্চি × ৩½ ইঞ্চি × ২ ইঞ্চি মাপ—পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম) যাতে তিনি সেটি আঁচলে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন গোসাঘরে। সাধারণ ২০/২২ ইঞ্চি স্ক্রীনে ছবি দেখতে হয় ১০/১২ ফুট দূর থেকে, ২৬ ইঞ্চিতে আঠারো ফুট। মাইক্রোভিশনে ঘর এত বড় করার কোন বালাইই নেই। স্ক্রীনের মাপ ২ ইঞ্চি, দেখবেন দেড় ফুট দূর থেকে। বড় টিভির আর্দিং ভাল না থাকলে অ্যান্টেনাতে বাজ পড়ে টিভি জ্বলে যেতে পারে। পকেট টিভির এসব ঝামেলাও নেই কারণ তার অ্যান্টেনাই নেই। আর ভেবে দেখুন এই টিভি হাতে ধরে যখন সিনেমা দেখবেন তখন হেমা মালিনী থেকে মুনমুন সেন সবাই আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে! কি রোমাঞ্চকর ব্যাপার বলুন তো !!

বৈঠকখানাটা যেহেতু আপনার বাড়ীর শোকেস—এসো জন, বসো জন – পাঁচজনের অবাধ প্রবেশ এ ঘরে—অতএব এ ঘরটাকে তো একটু সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতেই হবে। এ ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত ধারণা বিলেতীয়ানার অন্ধ অনুকরণ না করে, দেশী পদ্ধতিতে ঘর সাজালে তা সহজে লোকের নজর কাড়বে সকীয় বৈশিষ্ট্যে। একটু ভেবে দেখুন প্রতিটি বিলেতী আসবাবের দেশী সংস্করণ হাজির আছে কিন্তু হাতের কাছেই ঃ

বিলেতী উপকরণ		**দেশী উপকরণ**
সোফা	—	ফরাস (এর সুবিধা প্রয়োজনে বাড়তি শয়ন ব্যবস্থা হতে পারে)
কুশন	—	তাকিয়া (রঙ্গীন সুতোর কাজ করা)
পাফসিট	—	মোড়া (চামড়ায় মোড়া গদি-ওয়ালা বা বেতের গোলাকার মোড়া ছুই-ই দেখতে ভারি সুন্দর (**১৫ নং নকশা**)

বিলেতী উপকরণ	দেশী উপকরণ
কার্পেট —	গালচে বা শীতল পাটি
ওয়াল পেপার—	দেয়ালের গায়ে আঁকা আলপনা (৩৯ রাজা বসন্ত রায় রোডের 'চিত্রাংশু' শিল্প সংস্থায় আলপনার এলবাম পাওয়া যায়, অসম্ভব সস্তায়—দেড়শ বর্গফুটের একটি দেয়াল ঢাকতে গোটা ৬০'০০ টাকা খরচ) বা মাদুর।

এই ভাবে ঘর সাজাতে হলে এলোমেলো খাপছাড়া ভাবে কাজ না করে একটা পরিকল্পিত পথ ধরে আস্তে আস্তে এগুনোই ভাল। গৃহসজ্জা হতে পারে মূলতঃ দুরকম—ফরমাল ও ইনফরমাল। আপনার ঘরে কোন্‌টা হবে তা ঠিক করে বেছে নেবেন তার উপযুক্ত একটি দেশী ঘর সজ্জার ধাঁচ (নীচের 'লতিকাটি' এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে)।

দেশী গৃহসজ্জা পদ্ধতি

- ফরমাল
  - মোগল ধাঁচ
  - রাজস্থানী ধাঁচ
  - দক্ষিণ-ভারতীয় ধাঁচ
- ইনফরমাল
  - শান্তিনিকেতনী ধাঁচ
  - আধুনিক ভারতীয় ধাঁচ
  - মণিপুরী-নাগা ধাঁচ

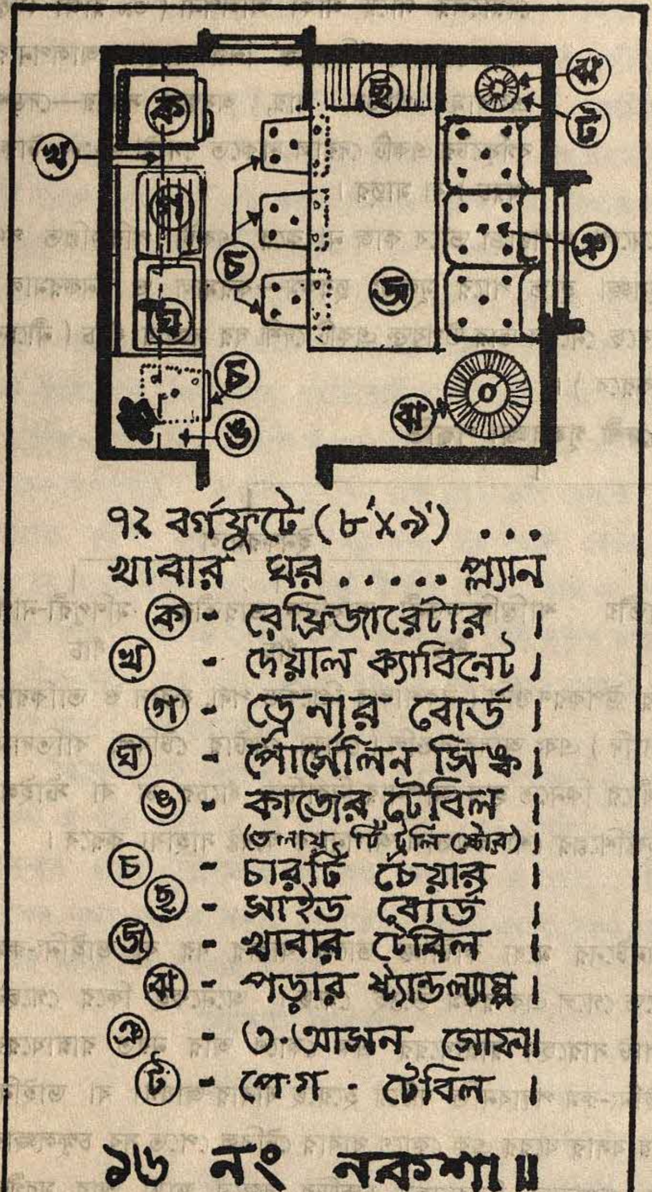
ধাঁচ বেছে নেবার পর ঘর সাজানোর উপকরণগুলি (নকশাদার প্রিন্টেড পর্দা, ফরাস ও তাকিয়ার কভার, ফুলদানী, পেন্টিং, আলোর শেড ইত্যাদি) এবং আসবাবগুলি (মোড়া, সেন্টার টেবিল, বাতিদান, ম্যাগাজিন স্ট্যাণ্ড, বুককেস ইত্যাদি) ধীরে ধীরে কিনতে হবে আপনার নির্বাচিত ধাঁচের ঢং বা স্টাইল-যুক্ত ডিজাইনে। এ ব্যাপারে প্রাদেশিক হস্তশিল্পের শো রুমগুলি আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

● খাবার ঘর

বর্তমানে আমরা যে অর্থ নৈতিক অনটনের মধ্যে কাটাচ্ছি তাতে খাবার ঘর বা ডাইনিং-রুম ব্যাপারটা আমাদের ছোট ছোট ফ্ল্যাটে বলতে গেলে এক রকম উঠেই গেছে। অনেকেই ফিরে গেছেন বাপ পিতেমোর সাবেকি চালে—খাওয়ার পাট সারছেন রান্নাঘরের এক কোণে আর নয়ত রান্নাঘরের দাওয়ায়। অনেক ফ্ল্যাটে খাবার ঘর—ডাইনিং-রুম পদাবনতি ঘটিয়ে হয়েছে খাবার জায়গা বা ডাইনিং স্পেশ। কেউ কেউ অ্যামেরিকান কায়দায় বসার ঘরের এক কোণে খাবার টেবিল পেতে সব চক্ষুলজ্জার বালাই ঘুচিয়ে চেয়ায়ের উপর ঠ্যাং তুলে প্রাণভরে চিবোচ্ছেন চচ্চড়ির সজনে ডাটা আর মুরগীর কালিয়ার ঠ্যাং।

খাবার ঘরই বলুন আর খাবার জায়গাই বলুন—মাপটা আসলে নির্ভর করবে আপনার সংসারে পিণ্ডি গেলনের মুখ কয়ডা তার উপর। (যেমন ধরুন ১৮৮৯-তে ফ্রান্সের প্যালাইস দ্যা লা-ইনদাসত্রিএ

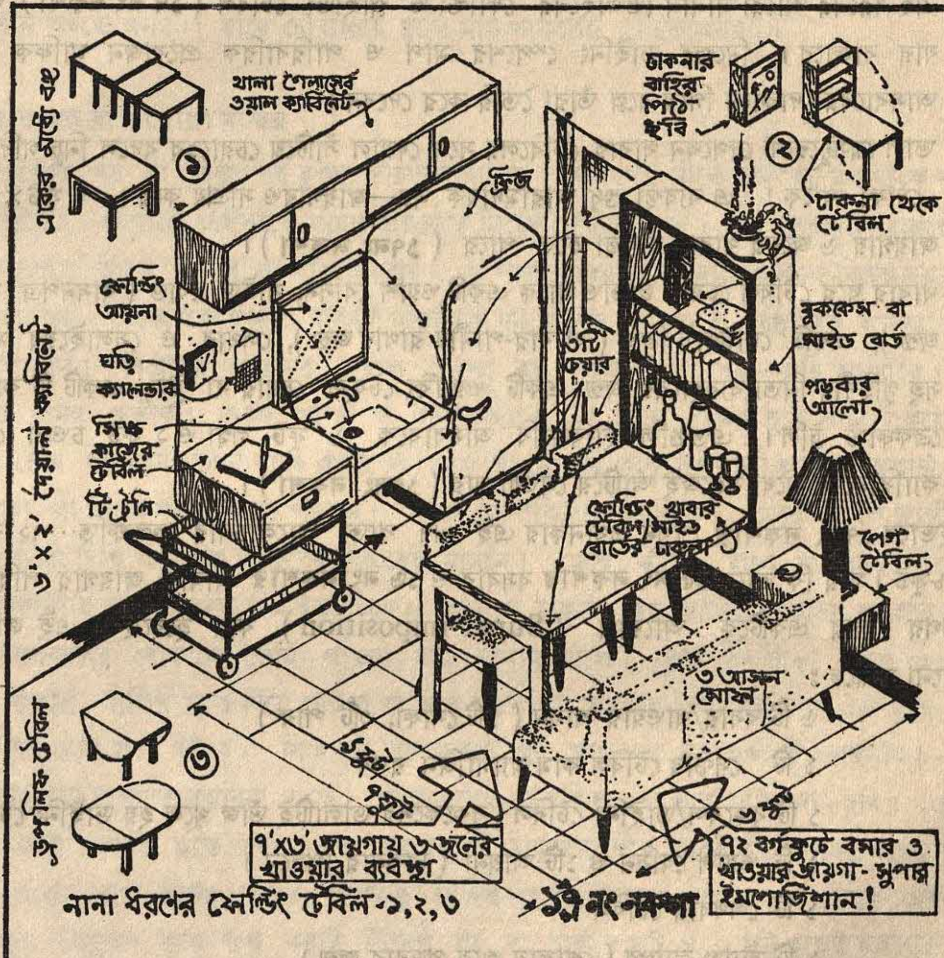
প্রাসাদে দেশের তাবৎ মিউনিসিপ্যাল কর্মী ভোজে বসেছিলেন এক সাথে। তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮০০০। ঘরোয়া ভোজে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হিসাবে আজো এটি বিশ্ব রেকর্ড। অবশ্য খোলা আকাশের নিচে বসা ভোজের রেকর্ডটি হয় আরো এগারো বছর বাদে ওই ফ্রান্সেরই টুইলারীর বাগানে। ২২.৯.১৯০০ তারিখে রাষ্ট্রপতি লুবেটের প্রদত্ত ভোজ সভায় হাজির ছিলেন ২২,২৯৫ জন। তবে কি ফরাসীরাই সব চেয়ে বড় ভোজন রসিক? আজ্ঞে না। সব চেয়ে জাঁকালো মেনুর রেকর্ডটি ইরানের প্রাক্তন শাহেন শাহ্ আরিয়ামেহেরের এবং শাহবানু ফারা দিবার। ইরান সাম্রাজ্যের ২৫০০তম বার্ষিকীতে তাঁরা ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে পার্সিপোলিসে যে ভোজ সভা দিয়েছিলেন তার মেনুটিই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মেনু। পুরো মেনুটা উগরে আপনাদের মনঃকষ্ট দিতে চাই না। শুধু একটাই বলি। প্রধান আইটেম ক'টা ছিল পুর দেওয়া আস্ত ময়ূরের রোস্ট, পুর ছিল মিষ্টি রাস্পবেরী স্যাম্পেনে ভেজান সবজি, কোকিলের ডিমের ভিতর ইরানী ক্যাভিয়ার, নানটুয়া সসে জড়ানো ক্রে মাছের ল্যাজে ভরা পাঁঠার রোস্ট ইত্যাদি। শতাধিক জাতীয় পানীয়ের মধ্যে প্রধান এবং সেরা ছিল দেড়শ বছরের পুরানো রথচাইল্ড ওয়াইন যা যুগিয়েছিল প্যারিসের 'মাক্সিম', বোতল প্রতি ১২০০ টাকা দরে।)



১৬ নং নকশা॥

ছ্যা, ছ্যা করছেন ? সত্যি ডাইনিং স্পেশের প্ল্যান করতে গিয়ে ডুব মেরেছি শাহী মেন্যুতে। আপনারা যে আমাকে পেটুক বলে গালমন্দ করেন সেটা মোটেই মিছামিছি নয়। অতএব চলুন ভোজ্য থেকে ভোজনাগারে।

সাধারণতঃ ছোট বাঙ্গালী পরিবারে অতিথি অভ্যাগত নিয়ে ৪ থেকে ৬ জন এক সঙ্গে খেতে বসেন। এর বেশী হলে মেয়ে-পুরুষ বা আঁশ নিরামিষে শিফট ভাগ করে নেওয়া হয়। কিন্তু ছ জনের মাপের প্রমাণ সাইজের টেবিলে ৬ জন আরাম করে বসে খেলে, পরিবেশনকারীর যাতায়াতের স্থান সমেত ৯ ফুট× ১১ফুট জায়গা লাগবে। অনেক ফ্ল্যাটে এই ১০০ বর্গফুট জায়গাও খাবার



টেবিল ঘিরে জোটানো শক্ত হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে কি ভাবে আরো কম জায়গায় কার্যসিদ্ধি করা যায়, দেখা যাক।

(১) গোল টেবিলে পরিবেশনের সুবিধা হয় কিন্তু জায়গা বেশী লাগে। তিন জনের উপযোগী

টেবিলের ব্যাস ২ ফুট ১০ ইঞ্চি থেকে ৩ ফুট ২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ৪ থেকে ৬ জনের উপযোগী টেবিলের ব্যাস ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি থেকে ৩ ফুট ৮ ইঞ্চি অবধি হওয়া দরকার। এক ধরনের ডিম্বাকার টেবিল হয় (**১৭নং নকশা**) যার উপরের অংশটি ভাঁজ করে রাখা যায়··· খুলে দিলে টেবিলের আকার ৭।৮ জনের উপযোগী হয়ে যায়। একে বলে ড্রপ-লিফ টেব্‌ল্। অল্প জায়গার মধ্যে গুটিয়ে রাখা যায়।

(২) ভাঁজ-করা আর এক রকম ডাইনিং টেবিলের ছবি রয়েছে ১৭ নং নকশায় যা ব্যবহারের আগে পরে গুটিয়ে হয়ে যায় বেমালুম একটি দেয়ালে টাঙ্গানো ছবি।

(৩) এই ধরনের আরো নানান ডিজাইনের ফোল্ডিং ও স্লাইডিং টেবিল (**১৭ নং নকশা**) পাওয়া যায় বাজারে। নিজের ডাইনিং স্পেশের মাপ ও পারিবারিক প্রয়োজন মাফিক ভাল আসবাবের:দোকানে গিয়ে বল্লে তাঁরা তৈরি করে দেবেন।

(৪) ভাল রেস্টুরেন্টে দেখবেন খাবার টেবিলের সঙ্গে দেয়াল সাঁটিয়ে চেয়ারের বদলে নিচু গদি আঁটা সোফা থাকে। এ ব্যবস্থা শুধু আরামদায়ক নয়—জায়গারও সাশ্রয় করে। ৭ ফুট × ৬ ফুট জায়গায় ৬ জনের খাবার ব্যবস্থা হতে পারে (**১৭নং নকশা**)।

(৫) খাবার ঘরে টেবিল চেয়ার ছাড়াও থাকে একটি ওয়াশ বেসিন, সাইড বোর্ড (বাসনপত্র রাখার জন্য), একটি ছোটখাট ফ্রিজ (বা বার-পানীয় রাখার জন্য), লেখার ও সেলাইয়ের সরঞ্জাম সহ গৃহিণীর নিত্য ব্যবহারের জন্য একটি ওয়ার্কিং টেব্‌ল্ চেয়ার বা টুল, একটি টি কার্ট বা ব্রেকফাস্ট ট্রলি। এতগুলি হাবিজাবি আসবাবকে ৬ ফুট লম্বা ও ২ ফুট চওড়া দেয়াল ক্যাবিনেটের মধ্যে সহজেই আঁটিয়ে নেওয়া যায় (**১৭নং নকশা**)।

এইভাবে **১৭নং নকশায়** দেখুন এখানকার এই ৬।৭ পাতা আলোচনার ফলশ্রুতি···৭২ বর্গফুট (৯ ফুট × ৮ফুট) ঘরে কি ভাবে **১৫ নং নকশার** বসবার ও **১৬ নং নকশার** খাবার জায়গার পরিকল্পনা একটির উপর আর একটিকে আরোপ (Super-imposition) করা হয়েছে। এই জায়গার মধ্যে আঁটানো হয়েছে ঃ

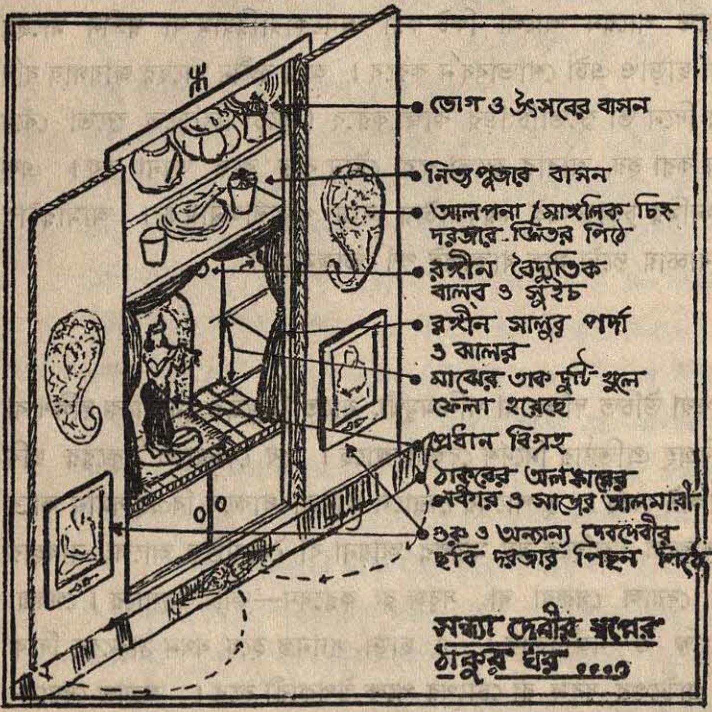
৬ টি বসার/খাওয়ার আসন (১টি সোফা, ৩টি পাফ)
১ টি সেন্টার টেবিল কাম ম্যাগাজিন র‍্যাক
১ টি বুককেস/ডাইনিং টেবিল (বুককেসের ডালাটিই ভাঁজ খুলে হয় ডাইনিং টেবিল)
১ টি ওয়াশ বেসিন ও ১টি আয়না (ঢাকনার পিছনে)
১ টি লেখবার টেবিল
১ টি স্ট্যাণ্ড ল্যাম্প (শোফায় শুয়ে পড়বার জন্য)
১ টি ফ্রিজ
২ টি বাসন রাখার দেয়াল আলমারী
এবং ১ টি ব্রেকফাস্ট ট্রলি।

এই ঘরটি আপনার হঠাৎ এসে পড়া ব্যাচেলার অতিথির এক-দু রাত কাটানোর পক্ষেও চমৎকার। খাবার ঘরের আলোকসজ্জার বিশেষত্ব—আলো হবে অল্প—সরাসরি ঝুলে থাকবে খাবার টেবিলের উপর। বড় স্থায়ী টেবিল হলে মাঝখানে রাখতে পারেন আলো ফিট করা অ্যাকোয়ারিয়াম বা রঙ্গীন মাছের চৌবাচ্চা। টেবিল আলোকিত করা ছাড়াও এটা শোভাবর্ধন করবে। আর রঙ্গীন মাছের জায়গায় যদি চারাপোনা ছাড়েন, এই মাগ্গীগণ্ডার দিনে তা সুতোচিংড়ির কাজ করবে (কুচো চিংড়িতে সুতো বেঁধে রেখে প্রত্যেক গরসে তা পেটে চালান করা হয়, আবার সুতো ধরে টেনে বার করে আনা হয়। এক চিংড়িতে ভাতের পাহাড় শেষ। ইকনমির চূড়ান্ত এই ফরমুলাটার নাম পুনর্ভোজনায় চ। আমারটার নাম দর্শনে অর্ধভোজনম্। মানে চৌবাচ্চায় দুটো মাছ থাকলেই পূর্ণ ভোজনম্।)

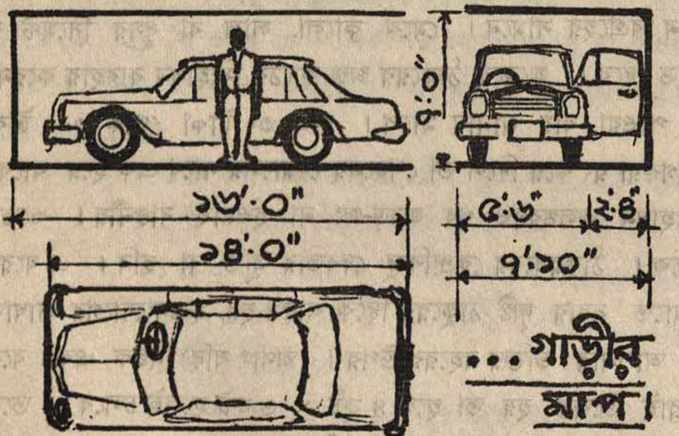
● পূজার ঘর বা ঘরোয়া মন্দির

পূজোর ঘর বা ঠাকুর ঘর হওয়া উচিত দক্ষিণ বা পশ্চিমমুখী, যাতে ঠাকুরের মুখ থাকে দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে। ধর্মশাস্ত্রে এইভাবে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া আছে। যে দেওয়ালে ঠাকুরের ছবি বা মূর্তি বসবে তাতে জানলা না থাকাই শ্রেয়। দু পাশের দেয়ালে জানলা থাকলে বিগ্রহ সমান ভাবে আলোকিত হয়। একদিকে জানলা থাকলে অন্যদিকে সম মাপের আয়না বা বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করতে পারেন। বিগ্রহের পেছনের দেয়াল গেরুয়া বা সবুজ রং করবেন—রুচি অনুসারে। গেরুয়া ত্যাগ ও ধর্মের প্রতীক। সবুজ শান্তি ও সজীবতার। এ ছাড়া ধ্যানস্থ হয়ে যখন ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবেন তখন ব্যাক গ্রাউণ্ডের সবুজ রং চোখের পক্ষে উপকারী হবে। অন্যান্য দেয়াল-গুলি সাদা বা ফিকে সবুজ করতে পারেন। সাদা রং পবিত্রতার প্রতীক। মেঝে মার্বেল জাতীয় সাদা হলে কালো রং দিয়ে আলপনা আঁকবেন বিগ্রহের সামনে। মেঝে কালো, লাল বা ধূসর সিমেন্ট রং হলে আলপনা হবে সাদা জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে। অনেকে ঠাকুরের জন্য কাঠের সিংহাসন ব্যবহার করেন। এগুলি আসবাবের দোকানে তৈরি পাওয়া যায় নানান মাপে। দাম ৩০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। কাঠের পালিশ তুলে দিয়ে গেরুয়া রং করে দিলে তা পেছনের দেয়ালের সাথে এক হয়ে যাবে। বিগ্রহের রূপ বেশী ফুটে উঠবে। সিংহাসন অলঙ্করণও খুব জবড়-জং না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওতেও ঠাকুর চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠাকুরঘরের কেন্দ্রবিন্দু দেবতার মূর্তি বা ছবি। এ ঘরের সাজসজ্জা তাই এমনই হতে হবে যাতে সবার দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট হয়, মনঃসংযোগের ব্যাঘাত না হয়। ঘরের মাপ নির্ভর করবে আপনার ভক্তির বহরের উপর। অর্থাৎ যদি নিছক একা বসে সকাল সন্ধ্যা কিছুক্ষণ করে জপ করাই উদ্দেশ্য হয় তা হলে ৪ ফুট × ৬ ফুট হলেই চলবে। তবে সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ, বার ব্রত অর্থাৎ পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে জাঁকজমকে ধর্মাচরণ করতে চান তা হলে ঘরটি কমপক্ষে ১২ ফুট × ১৬ ফুট হওয়া দরকার। ঘরের সামনে একটি ৬ বা ৮ ফুট চওড়া বারান্দা থাকলে চমৎকার। ঘর ও বারান্দার মাঝের দরজাটি ৬ ফুট চওড়া ৪টি ভাঁজ পাল্লার দরজা হলে বেশী ভিড়ে ঘর ও বারান্দা এক সাথে ব্যবহার করা চলবে। বছর দুয়েক আগে মালিনী পত্রিকায় কাঁথি থেকে সন্ধ্যা

প্রামাণিক লিখেছিলেন, তাঁর স্বপ্ন ও প্রয়োজন একটি ছবির মত সাজানো ঠাকুর ঘরের। অথচ তাঁর বাড়িতে কোন বাড়তি ঘর নেই।



ওই পত্রিকায় সাজাই গোছাই বিভাগে তাঁর সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে উত্তর দেয়া হয়েছিল, বাড়তি ঘরের অভাবে বাড়িতে ঠাকুর ঠাঁই পাচ্ছেন না? ঠাকুর বিগ্রহ না হয়ে আপনার জামাই বা বিধবা মা হলে কি করতেন? ঠাকুরকে পরিবারের একজন ভাবতে শুরু করুন। দেখবেন জায়গার অভাব হবে না। বারান্দার একটা প্রান্ত কাঁচ বা কাঠের পার্টিশান দিয়ে ঘিরে নিতে পারেন। মফঃস্বলে, বাড়ীর উঠোন বা বাগানের এক-কোণে ছোট্ট মাটির ঘর খড় দিয়ে ছেয়ে নিন। গোবর লেপে দেয়ালের গায়ে সাদা রং-এর আলপনা দিন—ভেতর বাইরে। চমৎকার মন্দির হয়ে যাবে একেবারে আপনার একান্ত নিজস্ব। এত খরচের মধ্যে যদি না যেতে চান, **১৮ নং নকশায়** দেখুন, দেয়াল আলমারির তাক খুলে কি রকম খাসা ফোল্ডিং ঠাকুরঘর তৈরি করা হয়েছে (আমাদের বাপ-ঠাকুরদা আমাদের সিকির সিকি রোজগার করে দোল দুর্গোৎসবে মাতিয়ে রাখতেন তাঁদের চণ্ডীমণ্ডপ আর আমরা তার চার গুণ আটগুণ রোজগার করেও ঠাকুরকে ভরছি বিল্টইন কাবার্ডে)।



১৮ নং নকশা

● **গ্যারাজ**

পুরাকালে থাকত হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। আজ হাতি ঘোড়া মরে হেজে ভূত হয়ে গেছে। সেদিনের ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম ল্যাণ্ডো মায় ছক্কর গাড়ী অবধি নিশ্চিহ্ন। তার স্থানাধিকার করেছে অ্যাম্বাসাডার মার্কফোর, প্রিমিয়ার পদ্মিনী ফিয়াট এবং স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড নয়া জমানার নয়া গাড়ীর দল। এক একটা মোটরের আস্তানা তৈরি করতে লাগে কমবেশী ১২৫ বর্গফুট জায়গা···টিনের চালা দিয়ে ঢাকতে গেলেও খরচ পড়বে দশ থেকে বারো হাজার (**১৮নং নকশা**)।

এত দামী ঘরকে কেবল গাড়ীশালা করে ফেলে রাখা অনুচিত। একে যথাসম্ভব নানা কাজে লাগিয়ে প্রকৃত সর্বার্থসাধক প্রকোষ্ঠে রূপান্তরিত করা দরকার। গাড়ী রাখতে গ্যারাজের যে ন্যূনতম মাপ দরকার তা হল ৮ ফুট × ১৪ ফুট অর্থাৎ ১১২ বর্গফুট। এতে তাক মাফিক আরো ৮০ বর্গফুট জুড়ে দিলে তাকে কত রকমে ব্যবহারে লাগানো যায় তা বুঝতে হলে নজর করে দেখুন (**১৯ নং নকশায়**) প্ল্যান ও সেকসানে ঃ

(১) প্রথমেই এটিকে কাজে লাগানো হচ্ছে রাত্রে গাড়ী রাখার জন্য গ্যারাজ স্পেশ বা কভার্ড (ঢাকা) পার্কিং হিসাবে।

(২) দিনের বেলা গ্যারাজ থেকে গাড়ী বের করে নেবার পর এটি ব্যবহৃত হবে এন্ট্রেন্স পর্চ (Entrance Porch) বা প্রবেশ কক্ষ হিসাবে। বাগিচা উঠানের দিকটায় দেয়াল না দেওয়া থাকায় একটি ফুল গাছে শোভিত আলোকোজ্জ্বল অন্তর্মুখী বারান্দার মত লাগবে।

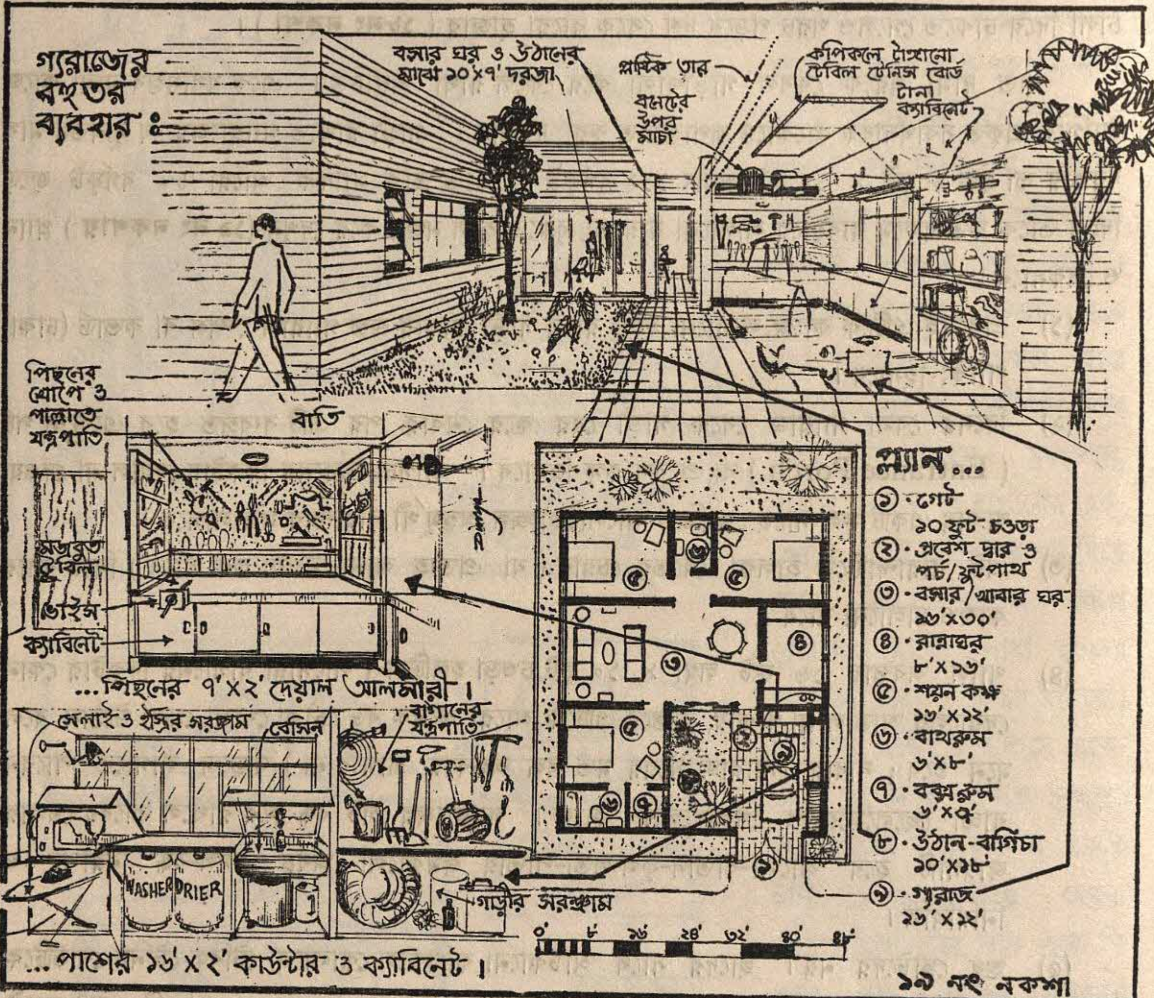
(৩) এই বারান্দাটিতে হালকা বেতের চেয়ার (যা প্রত্যহ আনা-নেওয়া করা যাবে) নিয়ে বসার কাজও চালানো যাবে।

(৪) খালি অবস্থায় ১৬ ফুট লম্বা × ১০ ফুট চওড়া হলটিকে (লাগোয়া বাগানের দিকটার কোন দেয়ালের আড়াল না থাকায়, বাস্তবে এটিকে আরো অনেক বড় চৌকা খোলা মেলা উঠোন বলে মনে হবে ; সাধারণ গ্যারাজ ঘরের মত বদ্ধ অন্ধকার লাগবে না) স্বচ্ছন্দে লাগাতে পারেন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোর কাজে। গ্যারাজের গেট বন্ধ করে রাখলে তাদের খেলার জায়গাটি হবে আলো-বাতাস-ফুল-লতা-পাতায় জমকালো অথচ অর্গল-বন্ধ নিরাপদ ও নিরিবিলি।

(৫) শুধু ছোটদের নয়। ছাদের সাথে আটকানো কপিকলে ঝোলানো টেবিল টেনিস বোর্ডটিকে (৯ ফুট × ৫ ফুট) দড়ি ছেড়ে নামিয়ে আনুন কোমরের লেভেলে। ৪/৬ টি তরুণ তরুণী যুবক যুবতীকে অনায়াসে ৪/৫ ঘণ্টা মাতিয়ে রাখতে পারবে এই সর্বার্থসাধক গাড়ীশালা।

(৬) গ্যারাজের পিছন দিকটায় রয়েছে একটি ৭ ফুট × ২ ফুট মাপের দেয়াল আলমারি যাতে তাকের বদলে ফিট করা রয়েছে মজবুত টেবিল ঃ একপাশে ভাইস। পিছনের খোপে করাত, ছেনি, হাতুড়ি, মাটাম, ড্রিল, স্ক্রু ড্রাইভার, র‍্যাদা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি। আলমারীর পাল্লাতেও

ঝুলছে রকমারি যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। দেখেই বোঝা যায় বাসিন্দা ভদ্রলোকের শখ বা হবি হচ্ছে কাঠের আসবাব ইত্যাদি করা (**১৯ নং নকশা**)। আপনার শখ যদি হয় সেলাইয়ের কিম্বা ফটোগ্রাফির অথবা পোড়া মাটির কাজের তা হলে আলমারিটিকে সাজান সেইভাবেই (এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে বুঝতে হলে পরের অধ্যায়ে কাজ-খেয়াল-খেলার ঘরটির বিষয় ভাল



১৯ নং নকশা

করে পড়বেন)। এক কথায় গাড়িটিকে বের করে নেবার পর গ্যারাজটিকে কাজের ঘর হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন এবং পিছনের ওই কাজের আলমারীকেও। কিছু না হোক, বাড়ী ও গাড়ীর টুকটাক মেরামতি কারখানা হিসাবে।

(৭) বনেটের উপরের জায়গাটায় ইচ্ছে করলে তৈরি করে নিতে পারেন একটা লফ্‌ট্‌ বা মাচা—যার ওপর গুদামজাত করে রাখতে পারেন—বাড়ীর হাবড়ি জাবড়ি···প্যারামবুলেটার, সাইকেল থেকে শুরু করে বাড়তি লেপ, তোষক, কম্বল বালিশ···কি নয় !

(৮) ডান দিকের দেয়ালে রয়েছে ১৬ফুট লম্বা ২ফুট চওড়া কাউন্টার—যার মাথার ওপরে আর তলায় রয়েছে টানা ক্যাবিনেট। কাপড় ধোয়ার মেসিন, ইস্ত্রির সরঞ্জাম, ড্রায়ার, সেলাই কল, বাগানের যন্ত্রপাতি (কাঁচি, মোয়ার, ব্রুম, কার্টার, হোসপাইপ, ঝারি ইত্যাদি)—সব কিছু জমিয়ে রাখা যায় এখানে। অর্থাৎ গ্যারাজটি আপনার টেলারিং শপ, ধোবীখানা এবং বাগান বাড়ীর সমাহার হয়ে উঠতে পারে।

(৯) গাড়ীর মাথার উপর দিয়ে টাঙ্গানো রয়েছে যে তিনটি প্লাস্টিকের দড়ি বর্ষার ঘন ঘোর ঘটায় ওখানে মেলে দিতে পারেন ভিজে কাপড়। নির্বিঘ্নে শুকিয়ে যাবে বাদ্‌লার পরোয়া না করেই।

'এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—' !

বুঝেছি। বহুতর ব্যবহারের ডজন পেরোতে চান? ঠিক হ্যায়, লিখে নিন :

(১০) আহ্লাদী মেয়ের আহ্লাদ মেটাতে বাড়ীতে সরস্বতী পূজো কিম্বা গিন্নীর ফরমাসে হচ্ছে সত্যনারায়ণ ! গাড়ীটাকে সাময়িক ভাবে রাস্তায় বা পাড়ার পেট্রোল পাম্পে নির্বাসন দিয়ে গ্যারাজকে বানান পূজো প্যাণ্ডেল।

(১১) আপনাদের কর্তা-গিন্নির বিবাহ বার্ষিকীতে ভোজ দিচ্ছেন বুফে কায়দায়? টানা টেবিল পেতে খানা সাজান গাড়ীখানার বুক জুড়ে। কন্যারত্নের বিবাহে বরাসনও বসাতে পারেন গ্যারাজে। বাবাজীবন আপত্তি করলে তার কানে কানে না হয় জানিয়ে দেবেন, গাড়ী কিনেছি পৌনে এক লাখে ; তোমাকে তো কিনছি বাছা প্রায় একই দামে।

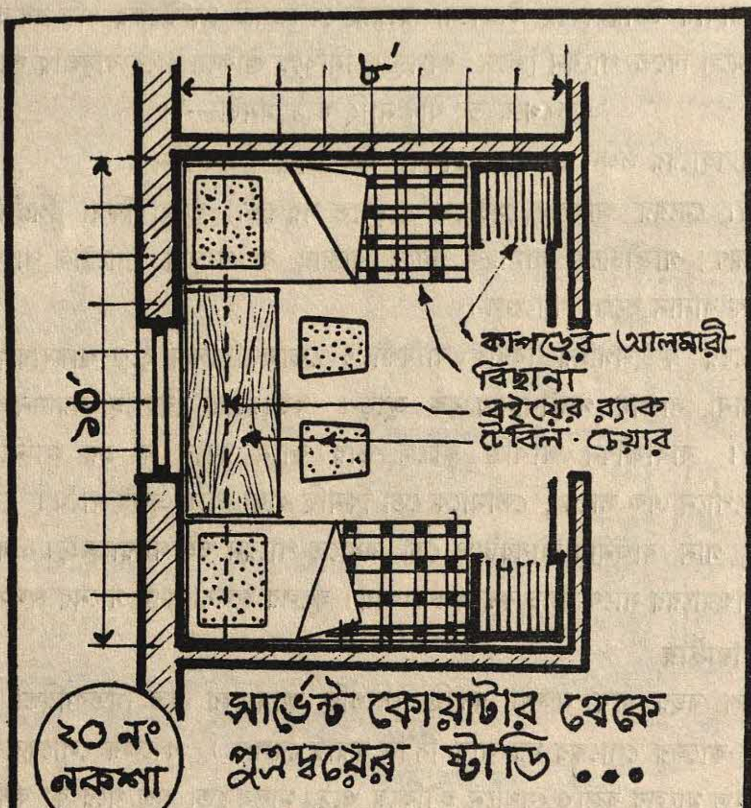
(১২) ঘরোয়া গান বাজনার আসরটাও তো বসাতে পারেন ওই গ্যারাজেই। সামনের উঠোনের সিজন ফ্লাওয়ারের সাথে ম্যাচ করবে চমৎকার। ফুলের জলসা কাম গানের জলসা !

● সারভেন্টস কোয়ার্টার

বিগত পঁচিশ বছর ধরে নকশা করছি, দেখেছি আমাদের যত মিতব্যয়িতা, যত কঞ্জুষী, যত কিফায়েতি কেবল কাজের লোকের ঘর আর সিঁড়ি করার বেলায়। কাজের লোকের ঘরটা যত ঘুপচি অন্ধকূপ (গুদামজাত মালের বস্তাও সেখানে হাঁফিয়ে ওঠে, মানুষ তো অন্য পরে কা কথা !) করা যায় আর সিঁড়িকে করা যায় যত খাড়া আর সরু (যেন উপরে উঠবেন একমাত্র তেনজিং নরগে !) নকশাকারের যেন ততই বাহাদুরী ইকনমিক প্ল্যান করার।

সাধারণত এই ধরনের চাকরদের ঘর করা হয় বায়ু চলাচলহীন কোন সরু ফালি জায়গা নিয়ে যা নকশাকার আর কোনরকম কাজে লাগাতে পারছেন না···সিঁড়ির নিচে কিম্বা বাথরুমের পিছনে। জানলা প্রায়শঃই থাকে না, থাকলেও তা বড় মাপের ঘুলঘুলিরই নামান্তর। ৫ ফুট × ৭ ফুট সাইজের

এই রকম একটি ঘর (যাতে দুজন লোকের পাশাপাশি শোওয়া কষ্টকর) দেয়াল সমেত আয়তন হবে ৫৫ থেকে ৬০ বর্গফুট, আজকের বাজার দরে যার দাম ছ'হাজারের মত। নকশাকার এবং বাড়ীওয়ালা দুজনেই ভুলে যান যে গৃহভৃত্যও মানুষ···তারও শ্বাস-প্রশ্বাস বয়, অক্সিজেন নিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়ে, রক্তে লোহিত কণিকা কারু থেকে কম নয়। কিন্তু গৃহভৃত্য সেটা ভুলতে পারে না। ফলে 'সারভেন্টস কোয়ার্টার' নামক নরকে পচার থেকে ফুটপাতে রাত কাটান শ্রেয় মনে করে। বাবুর ছ' হাজারী সারভেন্টস কোয়ার্টারে বাসা বাঁধে চামচিকে, আরশুলো, মাকড়শা আর নেংটি ইঁদুর। এর থেকে কাজের লোকের ঘর না বানিয়ে অন্ততঃ ৬০০০ টাকা কোন সরকারী বণ্ডে লগ্নী করলে ১০ বছরে ১২,০০০ টাকা হত। 'সাতাশ হত এক শো সাতাশ'।



আমাদের বাড়ী বানাবার আইনে বলে থাকবার ঘরের ন্যূনতম মাপ হওয়া দরকার ৮০ বর্গ ফুট অর্থাৎ ৮ ফুট × ১০ ফুট। তৈরির বর্তমান খরচ ১০,০০০ টাকার মত। অর্থাৎ কর্তার সাধের সারভেন্টস কোয়ার্টার থেকে মাত্র ৪০০০ টাকা বেশী। কাজের লোকের জন্য ঘর করতে হলে এই মাপেরই ঘর করুন। কাজের লোক না থাকলে বাড়তি শোবার ঘর হিসাবে কাজে লাগবে। **২০ নং নকশায়**

দেখুন, নৌকরজীর অবর্তমানে আপনার দুই পুত্র ঘরটাকে কেমন খাসা বেড-কাম-স্টাডি বানিয়ে নিয়েছে। বাড়িতে বিয়ে-সাদী-পূজো-আর্চায় এরকম একটা একটেরে ঘর মিষ্টির ভাঁড়ার বা তত্ত্ব সাজিয়ে রাখতে খুব যুৎসই হয়। কিছু না হোক, রিটায়ার করার পর আপনার সখের মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় হেড অফিসও তো এটি হতে পারে।

কাজেই করতেই যদি হয়, কাজের লোকের ঘর প্রমাণ-সাইজের করুন যাতে প্রয়োজনে তার ভিন্নতর ব্যবহার সম্ভব হয়।

● সিঁড়ি

সাহিত্য বাবদে আমার গুরু সৈয়দ মুজতবা আলী। সৈয়দ-সাহেবের একটা খোশগল্প শুনুন :

এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়ীতে দেখেন তাতে একটা ল্যাডার (অর্থাৎ মই—মোজার একটা টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার)। দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি···একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করেছিলেন ?' **(হাস্যমধুর : ১ম সংস্করণ, ৪৯ পৃঃ)**

আজ্ঞে না, এক শিলিং-এর মোজা তো দূরের কথা, ওই রকম পেপার ব্যাক-সুলভ সংস্করণ বাড়ীতেও আমরা মার্বেল স্টেয়ারকেস আশা করি না। তবে এই বুড়ো বয়েসে লো-কস্ট-হাউসিং-এর নামে ল্যাডার বেয়ে টংএ চড়তে বললে একটু ভীত হব বই কি।

সিঁড়ির প্ল্যানিং-এর কতকগুলি আন্তর্জাতিক ফরমুলা আছে। সেগুলি মেনে চললে লাভ বই ক্ষতি নেই (**২১ নং নকশা**) :

(১) এক নাগাড়ে (Single flight) সর্বাধিক সংখ্যক ধাপের খাড়াই— ১৬

(২) সিঁড়ির ধাপের ডগা (Nosing) থেকে রেলিং-এর হাতলের ন্যূনতম উচ্চতা—২ ফুট ৯ ইঞ্চি

(৩) বাইরের খোলা সিঁড়িতে রেলিং-এর হাতলের ন্যূনতম উচ্চতা— ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি

(৪) ধাপের উপর থেকে ছাদের বা মাথার উপরের ধাপের তলদেশ অবধি ন্যূনতম বিশদ-উচ্চতা (Clear Height) ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি

(৫) সিঁড়ির ন্যূনতম বিশদ-চওড়া (Clear Width) আবাসিক বাড়ীতে— ৩ ফুট
কারখানা, বহুতল স্কুল, অফিস, ফ্ল্যাট— ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি

(৬) খাড়াই (Riser) ও ধাপের চওড়া (Tread)-এর পারস্পরিক ক্রম (Ratio) :

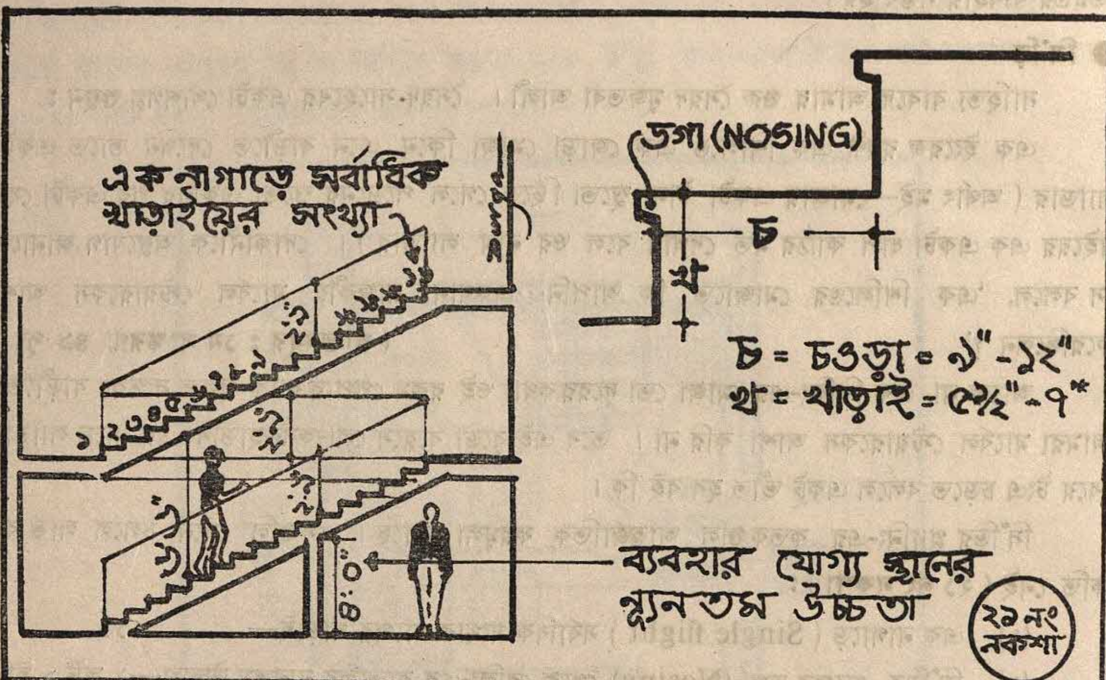
খাড়াই		চওড়া	
$5\frac{1}{2}$ ইঞ্চি	—	১২ ইঞ্চি	এ ব্যাপারে হিসাবের ফরমূলাটি হচ্ছে
৬ "	—	১১ ইঞ্চি	
$6\frac{1}{2}$ "	—	১০ ইঞ্চি	
৭ "	—	৯ ইঞ্চি	২ × খাড়াই + চওড়া = ২৩ ইঞ্চি

(৭) এ ছাড়া যে সব নিয়ম আছে তা হল ঃ

(ক) সব ধাপগুলি হতে হবে এক মাপের। সব খাড়াই সমান, সব চওড়াও সমান।

(খ) কাটা, বেঁকানো, গোল ধাপ (Winders) খুব বিপজ্জনক। না ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

(গ) ধাপের খাড়াইয়ের নিম্নসীমা ৫½ ইঞ্চি, উর্ধ্বসীমা ৭ ইঞ্চি। চওড়ার নিম্ন ও উর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৯ ও ১২ ইঞ্চি।



(ঘ) সিড়ির মেঝে বেশ একটু খসখসে ধরনের হবে যাতে মানুষ সহজে পিছলে না যায়।

(ঙ) খোলা দিকে মজবুত রেলিং ও টানা হাতল বা স্টোরেজ ক্যাবিনেট থাকা আবশ্যিক (৭নং ছবি)।

(চ) দিনে যাতে সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে সূর্যের আলো ও রাত্রে বৈদ্যুতিক আলো পড়ে তার দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। সিঁড়ির কোন কোণ বা বাঁক যেন স্বল্পালোকিত অন্ধকারাচ্ছন্ন না থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম দোতলায়। সেখানেই তো থাকে পেরাইভেট হারেমের ঘরগুলি, রাষ্ট্রভাষায় যাকে বলে অন্দর মহল। অতএব চলুন বা'র মহল ছেড়ে হোম-ইয়োপ্যাথি অষুধের বাকসটি বগলদাবা করে ঢুকে পড়ি পর্দা সরিয়ে পর্দানশীন অন্দর মহলে···সেখানকার ঘরগুলির হোম (Home)-যজ্ঞ সারতে······

৬

হোম-ইয়োপ্যাথি [অন্দর মহল]

'খোজারা বলল—জেনানা মহলে সুন্দর সুন্দর সব কামরা আছে। বেশ বড় বড় কামরা, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, এক কামরার সঙ্গে অন্য কামরার কোন যোগাযোগ নেই। কামরার বাহার ও বাইরের পরিপাটিও আছে যথেষ্ট। যেমন জেনানা, তেমনি তার কামরা। যিনি উচ্চপদস্থ, যাঁর রোজগার বেশী তাঁর কামরাটিও তেমনি বাহারে। যিনি সেরকম নন, তাঁর কামরার তেমন বাহার নেই। চারদিকেই বাগান আছে জেনানা-মহলের, সুন্দর সাজানো বাগান ও বাগিচা আছে। প্রত্যেক কামরার কাছে একটি করে জলের ট্যাঙ্ক আছে। সুন্দর সুন্দর মনোরম রাস্তা, ছায়াঘেরা কুঞ্জবন, ঝরনা, ভূগর্ভস্থ কক্ষ, উঁচু মঞ্চ ও তোরণ ইত্যাদিও আছে। এমনভাবে সব ব্যবস্থা করা আছে যে, জেনানা মহলের সীমানার মধ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ কিছু বোঝা যায় না। সূর্যকে আড়াল করে আনন্দ করার মতন আরামকুঞ্জ আছে, আবার উচ্চ মঞ্চের উপর শুয়ে বসে চাঁদের আলো ও ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করার মতন ব্যবস্থাও আছে। নদীর সামনে একটি ছোট মিনারের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে শুনেছি খোজাদের ! মিনারটি নাকি সোনার পাত দিয়ে মোড়া, আগ্রার দুটি মিনারের মতন। তার কক্ষগুলিও স্বর্ণমণ্ডিত এবং নানান রকম রঙীন চিত্রে সুশোভিত ! বড় বড় আয়নাও আছে দেয়ালের গায়ে লাগানো (বার্নিয়ের খাস মহলের কথা বলছেন)।'

এটি হল ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের Travels in Mogul Empire (1656-1668 A.D.) অবলম্বনে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ রচিত 'বাদশাহি আমলের' একটি অনুচ্ছেদ ॥ হারেমের বর্ণনা ॥-এর অংশ বিশেষ। অন্দরমহলের হোম-ইয়োপ্যাথিক চিকিচ্ছের মোগলাই ডোজ। তবে আজকের লাল বাংলায় মধ্যবিত্ত (যার আসল অর্থ ডিগ্রির সার্টিফিকেটটি বাদ দিলে বিলকুল বিত্তহীন) বাঙ্গালীর পক্ষে এই বুরজোয়া ডোজটি নেহাৎই অচল। আজকের যুগোপযোগী দাওয়াইগুলি অনেক বেশী ছিমছাম, সস্তা ও অধিকতর কার্যকরী। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে আসুন আমরা সেগুলিরই আলোচনা করি এখানে।

● শোবার ঘর

আমাকে শৈশবে মা, যৌবনে স্ত্রী, প্রৌঢ়ত্বে কন্যা এবং বর্তমান বার্ধক্যে নাতনী একবাক্যে সার্টিফিকেট দিয়ে চলেছেন যে আমি নাকি 'কুড়ের বাদশা'। স্রেফ শুয়ে বসে গড়িয়ে গড়িয়েই নাকি আমি জীবনটা নষ্ট করলাম। একঘেয়ে শুনতে শুনতে ক্ষেপে গিয়ে একদিন বসলাম ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করতে। ফলটা দেখে কিন্তু নিজেই চমকে উঠেছিলাম।

একটি ষাট বছরের পূর্ণ বয়স্ক মানুষ (শাস্ত্রে বলে মানুষ ষষ্ঠি-অব্দি-পূর্তিতেই লাভ করে পরিপূর্ণতা) বিছানায় কাটান মোট কুড়িটি বছর যার মধ্যে তাঁর কৃত্যের তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

সারা জীবনের—মোট ঘুমের	৯৮ শতাংশ,
—মোট স্বপ্ন দর্শনের	১০০ শতাংশ,
—মোট অসুস্থতার	৮০ শতাংশ,
—মোট বিশ্রামের	৬০ শতাংশ,
—মোট প্রেমের	৬৫ শতাংশ (এর মধ্যে দেহজ প্রেমের ১০০ শতাংশ ও বাক্যজ প্রেমের ৩০ শতাংশ অন্তর্ভুক্ত),
এবং —মোট কাজের	২০ শতাংশ (যার মধ্যে রয়েছে লেখার ৫০%, পড়ার ৭৫%, আড্ডার ২৫%, বেশ কিছু টেলিফোন এবং পান ভোজন)।

কলম্বিয়ার জুলিয়াস ওয়াকার খাটের উদ্দেশ্যে বানিয়েছিলেন এক স্মৃতিস্তম্ভ যার পাদদেশে উৎকীর্ণ ছিল 'এই বিছানায় প্রায় সমস্ত মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে, কাটিয়ে যাচ্ছে জীবনের এক তৃতীয়াংশ।'

এহেন খাটকে ঘিরেই শোবার ঘরের খট্টাঙ্গ-পুরাণ। আলোচনাটা গুরুতর হতে বাধ্য। প্রথমেই দেখা যাক একটি পূর্ণাঙ্গ শোবার ঘরে কি কি আসবাব থাকা জরুরী ঃ

(ক) এক জোড়া খাট—মাপ ৩ ফুট × ৬ ফুট। স্থানাভাবে ২টি সিঙ্গল বেডের বদলে চলতে পারে একটি ডবল বেড যার মাপ ৫ ফুট × ৬ ফুট।

(খ) খাটের দুপাশে রাখবার জন্য ২টি বেড সাইড ক্যাবিনেট ; ন্যূনতম মাপ ১৪ × ২৮ ইঞ্চি। ক্যাবিনেটের উপর দিকে একটি ড্রয়ার ও তলার দিকে পাল্লাযুক্ত গা ঢাকা র‍্যাক থাকলে হাতের কাছে রেডিয়ো, বই, ঘড়ি, অষুধ, লেখার সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখার সুবিধে হয়।

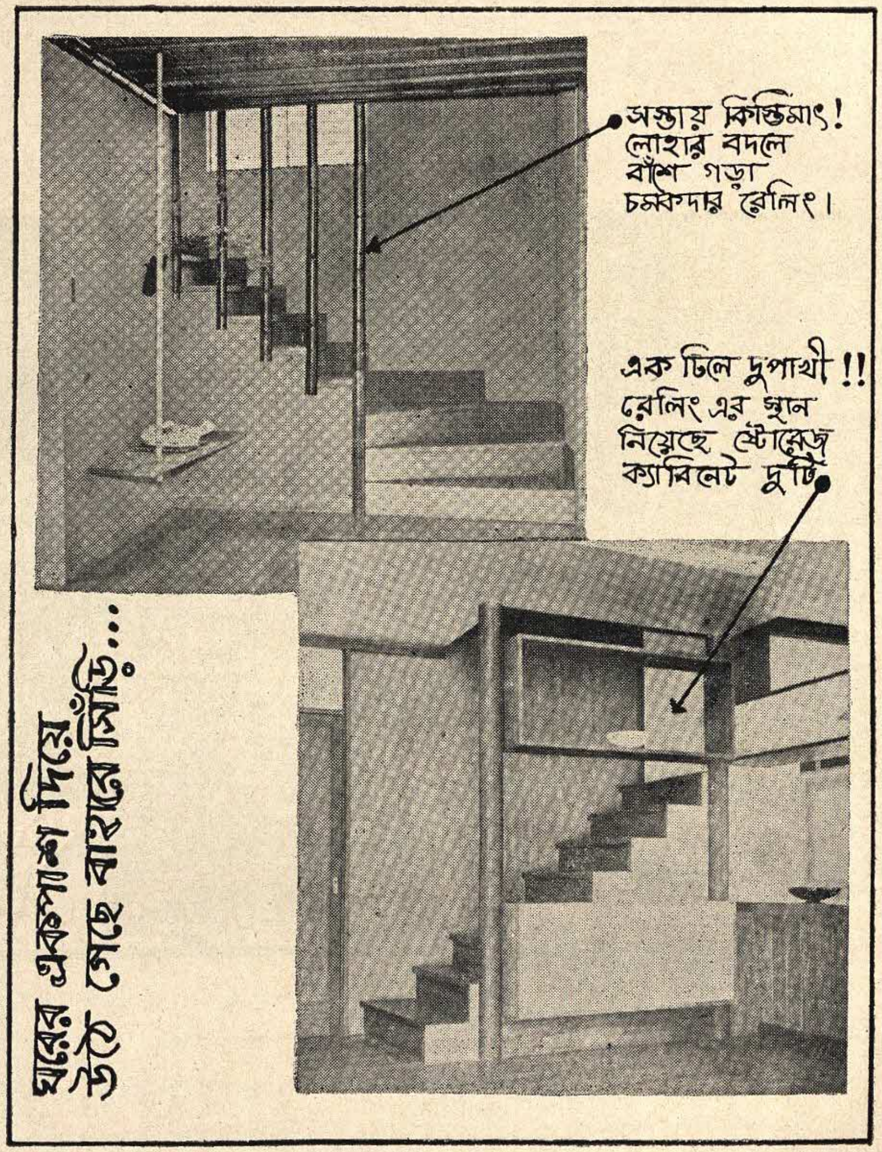
(গ) আলমারী বা ওয়াড্রোব, যার মধ্যে থাকবে শেল্ফ, ড্রয়ার ও কোট ইত্যাদি টাঙ্গিয়ে রাখার জন্য হ্যাঙ্গার স্পেশ। দম্পতির প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী আলমারীর সংখ্যা হতে পারে এক থেকে চার।

(ঘ) একটি বা ২টি আরাম কেদারা (দিনের বেলা বসে পড়া, সেলাই করা, ফুটবাথ নেওয়া ও রাত্রে ছাড়া জামাকাপড় ফেলে রাখার জন্য)।

(ঙ) আসন সমেত ড্রয়ারওয়ালা ড্রেসিং টেবিল।

(চ) আসন সমেত একটি কাজের টেবিল ও বুকর‍্যাক।

(ছ) একটি ছোটখাট হাতমুখ ধোয়ার বেসিন ও আলনা।


সস্তায় কিস্তিমাৎ!
লোহার বদলে
বাঁশে গড়া
চমৎকদার রেলিং।
এক ঢিলে দুপাখী !!
রেলিং এর স্থান
নিয়েছে ষ্টোরেজ
ক্যাবিনেট দুটি
ঘরের একপাশ দিয়ে
উঠে গেছে বাহারে সিঁড়ি...

৭নং ছবি

যদি দোতলা করতে হয়, গ্যারাজের জায়গাটায় ঢুকিয়ে দিন সিঁড়ি। গ্যারাজ? গাড়ী না হয় নাই বা চড়লেন। 'আরাম হারাম হায়।' আপনার ঘরটি যদি আর একটু বড় হয় অর্থাৎ ধরুন ১২ ফুট × ১২ ফুট, তা হলে আপনি অল্প বিস্তর পরিবর্তন করে গড়ে তুলতে পারেন ৮ নং ছবি মাফিক এক চমকদার শয়ন কক্ষ। আই. মুন ও সি. সোলাঙ্কি পরিকল্পিত এই শয়নঘরে এক নয়ন-লোভন গোল খাটের দু ধারে রয়েছে ড্রেসিং টেবিল ও কাজের টেবিল—যা আবার বেড সাইড টেবিলেরও দায়িত্ব নিয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখুন—দেখা যাচ্ছে উল্টো দিকের আলমারীর সারি। ১৪৪ বর্গফুটে আর কি চাই!

এ সব অবশ্য হল পুর্ণাঙ্গ শোবার ঘরের কায়দাকানুন। কিন্তু এই সব প্রমাণ মাপের ঘরের বাইরেও মেলাই ছোটখাট ঘর আছে—৮ × ১০ ফুট থেকে ১০ × ১২ ফুট মাপের, যা হামেশাই শোবার ঘর রূপে ব্যবহৃত হয়। এ সব ঘরে জায়গা বাঁচানোর জন্য নানা রকম ভাঁজ করা, উপর নিচে থাক সাজানো, একের মধ্যে দুই জাতীয় আসবাব (**২৩নং নকশা**) পাওয়া যায়। আপনাকে বুদ্ধি খরচ করে নিজের প্রয়োজন মাফিক এই সব আসবাবের মধ্য থেকে নির্বাচন করে নিজস্ব হোম-ইয়োপ্যাথিক প্রেস্‌ক্রিপশান তৈরি করে নিতে হবে। আপনার শয়ন ঘরের নির্বাচন ও পরিকল্পনায় যে ক'টি কথা মনে রাখা দরকার, তা হচ্ছে:

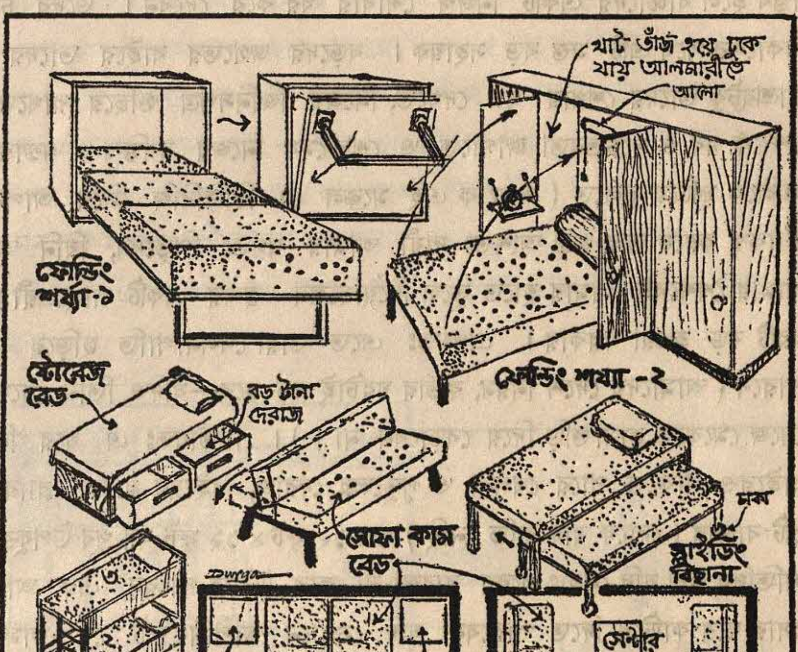
(ক) অন্যের বাড়ীতে দেখা বা এই বই পড়ে জানা মতলবকে সরাসরি নকল করবেন না। ভেবে-চিন্তে নিজের দরকার মত তাকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করে নিন।

(খ) শোবার ঘরের জানালা দিয়ে যদি বাইরের কোন ভাল দৃশ্য দেখা যায় তা হলে তো চমৎকার, তবে এটা একান্ত আবশ্যক নয়। যেটা নেহাৎই আবশ্যক তা হল ঘরটিতে যাতে ভালরকম আলো-বাতাস খেলে তা দেখা দরকার।

(গ) শোবার ঘরের পরিবেশ শান্ত ও নিরালা হওয়া একান্তই দরকার আপনার শ্রান্তি অপনোদনের পক্ষে। এ দিক দিয়ে শোবার ঘর রাস্তার পাশে বা রান্নাঘরের লাগোয়া না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শোবার ঘরে যথোপযুক্ত আব্রু থাকাও প্রয়োজন।

(ঘ) শোবার ঘরের প্রধান আসবাব—একটি সুখাসন খট্টাঙ্গ। **২৪নং নকশায়** দেখুন একটি শায়িত মানুষের মাথা, পিঠ ও পাছায় ঠেকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় শরীরের আরামদায়ক ভারসাম্য বজায় রাখতে। আপনার খাট বা খাটের গদি এই সব জায়গায় ঝুলে বা ফুলে গেলে শরীরে টাটানো যন্ত্রণা, এমন কি দীর্ঘদিন ব্যবহারে স্পণ্ডিলাইটিস জাতীয় শিরদাঁড়ার রোগও দেখা দিতে পারে। গদিহীন তক্তাপোষের উপর ৩।৪ইঞ্চি পুরু ফোম পেতে শোওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। সিঙ্গেল খাটের চওড়া ২ ফুট-৮ ইঞ্চি থেকে ৩ ফুট-২ ইঞ্চি এর মধ্যে হলেই ভাল। মাথার দিকটা গদি মোড়া থাকলে আধশোওয়া হয়ে বসার আরাম পাবেন (**২৪নং নকশা**)। মাথার পাশে ১৮ ইঞ্চি উঁচুতে একটি নরম পড়বার আলো থাকা খুব ভাল।

(ঙ) শোবার ঘরের আর একটি অঙ্গ হচ্ছে কাপড়চোপড় রাখা ও সাজসজ্জা করার উপকরণ। এর মধ্যে প্রথমেই আসবে আলমারী। জনা-প্রতি একটি করে প্রমাণ সাইজের আলমারী থাকলে ভাল হয়। ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গে সেন্ট স্নো পাউডার ব্রাস চিরুনী-কাঁটা-টসল



ফিতে রাখার যথেষ্ট জায়গা থাকা উচিত (মনে রাখবেন এ বাবদে 'যথেষ্ট' কথাটি শ্রীমতীদের অভিধানে পাওয়া যায় না)। এই সঙ্গে হাতমুখ ধোয়ার ছোটখাট বেসিন

(ন্যূনতম মাপ ১৬ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি) শোবার ঘরের এক কোণে ফিট করা থাকলে বাথরুমের উপর চাপ কমবে, আপনাদের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হবে, আর এই সঙ্গে একটা বড় আয়না ও শেল্‌ফ্‌ লাগিয়ে নিলে বেসিনটি বাড়তি ড্রেসিং টেবিলেরও কাজ দেবে।

(চ) সম্ভব হলে বাচ্চাদের একটি নিজস্ব শোবার ঘর করে দেবেন। ওদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে এটি মস্ত বড় সহায়ক। বড়দের জগতের বাইরে তাদের একান্ত নিজস্ব আশ্রয়টুকু তাদের শেখায় স্বপ্ন দেখতে, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে, অধিকারবোধ সম্পর্কে গর্ব ও সচেতনতা জাগাতে ও শেষ-মেষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও অন্যান্য মানবিক গুণ-গুলিকে ফুটিয়ে তুলতে (আজকে এই মক্কেল যে হিজিবিজি লিখে আপনাদের ট্-পাইস ট্যাঁকস্থ করছে তার জন্য অংশতঃ দায়ী আমার স্বর্গতঃ পিতৃদেব, যিনি অনেক কষ্ট করে আমার শৈশবেই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন—সুন্দর একটি লাইব্রেরী!)। বাচ্চাদের ঘরটি বড় হওয়া দরকার। প্রথমতঃ এতে তারা খেলনাপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলতে পারবে (আমাদের দেশে নিয়ম, কর্তার ঘরটাই বড় হবে—যদিও তিনি বেতো রুগী, ঘোড়া সেজে মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াবেন না!)। দ্বিতীয়তঃ এ ঘরে নির্দিষ্ট আসবাবের বাইরেও থাকতে পারে খেলনা ও পুতুলের দেরাজ, বইয়ের র‍্যাক, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি। দুটি বাচ্চার (দোকে বাদ কভি নেহি) জন্য ১২ ফুট × ১২ ফুট ঘর খুব উপযুক্ত।

(ছ) অতিথির জন্য যদি নেহাৎ ঘরের ব্যবস্থা না করে উঠতে পারেন, এক আধটা রাত তাঁরা বসার ঘরে কাটিয়ে দিতে পারবেন যদি সেখানে আপনি দুটি বেড-কাম-সোফার ব্যবস্থা করেন (**২৩নং নকশা**)। সেন্টার টেবিলটি এমন ভাবে তৈরি হবে যাতে প্রয়োজনে এটি দু টুকরো হয়ে দুটি বেড সাইড টেবিলে রূপান্তরিত হতে পারে। আব্রু সৃষ্টির জন্য দরকার এক জোড়া ভারী পর্দা যা রাত্রে টেনে দেওয়া যাবে। এই সঙ্গে বেড সাইড টেবিলে একজোড়া টেবিল ল্যাম্প বসিয়ে দেবেন, দেখবেন বসবার ঘরের পরিবেশ যাদুমন্ত্রে পাল্টে গিয়ে হয়ে গেছে শোবার ঘরের পরিবেশ।

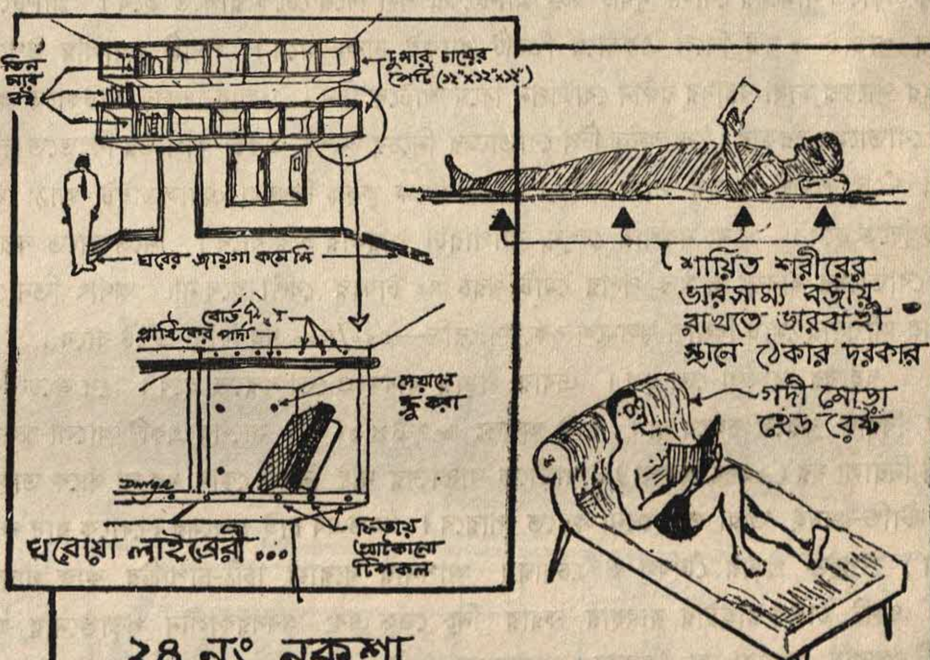
● ঘরোয়া লাইব্রেরী বা পড়ার ঘর

'লেখাপড়া করে যে,
অনাহারে মরে সে।'

হীরক রাজ্যের সভাকবির এই সাবধান বাণী স্মরণে রেখেই বলছি ঘরোয়া লাইব্রেরীটাকে যত পারা যায় সস্তায় সাজানো উচিত। বিশেষতঃ যখন 'বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভাল কাজ না।'

আপনার যখন বই কেনার নেশা রয়েছে (তা না হলে আর এ হেন অখাদ্য বই পড়েন!), সুযোগ পেলেই দোকান থেকে ব্যাগ ভর্তি বই আপনি কিনবেনই। অতএব

শীঘ্রই বাড়ীতে আপনার জায়গার আকুলান হবেই। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীর বাড়ীতে ক'টা ঘর, ক'টা দেয়ালইবা বই সাজাতে ছেড়ে দেয়া চলে ? ঘরোয়া লাইব্রেরীতে জায়গার অভাবটাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। এর সমাধান করতে ঘরে নজর দিয়ে দেখুন দরজা, জানলা, আলমারী ও ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মাথার উপর ও ছাদ অবধি ৩/৪ ফুট দেয়াল প্রায় খালিই পড়ে রয়েছে—এক আধটা বাঁধানো ছবি বা গোটা কতক ব্রাকেট আলোর কজা করা সামান্য কিছু অংশ ছাড়া। এই অংশটুকুতে যদি দেয়ালে আটকানো কাঠের র‍্যাক করে নেন, তাহলে কত বই সেখানে আঁটবে জানেন ? ১০ ফুট × ১৪ ফুট মাপের ১০ ফুট উঁচু ঘরে ১২০০ থেকে ১৪০০ বই এঁটে যাবে যার আনুমানিক দাম হবে হাজার কুড়ি টাকা। মাসে যদি গড়ে একশো টাকার বই কেনেন এই সংগ্রহ সৃষ্টি করতে আপনার ১৬/১৭ বছর লেগে যাবে। তিন কামরার বাড়ীতে এক বর্গ ইঞ্চি মেঝে দখল না করেও আঁটিয়ে দেয়া যাবে আপনার সারা জীবনের সঞ্চিত পুস্তকসম্ভার।

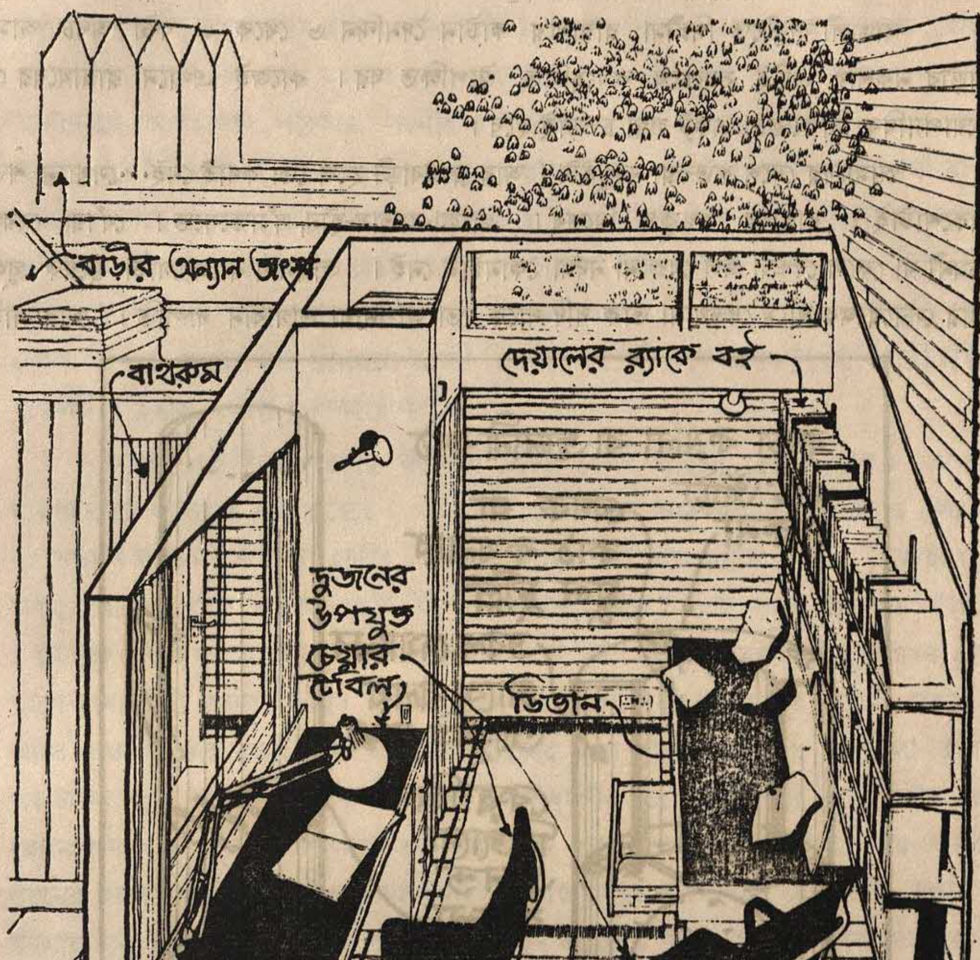


২৪ নং নকশা

জায়গার সমাধান হলেও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে খরচের। ঘরের চার দেয়ালে ছাদ অবধি র‍্যাক বানাবার খরচ তো এক বিশাল ব্যাপার ! তার উপর কাঁচের পাল্লা লাগাতে হলে তো আরো চিত্তির !! না অত ভেঙ্গে পড়বেন না। পাড়ার চায়ের দোকানদারের সাথে ভাব জমান।

ওঁদের চা আসে প্লাইউডের পেটিতে। মাপ দুরকম—১২ইঞ্চি × ১২ইঞ্চি × ১২ইঞ্চি এবং ১৮ইঞ্চি × ১৮ইঞ্চি × ১৮ইঞ্চি। চা বিক্রি হয়ে গেলে ওঁরা একদিন খোলা বাক্সগুলি খুব সস্তায় বেচে দেন 'বিক্রিওয়ালার' কাছে। আপনি ওঁদের কাছ থেকে ছোট মাপের বাক্স ডজন দুয়েক কিনে নিন। সওয়া শো টাকার মত খরচ পড়বে। কিছু তেল রং কিনে বাক্সের ভেতর-বাইরে নিজেই রং করে নিন। বৈচিত্র্য আনতে ভেতর পিঠে এক রং, বাহির পিঠে আরেক রং লাগান। খুব মড, রং-চংয়ে করতে হলে এক একটি বাক্সে এক এক রং লাগাতে পারেন। তবে তিনটির বেশী রং দেবেন না। তাতে আপনার সাহিত্য সংগ্রহের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট হতে পারে। নিজে হাতে রং করলে আপনার খরচ হবে গোটা সত্তর টাকা। এবার একটি ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকুন ও ২৪নং নকশাতে যে ভাবে দেখানো আছে সে ভাবে উপর ও নিচের বাক্সগুলির মাঝে একফুট ফাঁক রেখে ঘরের যে কোন একটি দেয়ালে আটকিয়ে নিন ৩ ইঞ্চি স্ক্রু ও ডেটোফিক্সের সাহায্যে। খোলা মুখটি সামনের দিকে থাকবে। বাক্স ফিট করার খরচ মজুরি সমেত ৩০/৩২ টাকা। ধুলো-বালি এড়াতে সামনের খোলা মুখটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। প্লাস্টিকের পর্দার খাড়াই ৩ ফুট নিলে একসাথে তিনটি র‍্যাকই ঢাকা যাবে। পর্দাটি লম্বালম্বি উপরের সারির বাক্সের মাথা বরাবর রঙ্গীন বোর্ডপিন দিয়ে আটকে দিন। তলার দিকটা আটকাতে হলে টিপ বোতামের দরকার। সে ক্ষেত্রে টিপ বোতামের নিচের অংশটি একটা কাপড়ের ফিতেতে সারে সারে এঁটে ফিতেটি তলার সারি বাক্সের নিচের দিকে কুইক ফিক্স বা এরালডাইট আঠা দিয়ে সেঁটে দিতে হবে। ২৪নং নকশায় দেখুন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নিজে হাতে করলে টিপ বোতামের ব্যবস্থা সমেত পর্দার মোট খরচ ৭০ টাকার বেশী হবে না। অর্থাৎ তিন শো টাকায় আপনার মোট বিশাল ঝলমলে বুককেস রেডি—৩০০/৪০০ বই দিব্যি এঁটে যাবে।

বইয়ের ব্যবস্থা তো হল। এবার পড়ার ব্যবস্থাও তো করতে হবে। সে জন্যে কিন্তু শূন্যে বিরাজ করলে চলবে না। চাই অন্ততঃ ৮ ফুট × ১০ ফুট মাপের একটি আলো-ঝলমল ছোট্ট নিরালা ঘর (**২৫নং নকশা**)। বাড়ীতে বাচ্চাদের যদি নিজস্ব কোন ঘর না থাকে তাহলে এই স্টাডি-রুমেই তারা পড়াশুনো করতে পারবে। অতএব চাই দুজনের (দোকে বাদ কভি নেহী) উপযুক্ত পড়ার টেবিল ও চেয়ার। আপনার ঘরোয়া চিঠি-চাপাটির কাজ সারতে চাই একটি টাইপ রাইটার ব্যবহার করার নিচু ডেস্ক এবং অবসরকালীন পড়াশুনোর জন্য একটি আরাম কেদারা বা ডিভান। দেয়ালে আটকানো র‍্যাকে ৩০০/৪০০ বই রাখার বন্দোবস্ত তো থাকবেই। আরাম কেদারার বদলে ডিভান রাখলে প্রয়োজনে এটিতে অতিথির রাত্রিবাসও চলতে পারে। পড়ার এই ঘরটি একটেরে নিরালা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। বাড়ীর অন্যান্য অংশ ও স্টাডির মাঝখানে একটি বাথরুম বা স্টোর কিম্বা বক্সরুম রেখে ছোট ফ্ল্যাটেও এই নির্জনতা সৃষ্টি করা যায় যা সনিষ্ঠ পাঠক্রিয়ায় একান্ত কাম্য।



২৫ নং নকশা - আলো ঝলমল নিরালা ঘর।

● রান্নাঘর

বাঙালী বাড়ীতে গিন্নীমা রান্নাঘরে কাটান দৈনন্দিন ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা অথচ আমাদের বাড়ীর নকশায় এটিই সবচেয়ে অবহেলিত, উপেক্ষিত ঘর। কাজেই এখানে রান্নাঘরের হোম-ইয়োপ্যাথিক চিকিচ্ছেটা একটু লম্বা চওড়াই হবে।

আমাদের দেশে শতকরা নব্বুইটা (আর ফ্লাটবাড়ী হলে তো কথাই নেই···সেখানে শতকরা একশোটাই) রান্নাঘর অন্ধকূপ বিশেষ। আলো-বাতাস-হীন, স্যাঁতসেতে। ধোঁয়া বেরুনোর চিমনী বা ফেলে দেওয়া জল বেরুনো নর্দমা কোনটাই নেই। জানলার নামে গোটা তুয়েক ঘুলঘুলি আর স্টোরেজের নামে দেড়খানা তাক যদি থাকে তো আপনারা ভাগ্যবান দম্পতি। আর সাইজ ?



২৬ নং নকশা · উন্নত উনুন

একজন একটু মোটাসোটা গৃহিণী-গোছের মানুষ পিঁড়ি পেতে বসলে উনুনটাকে চৌকাঠের বাইরে রাখতে হয়—এমন রান্নাঘরও আমি দেখেছি। যারা নকশা করেন, বাড়ী গড়ান, তাঁরা যেন ভুলেই যান যে তাঁদেরই মা-বোন-মেয়েরা এই ঘরে আগুনের প্রচণ্ড আঁচে রোজ ৪।৫ ঘণ্টা লড়াই চালাবেন তাঁদেরই খ্যাটনের বন্দোবস্ত করতে। রান্নাঘরটা হচ্ছে একটা রসায়নাগার, এমন একটি ল্যাবরেটরী যা দেশের অন্য সমস্ত রকম ল্যাবরেটরীর মতই গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি ও জলের

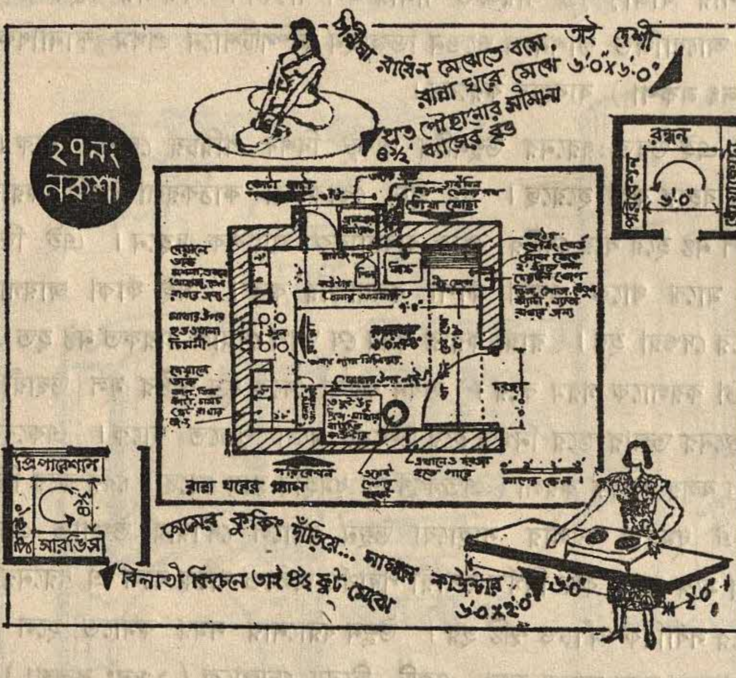
অফুরন্ত সরবরাহ প্রয়োজন রান্নাঘরে। আর প্রয়োজন অন্য ল্যাবরেটরীর মতই পর্যাপ্ত স্টোরেজ স্পেশ বা বাড়তি সাজসরঞ্জাম রাখার আলমারী ও খোলা তাক। শেষ-মেষ দরকার ধোঁয়া, কালি, গ্যাস, গন্ধ, নোংরা জল-কাদা ও তাপ যাতে প্রয়োজন মত চট করে ও নিঃশেষে বের করে দিয়ে রান্নাঘরের আবহাওয়া পরিষ্কার, সহনীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা যায় তার ব্যবস্থা। বড় জানলা, ঢালু নর্দমা ও ছোট একজস্ট (Exhaust) ফ্যান ব্যবহার করুন। ছোট একজস্ট ফ্যান দরজা বা জানলার পাল্লায় বসিয়ে নেওয়া যায়, তাপ ও ধোয়া হু হু করে কমিয়ে দেবে ; দাম দেড়শ এর মধ্যে। এক ধরনের কলের মুখে আটকাবার ছোট প্রেসার ফিল্টার পাওয়া যায় (দাম ৩৫/৪০ টাকা)—কলের মুখ থেকে সরাসরি বীজাণু-শূন্য পরিস্রুত পানীয় জল পাবেন। কয়লার উনুন ব্যবহার করতে হলে, কোল ইণ্ডিয়া আয়োজিত ন্যাশনাল ওভেন ডিজাইন কম্পিটিশানে প্রথম স্থানাধিকারী ডিজাইনের মডেলটি (**২৬নং নকশা**) ব্যবহার করবেন।

আসুন, এই উন্নত ধরনের উনুনটির একটু বিশদ পরিচয় দেওয়া যাক। এতে কয়লার যারপরনাস্তি সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। ধূম হীন কোক বা কাঠকয়লা তৈরি করার জন্য কয়লার ২৫ শতাংশ তাপ নষ্ট হয়ে যায় সেটির প্রাক-ব্যবহারিক আংশিক দহনে। এই ডিজাইনে উনুনের ডবল দেয়ালের মাঝে থাকে একটা ফাঁপা বলয়াকার কক্ষ। এই ফাঁকা জায়গায় কাঁচা কয়লা (ধূম যুক্ত) ভরে দেওয়া হয়। রান্না করার সময় যে তাপ দেয়াল মারফত নষ্ট হত এখন সেই তাপ পাশে রাখা কাঁচা কয়লাকে গরম করে। তখন কয়লা থেকে ধূম্র সৃষ্টির মূল উদ্বায়ী পদার্থ বেরিয়ে আসে ও তা উনুনের তলার স্তরে নির্গত হয়ে উনুনের মধ্যে পুড়তে থাকে। একবেলা রান্না হবার পর ঢাকনা খুলে বলয় কক্ষের কয়লা (এতক্ষণে তা ধূমহীন হয়ে গেছে) বের করে দ্বিতীয় বার উনুন ধরানোর সময় ঐ ধূমহীন কয়লার সাহায্যে উনুন ধরালে ধোঁয়ার উৎপাত প্রায় থাকবেই না। উনুনের কয়লার সঙ্গে বলয় কক্ষ-নির্গত উদ্বায়ী পদার্থও জ্বলতে থাকে বলে এ ধরনের উনুনে ন্যূনতম কয়লার ব্যবহারে সর্বাধিক আঁচও সৃষ্টি হয়। উনুন ধরানোর সময় কমাতে হলে দরকার উনুনের মুখের সমান ব্যাসযুক্ত হাত দুয়েক লম্বা একটি টিনের চোঙ্গাকে (**২৬নং নকশা**) চিমনি হিসাবে ব্যবহার করা। এর ফলে ধরানোর সময় ও পরিশ্রম অর্ধেক হয়ে যাবে। চিমনির ভিতরের শিকের উপর কেরাসিনে ভেজানো জ্বলন্ত কাঠ বা কয়লা রেখে দিলে, উনুন ধরানোর ব্যাপারটাও ধোঁয়া হীন হবে।

এ ছাড়া রান্না ঘরে চাই একটা ৩৬ ইঞ্চি (৯০০ মি. মি.) সিলিং ফ্যান ও রিফ্লেক্টার সমেত ৬০ বা ১০০ ওয়াটের আর্জেন্টা বাল্ব (ছায়াহীন আলো যাতে চোখ না ধাঁধিয়ে সোজাসুজি কাউন্টারের উপরপড়ে)। এতে শ্রীমতীর আয়ু বাড়বে। চোখ বাঁচবে, চশমার দোকানের বিল কমবে। এগুলি খুচরো কাজ। কিন্তু রান্নাঘরকে ঢেলে সাজাতে—কোথায় থাকবে উনুন, কোথায় আলমারী, কোথায় বাসন ধোবার সিঙ্ক—এগুলি পরিকল্পনা করে, একটা নকশা বানিয়ে নিতে হবে। তারপর সেই

নকশা-মাফিক এগোতে হবে। কিচেন প্ল্যানিং-এর উপর মেলাই ইংরেজি কেতাব পাওয়া যায়, সবগুলোই বিলেতি প্রকাশন। আমাদের দেশী রান্নাঘরের সাথে ওই বিলেতী কিচেনের আকারে, প্রকারে ও ব্যবহারে বেশ কিছু ফারাক আছে। যথা ঃ

(ক) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাহেব-মেমেরা দাঁড়িয়েই কুকিং সারেন। হাঁটু মুড়ে বসা ওঁদের কাছে প্রায় অর্ধ-বদ্ধ পদ্মাসনে পা আটকে শীর্ষাসন করার মতই শক্ত ব্যাপার। আমাদের দেশে একমাত্র হালুইকররা (যারা উঁচু উঁচু উনুনে তাবড় উঁচু হাণ্ডা চাপিয়ে শ'ছুশো লোকের রান্না সারেন এক সাথে) ছাড়া সবাই প্রায় মেঝেতে, পিঁড়েতে বা টুলে বসে রাঁধতে ভালবাসেন



তোলা উনুনে। দাঁড়িয়ে রান্না করতে হলে যতটা জায়গায় কাজ সারা যায়, বসে রাঁধতে তার চেয়ে বেশী জায়গা লাগে (**২৭নং নকশা**)।

(খ) বাটনা বাটার ব্যাপারে ওই একই কথা। মেমের রান্না যেন রুগীর পথ্যি। মসলা ব্যবহারেঃবোধ হয় পাদ্রি সাহেবের নিষেধ আছে! যেটুকু বা করেন, প্যাকেটের গুঁড়ো মসলা দিয়েই কাজ সারেন। কফি কি গোলমরিচ (লঙ্কা কারে কয় মিসেস জন সেডা Zানতি পারেন না) যদি নেহাৎই গুঁড়োতে হয় তা হলে কাউন্টারে রাখা আছে ইলেকট্রিক মিক্সি। শিল-নোড়া খল-নুড়ি, হামানদিস্তা, যাঁতা, উদুখল বা ঢেঁকি সজ্জিত স্বদেশী বাটনা উইং আমাদের রান্নাঘরের একটি স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট যার হদিশ বিলেতী বইয়ে পাবেন না।

(গ) খাওয়ার বাসন সাহেবদের একচেটিয়া চীনে মাটির যা অল্প জায়গায় সহজেই ধোয়া যায়। আমাদের হচ্ছে কাঁসা, অ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টিল, রূপো প্রভৃতি ধাতুপাত্র, যা পরিষ্কার করতে হলে উবু হয়ে বসে মাজতে হয় ক্ষার দিয়ে। অবশ্য বাসন মাজার ব্যাপারটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রান্না ঘরের বাইরে সারা হয়—এঁটো কাটা সকড়ির সূক্ষ্ম বিচারে। কাজেই বিলেতী কিচেনের বৃহৎ অঙ্গ ইউটেনসিল ওয়াশ দেশী রান্নাঘর থেকে প্রায় পুরোপুরি বিতাড়িত—কলতলায়।

(ঘ) আমাদের আচার, পাঁপড়, কাসুন্দী, ধনে, জিরে, হলুদ, লঙ্কা, সরষের তেল, বনস্পতি, ঘি···মায় রাঁধুনী ওরফে রামধনী—হাজার রকম আনুষঙ্গিকে রান্নাঘর ভরা। তার ফলে রান্নাঘরের লাগোয়া স্টোরেজ স্পেশের চেহারাটা বিলেতী ভঙ্গির থেকে স্বতন্ত্র, বিপুল কলেবর। বিলেতী বই-এ এসবের হদিস পাবেন না।

(ঙ) মেমসাহেবরা একালষেঁড়ে। বিলেতী কিচেন চালান একলা। এদেশের রান্না একটা ছোটখাট উৎসব। মা-মাসীরা রীতিমত দল বেঁধে জাঁকজমকে উদযাপন করেন এ উৎসব। জায়গাও লাগে আনুপাতিক ভাবে বেশী।

(চ) এ ছাড়া আমাদের রান্নাঘরে হয় কয়লা, ঘুঁটের ব্যবহার, আঁশ-নিরামিষের বিচার, ধোয়াধুয়ি, তুলসীপাতা-গঙ্গাজল ছিটানোর পর্ব, বিলেতী কিচেনে যে-গুলি অজ্ঞাত।

আমাদের শিলনোড়া, আঁশবঁটি, পাঁচফোড়ন, ঘুঁটের বস্তা, রুটির তাওয়া, আমচূর, পেতলের হাঁড়ি, খুন্তি, ডাল ঘুঁটনি, যাঁতাকল, মোরব্বার শিশি, উনুনে গোবর নিকানোর ন্যাতা—এ সব কিছুর কথা মনে রেখেই নকশা বানাতে হবে আমাদের রান্নাঘর গড়তে। অবশ্য সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আমরাও আস্তে আস্তে 'বিলেতী কায়দায় কাশতে' অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। আমাদের রান্নাঘরেও ক্রমে ঢুকছে মিক্সি, ফুড ওয়ার্মার, ব্রেকফাস্ট ট্রলী, ইলেকট্রিক কেটল, ফ্রিজ ও বেশ কিছু কাঁটা-চামচ-ছুরি। এদের একেবারে বাদ দিলেও চলবে না।

রান্নাঘরের তিনটি প্রধান ভাগ (**২৭নং নকশা**):

(১) কাটা, ছোলা, ধোয়া, মোছার জায়গা (প্রিপারেশান)।

(২) রান্না করার জায়গা (কুকিং)।

(৩) থালা সাজানো ও পরিবেশনের জায়গা (সারভিস)।

এর প্রত্যেকটির সাথে থাকবে যথেষ্ট জিনিস রাখার জায়গা (স্টোরেজ স্পেস)। দেখা গেছে ইংরাজির 'U' আকৃতির কাউন্টারের তিনটি বাহুতে এই তিন দফা জায়গার ব্যবস্থা করে কাউন্টারের উপরে (হাতের নাগালের মধ্যে) ও কাউন্টারের নিচে স্টোরেজের তাক করে নিলে সব চেয়ে সুবিধাজনক রান্নাঘর সৃষ্টি করা যায়। U-এর খাড়া দুই বাহুর মধ্যের ফাঁকটুকু বিলেতী মতে চার ফুট রাখা উচিত। কিন্তু এ-দেশীয় রান্নাঘরে এই খালি মেঝেটুকুতে কুটনো কোটার বা বাটনা বাটার বেশ কিছু কাজ করতে

হয় বলে ফাঁকটা বাড়িয়ে সাড়ে পাঁচ বা ছয় ফুট করা দরকার। কাউন্টারের চওড়া বিলেতী মতে দু ফুট হওয়া উচিত। দেশী মতে মাঝখানের মাপটি বাড়িয়ে ছয় ফুট করতে গিয়ে ঘরের আয়তনে যদি অকুলান হয়, কাউন্টারের চওড়া কমিয়ে দিয়ে ১ ফুট ৮ ইঞ্চি করে দেওয়া যেতে পারে। তবে মাঝখানের মেঝে সাড়ে পাঁচ ফুটের কম চওড়া না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ এতে দরকার মাফিক মা-মাসীরা ২/৩ জন মিলে রান্নাঘর ব্যবহার করতে পারবেন—ধাক্কাধাক্কি, ঠাসাঠাসি হবে না। আমাদের এদেশী রান্নাঘরের সাথে লাগোয়া এক চিলতে বারান্দা বা ব্যালকনী (মাপে ৫ ফুট × ৩ ফুট হলেই যথেষ্ট) থাকলে খুব সুবিধা হয়। বড়ি আচার, পাঁপড় শুকতে ; কয়লা, ঘুঁটে, কাঠ প্রভৃতি নোংরা জ্বালানী স্টোর করতে ; বাসন মাজা ও ঘর ধোয়ার ন্যাকড়া, ঝাঁটা, ছাই, তেঁতুল ছড়া, ন্যাতা, গোবর জলের বালতি ইত্যাদি রাখতে এই বারান্দা খুব কাজে দেয়। সস্তা কেরোসিন কাঠের তক্তা দিয়ে বারান্দার একপাশে খোপ কাটা একটা সিন্দুক বা বড় সাইজের বাক্সের মত করে নিয়ে এই সব নোংরা জিনিস তার মধ্যে সাজিয়ে রাখলে রান্নাঘর তো ছিমছাম থাকবেই, বারান্দাও জবড়-জং দেখাবে না। বাক্সের ডালার উপর বড়ি, আচার শুকোতে দেবেন বা দু দণ্ড বসে হাওয়া খাবেন আর জিরিয়ে নেবেন।

রান্নাঘরের পরিকল্পনা করার কতকগুলো নিয়ম আছে। এই পাঁচ দফা নিয়ম মেনে সব চেয়ে কম জায়গায় কি রকম ভাবে একটা আদর্শ রান্নাঘর গড়ে তোলা যায় তার প্ল্যান ২৭নং নকশায় দেওয়া হল। এ বইয়েতে যতগুলি রান্নাঘরের প্ল্যান দেওয়া হয়েছে (১নং, ৯নং, ১০নং, ১৩নং, ১৯নং ও ২২নং নকশায়) এই আদর্শ রান্নাঘর সেখানে দিব্যি এঁটে যাবে আপনার প্রয়োজন ও জায়গা মাফিক একটু-আধটু অদল বদল করে নিলে। মনের মত এই রান্নাঘর গড়ার পাঁচ দফা নিয়মগুলি হল ঃ

(১) রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে অপ্রয়োজনীয় যাতায়াতে (যেমন ধরুন ঘর থেকে বাথরুম, উঠোন, কলতলা বা বাগানে যাবার পথ) অনুমতি দেবেন না।

(২) ধোয়া-কাটা, রান্না বা পরিবেশন—ঘরের এই তিন বিভাগেই নিজস্ব স্টোরেজ স্পেস রাখবেন আলাদা আলাদা। কোন্ বিভাগে কি থাকতে পারে তার একটা মোটামুটি হিসেব—

(ক) ধোয়া-কাটা—বঁটি, শীলনোড়া, জলের ড্রাম (কল না থাকলে,) কাঁচা আনাজ ও আমিষ (ফ্রিজ থাকলে সব চেয়ে ভাল) রাখার জায়গা, মিক্সি ও গ্রেটার রাখার কাউন্টার।

(খ) রন্ধন—কেরোসিনের বোতল, দেশলাই, গ্যাসের সিলিণ্ডার, রান্নার তেল, ঘি, বনস্পতি, পাঁচফোড়ন, বাটা বা গুড়ো মসলা, ইলেকট্রিক কেটল, রান্নার বাসন (কড়া, ডেকচি, হাতা, খুন্তি, ফ্রাই প্যান ইত্যাদি) রাখার জায়গা।

(গ) পরিবেশন—পরিবেশনের বাসন (থালা, বাটি, গ্লাস, প্লেট, চামচ, ছুরি, কাঁটা, কাপ, ডিশ ইত্যাদি), ফুড ওয়ার্মার, পানীয় জলের জায়গা (কুঁজো থেকে কুলার যা হোক একটা) সস ও কোলা জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয় রাখার নির্দিষ্ট স্থান।

(৩) রান্নাঘরে ১টি বা ২টির বেশী দরজা রাখবেন না। ওতে কাজের অসুবিধা হয়। আগে থেকে থাকলে বাড়তি দরজা পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করে দিন।

(৪) অন্ততঃ একটি জানলা (খাড়াই ৪ফুট × চওড়ায় ৩ফুট) রাখতেই হবে। দক্ষিণ বা অভাবে পূব মুখো হওয়া চাই। আর দুটি জানলা (বিশেষতঃ মুখোমুখি, যথা—২২নং নকশা) থাকলে তো সোনায় সোহাগা। জানলার বাইরের দিকে দেয়ালের গায়ে বাড়তি ফ্রেম বসিয়ে এবং ভিতর দিকে পাল্লার কাঠ বা কাঁচের প্যানেল খুলে নিয়ে তারের জাল বসিয়ে নিলে সস্তায় খুব ভাল মিটসেফ করে নেওয়া যায় (২৭ নং নকশার মূল প্ল্যানে লক্ষ্য করুন, আধখানা জানলা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই জাতীয় মিটসেফ)। তবে এতে ঘরের আলো একটু কমবে।

(৫) আসবাবের তলা বা আলমারীর পাশে এমন ফাঁক রাখবেন না যাতে হাত ঢোকানো বা সহজে পরিষ্কার করা না যায়। রাখলে ইঁদুর, ছুঁচো, আরসোলা ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হবেই।

একটি ষষ্ঠ ও অনুক্ত দফা আছে। কানে কানে বলে শেষ করি মনোমত রান্নাঘরের আলোচনা। এ হেন রান্নাঘরের উদ্বোধনের দিন এই হতভাগা লেখককে ভুলবেন না—এইটাই হল আমার সিক্স্‌থ কলম বা আপনার সিক্সথ্‌ সেন্স।

ব্যাস, লেগে পড়ুন রান্না করতে—কালিয়া পোলাও! চিনি কম দেবেন : আমার ডায়বেটিস আছে।

● স্টোরেজ স্পেশ

হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে একবার এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারের দোতালা বাড়ীর মূল্যায়ন করতে, পাঠিয়েছিলেন ভারত সরকারের বোর্ড অব্‌ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস। দোতলায় গৃহস্থ থাকেন তার দুই পুত্র, বিধবা ভগ্নী, বৃদ্ধা মা, বেশ কয়েকটি পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং দাসদাসী নিয়ে। একতলায় রান্নাঘর, বাথরুম, পায়খানা এবং কম পক্ষে ৭/৮টি ভাঁড়ার ঘর যার কোনটিতে মজুত সম্বৎসরের ধান বা চাল, কোনটিতে মটর, ছোলা বা গম, কোনটিতে আলু, পেঁয়াজ, নারকোল। ৭/৮টি স্টোর-ওয়ালা বাড়ী দুরস্থান, আজ সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আস্তানায় একটা স্টোর বানানোর বাজেটও জুটছে না। ৬′ × ৮′ একটা স্টোরের খরচ সাড়ে সাত হাজারের কাছাকাছি। তাই এক্ষেত্রে ভিন্নতর ফন্দি আঁটতে হচ্ছে।

৫০ বর্গ ফুটের একটা ঘুপচি ঘর না বানিয়ে, আসুন আমরা গুদামজাত জিনিসপত্রকে ছড়িয়ে দি সারা বাড়ীময়—ঘর থেকে ঘরে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রুচিশীল গোছানো মানে সারা বাড়ীতে উপযুক্ত স্থান অনুযায়ী সব কিছু এমন ভাবে সাজিয়ে রাখা যেন তা দৃষ্টিকটু না হয়। প্রয়োজন মত হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় অথচ ঘরের দরকারী স্থান জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে। আজকাল, বিশেষ

করে ফ্ল্যাট বাড়ীতে জায়গা খুবই অল্প। কাজেই দরকারী জিনিসপত্র রাখার ব্যাপারে এমন সব পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে ঘাড়ে ঘাড়ে না চাপিয়েও অল্প জায়গায় বেশ কিছু জিনিসপত্র রাখা যেতে পারে অথচ তা দেখতেও অশোভন হবে না, চলন পথ বা কাজের জায়গা জুড়েও থাকবে না। যেমন ধরুন পালঙ্কের নিচে যদি একটা বড় ড্রয়ার থাকে, তাতে লেপ, কম্বল, বাড়তি বালিশ, বিছানা গুছিয়ে রাখা যায়। দরকার মত তা হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। দেখতেও অশোভন নয় (এক একটা বাড়ীতে লক্ষ্য করবেন, ছাদ থেকে বিছানা ঝুলিয়ে রাখা হয়—বিছানার বাণ্ডিল, মাকড়সার জাল, মরা টিকটিকি, পাখীর বাসায় পচা ডিম—সব মিলিয়ে বীভৎস অবস্থা) ; ঘরের প্রয়োজনীয় জায়গা জুড়ে থাকবে না। (এক একটা বাড়ীতে লক্ষ্য করবেন বিছানার ডাঁই চেয়ার, পড়ার টেবিল, জামা-কাপড়ের ট্রাঙ্ক মায় পূজোর জলচৌকি সব কিছুর উপর স্তূপীকৃত)।

এ সব নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে একটা বাড়ীতে এতটা স্টোরেজের জায়গা থাকা উচিত যাতে ওই পরিবারের সকলের (ভাবী সন্তানসন্ততি সমেত) আগামী ৩০ বছরের প্রয়োজন মেটে। স্টোরেজ স্পেসের প্রয়োজন বছরে প্রায় এক শতাংশ বেড়ে যায়। অর্থাৎ শুরুতে যতটা জায়গা লাগে শেষ পর্যন্ত তা আরো ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। এই বাড়তি প্রয়োজনের জায়গাটুকু গোড়াতেই ঠিক করে রাখা ভাল। মূলতঃ দু রকমের জিনিস বাড়ীতে থাকে ঃ

(১) নিত্যপ্রয়োজনীয়, এবং

(২) যা ন-মাসে ছ-মাসে এক-আধবার দরকার।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস রাখা উচিত মেঝে থেকে ২½ ফুট ও ৪½ ফুট উচ্চতার মধ্যে (**২৯নং নকশা**), যাতে সামনে দাঁড়িয়ে, সহজেই তা হরদম বার করা বা রাখা যায়। কশ্চিৎ কখনো যা প্রয়োজন, তা ভারী হলে মেঝে থেকে আড়াই ফুটের মধ্যে ও হালকা হলে ৪½ ফুটের উপর সিলিং পর্যন্ত সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস একটার সামনে আর একটা রাখলে কাজের অসুবিধা হবে ; ভাঙ্গচুরও হতে পারে পড়ে গিয়ে ।

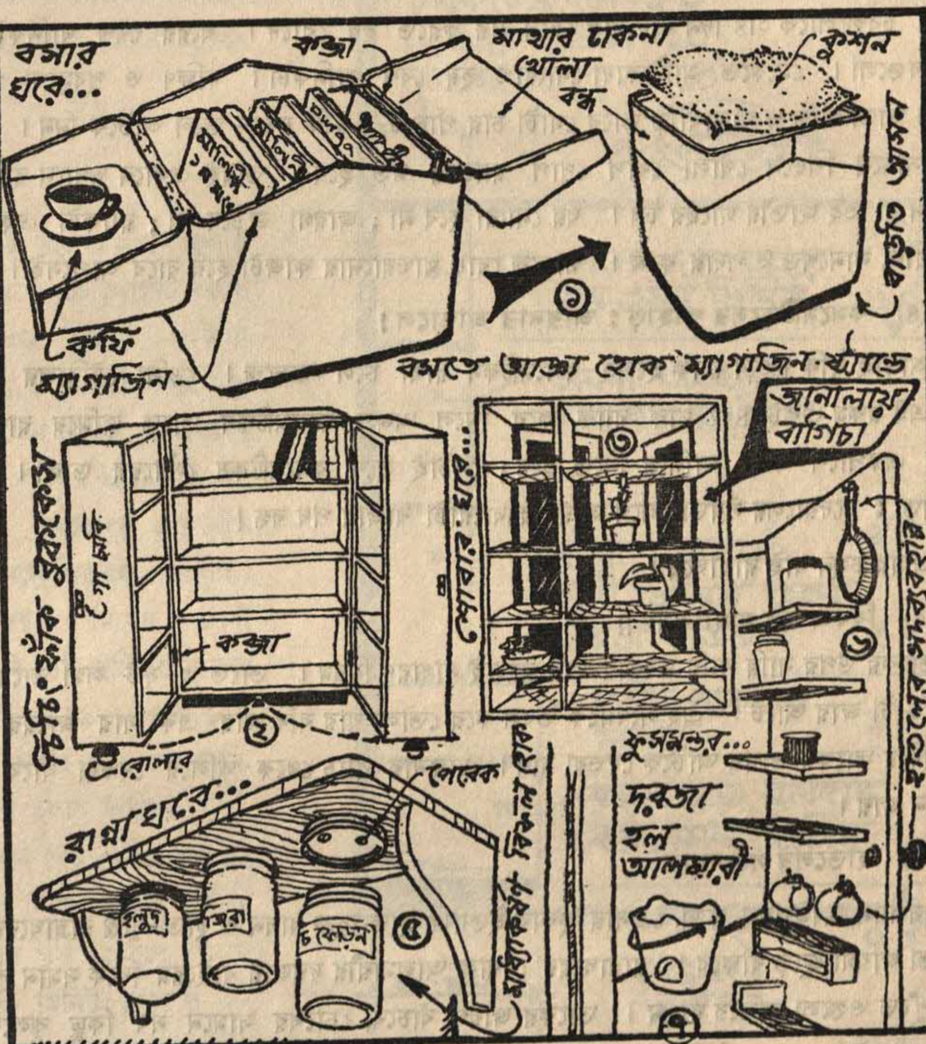
উপরের এই সব থিয়োরী অনুযায়ী গবেষকরা যে সব নানানতর মতলব ভেঁজেছেন, তারই গোটা কতক এখানে তুলে ধরা হল পাঠকদের জন্য। বসবার ঘর দিয়েই শুরু করি (বসার ঘরেও ভাঁড়ার !) (**২৮নং নকশা**) ঃ

(১) বসতে আজ্ঞা হোক ম্যাগাজিন স্ট্যাণ্ডে !

আসলে ব্যাপারটা একটা খোপ কাটা বাক্স। খোপগুলোর মধ্যে থাকবে হরেক রকম পত্র-পত্রিকা। মাথার উপরের ঢাকনা দুটো খোলা অবস্থায় কাজ করবে কফি টেবিলের বা সেন্টার টেবিলের। বন্ধ অবস্থায় মাথায় একটা কুশন চাপিয়ে দিলেই তোফা একটি বাড়তি আসন !

(২) **চিচিংফাঁক বুক কেস !**

শুধু বসার নয়, এ মতলব অফিস ঘর বা স্টাডিতেও চালানো যেতে পারে। একটা পাল্লাহীন প্রমাণ সাইজের বুক র‍্যাকের দু-পাশে দুটো হাফ সাইজের বুক র‍্যাক কব্জা দিয়ে আটকে দিতে হবে।



২৮ নং নকশা - ফাঁকতালে ষ্টোরেজ।

হাফ সাইজের বুকর‍্যাক দুটোই পাল্লার কাজ করবে যদি তার তলায় একটা করে চাকা লাগিয়ে দেন। খুব অল্প জায়গায় এঁটে যাবে ১৫০/২০০ বই। বন্ধ অবস্থায় জিনিসটা দেখাবে একটা স্ট্যাণ্ডের মত। তার উপর রাখতে পারেন স্ট্যাচু, ফুলদানী, সাবেকী কারুকার্যময় টাইমপিস বা বড় বাতিদান।

এবার আসা যাক শোবার ঘরে

(৩) জানলায় বাগিচা...

অনেকের শখ থাকে ইনডোর গার্ডেনের। ঘরে একটু সবুজের ছোঁয়া। কিন্তু হ্যাপা পোয়াতে হয় বিস্তর। টবগুলোকে ২।৪ দিন বাদ বাদ টেনে বার করতে হয় রোদে। ঘরের বেশ খানিকটা জুড়ে থাকে টবগুলো। মেঝেতে মাটি-কাদা-নোংরাও হয় বেশ খানিকটা। দক্ষিণ ও পূবমুখো জানলার চৌকাঠে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়ি ভাবে গোটা চার পাঁচ ৫/৬ ইঞ্চি চওড়া তক্তা আটকে নিন। তা হলে একটা সামনে পিছনে খোলা খোপ খোপ র‍্যাকের মত হবে। তারই এখানে ওখানে বসিয়ে দিন ক্যাকটাস বা ওই জাতীয় গাছের টব। ঘর নোংরা হবে না ; জায়গা জুড়বে না ; র‍্যাকটা একই সঙ্গে করবে গ্রীল, সানশেড ও পর্দার কাজ। গাছকে রোদ খাওয়ানোর কাজটা হয়ে যাবে আপসেই।

(৪) কসমেটিক্‌সের পাহাড় : আয়নার আড়ালে !

আড়াই ইঞ্চি চওড়া র‍্যাক হলেই কসমেটিকস রাখা চলে স্বচ্ছন্দে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পিছনে এই রকম একটা ৪/৫ থাক র‍্যাক করে নিলে অজস্র কসমেটিকস তাতে জমিয়ে রাখা যায়। আয়নার একপাশে কব্জা লাগিয়ে নিতে হবে ; সেটাই হবে কসমেটিকস স্টোরের ডালা। বাড়তি উপকারিতা : দেয়ালের স্যাঁতা লেগে আয়নার বারোটা বাজার পথ বন্ধ !

এবার চলুন যাই রান্নাঘরে।

(৫) বিফল হল মাধ্যাকর্ষণ !!

তাকের উপর সারি সারি মসলার জার রাখাই সাধারণ নিয়ম। তাতে ৩ ফুট লম্বা তাকে মেরে-কেটে ৭/৮ টা জার আঁটে। এই সংখ্যাকে ডবল করে তোলা যায় যদি আর এক সার জারের ঢাকনা পেরেক দিয়ে তাকের তলায় আটকে দেওয়া যায়। ঢাকনার প্যাঁচ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া যাবে আরো হাফ ডজন জার।

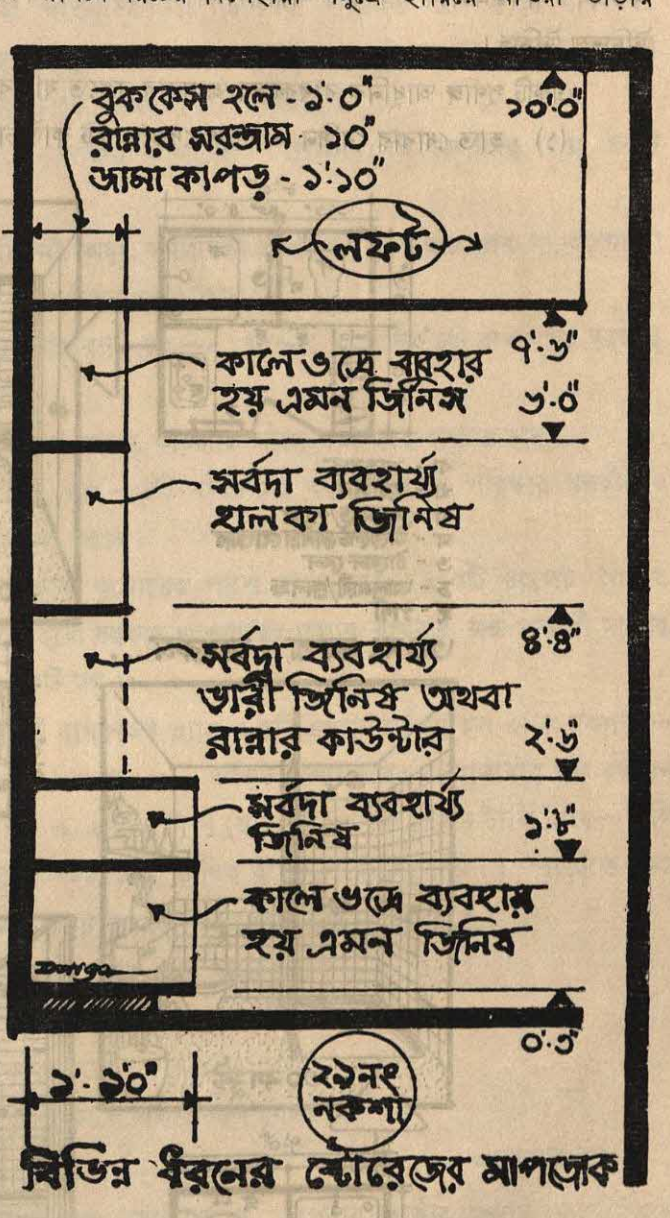
(৬) হাতলের সদ্ব্যবহার...

সসপ্যান, ফ্রাইপ্যান, কড়া, প্রেসার কুকার ইত্যাদি হাতলযুক্ত বাসন ও হাতা-খুন্তি রান্নাঘরের তাকে রাখলে তা জায়গা জুড়ে থাকবে। রান্নাঘরের দেয়াল আলমারীর দরজার বাইরের দিকে সমান দূরে দূরে পেরেক পুঁতে ওগুলো ঝুলিয়ে রাখুন। তাকের জায়গা বাঁচবে, চোখের সামনে সব কিছু ঝুলবে আর তাতে রান্নাঘরটা আরো বেশী রান্নাঘর রান্নাঘর দেখাবে।

(৭) ফুসমন্তর-দরজা হোল আলমারী ;?

বাসন কোসন কেনার সাথে সাথে দরজার রান্নাঘরের দিকের পিঠে কাঠের তক্তা ফিট করে **২৮নং নকশায়** দেখানো বাড়তি র‍্যাক অনায়াসেই তৈরি করে নেওয়া চলে। তক্তা ৬/৭ ইঞ্চি চওড়া হলেই দিব্যি কাজ চলে যায়।

এই ভাবে নানান ফন্দি-ফিকির কাজে লাগিয়ে খরচের দিশেহারা সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া ভাঁড়ার ঘরের অভাব আমরা মিটিয়ে নিতে পারি সারা বাড়ীর আনাচে-কানাচে ছোটখাট স্টোরেজ স্পেস গড়ে তুলে।



বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজের মাপজোক

● **বাথরুম**

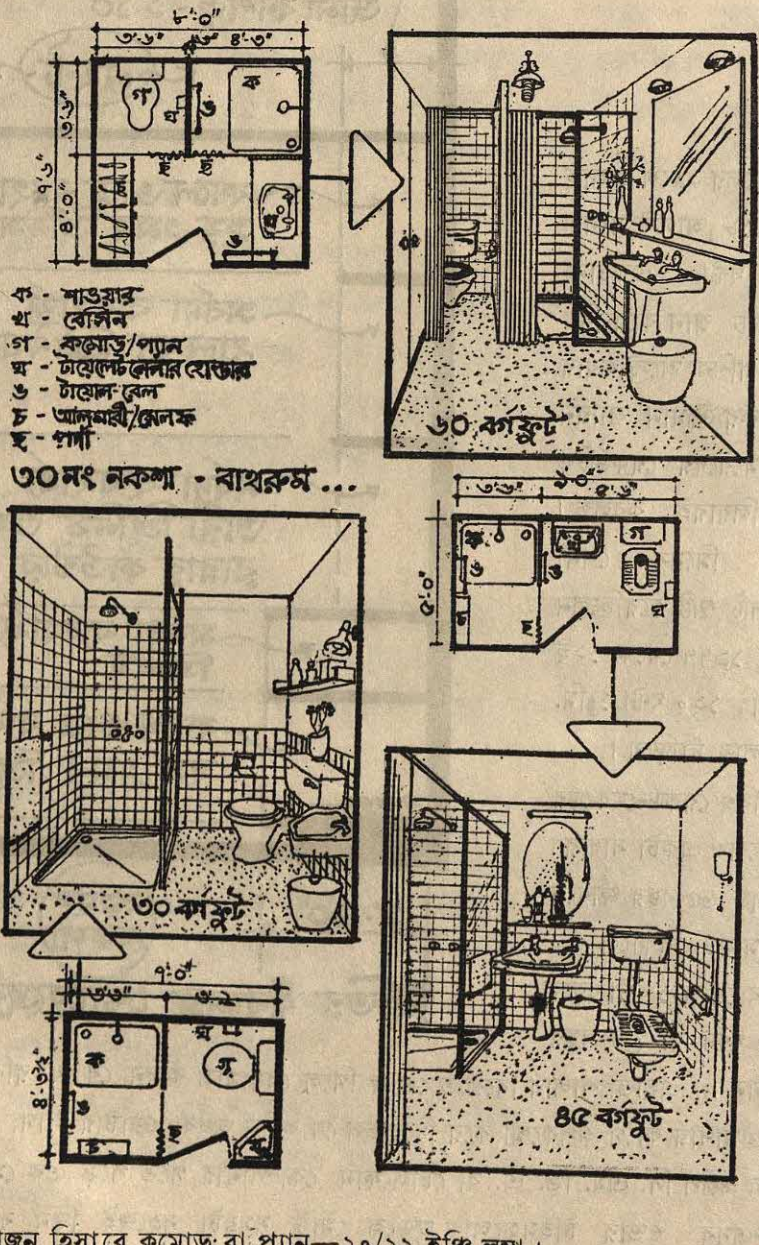
১৯৭৮ সালের ২৯শে জুলাই সকাল থেকে ১৮ আগস্ট সকাল পর্যন্ত ৩৩৬ ঘণ্টা একটানা শাওয়ারের নিচে স্নান করে বিশ্ব রেকর্ড করলেন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রকিংহাম পার্কের শ্রীমান অ্যারন মার্শাল। মেয়েদের রেকর্ডটিও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ারই কবলস্থ। ওয়াইকিকির মিসেস পেনী ক্রেস্টওয়েট সেটি সৃষ্টি করেছিলেন ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর অবধি ১২০ ঘণ্টা ১৪মি. শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে।

এ সব বিশ্ব রেকর্ড-মেকর্ডের কথা ছেড়ে দিলেও একটা সাধারণ মানুষ তাঁর গড় ৬৫ বছর জীবনে সকালে ৪০ মিনিট বিকালে ২০ মিনিট হিসাবে রোজ ১ ঘণ্টা ধরলে মোট ২৩৭২৫ ঘণ্টা বা ২·৭ বছর বাথরুমে কাটান। এছাড়া শালার বিয়েতে ভোজ গিলে বেসামাল কদিন, যে যে রবিবারে চুল কাটেন বা বাসস্ট্যাণ্ডে মাথায় কাগে অপকম্মো করে দিয়েছিল যে কদিন অথবা ওয়াটার লগিং এবং লোডশেডিং-এর যৌথ ফল স্বরূপ সি. এম. ডি. এ. বা টেলিফোন কোম্পানীর গর্তে পড়ে এক মেটে রূপ নিয়েছিলেন যে কদিন—এসব ওভার টাইমগুলো জুড়লে মোট সময়টা সহজেই তিন বছরে গিয়ে ঠেকবে।

অতএব বাথরুমটাকে একটু আরামদায়ক, একটু আকর্ষণীয় করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে তোলাই উচিতস্য উচিত।

একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক বাথরুমের আসবাব বলতে যা বোঝায় তা হল ঃ

(১) হাত ধোবার বেসিন ও পাশে দেড়/দু ফুট কাউণ্টার।



৩০নং নকশা - বাথরুম ...

(২) প্রয়োজন হিসাবে কমোড বা প্যান—২০/২২ ইঞ্চি লম্বা।

(৩) স্নানের ব্যবস্থা—রুচি অনুযায়ী বাথটব বা শাওয়ার বা দুইই। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে একমাত্র স্টীমবাথ বা শাওনা জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রগত স্নান ছাড়া বাথটবের প্রাত্যহিক ব্যবহারে স্বাস্থ্যহানি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই **৩০নং নকশায়** দেওয়া বাথরুমের প্ল্যানগুলি থেকে বাথটবকে আমরা বিদায় দিয়েছি।

(৪) কাউন্টার ও বেসিনের ঝোলানো আয়না ও আলো। সেভিং সেট চালাবার জন্য একটি প্লাগ পয়েন্ট।

(৫) তেল, সাবান, শ্যাম্পু, ব্রাস, চিরুনী, অষুধ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি রাখার জন্য তাক বা আলমারী —এখানে বাড়তি তোয়ালে, স্পঞ্জ ইত্যাদিও থাকবে।

(৬) টাওয়েল রেল, জামাকাপড় টাঙ্গাবার হুক—৫ ও ৬নং আইটেম দুটি বাথরুমের দরজার গায়েও আটকে নিতে পারেন।

(৭) একটা প্লাস্টিকের ড্রাম যাতে ময়লা কাপড় কাচবার আগে জমা করে রাখতে হবে।

(৮) একটা ছোট টবে লতানো কোন গাছ—এটি বাথরুমের বদ্ধ হাওয়াকে পরিষ্কার গন্ধহীন ও পরিবেশকে সজীব রাখতে সাহায্য করবে।

(৯) বিলাতী জীবনধারণে অভ্যস্ত হলে কমোডের পাশে রাখা দরকার একটি টয়লেট পেপার হোল্ডার আর বাঙ্গালী ধরনে হলে দরকার শাওয়ারের তলায় রাখবার জন্য মাঝারী মাপের একটি প্লাস্টিকের বালতি ও একটি মগ।

এই সব আসবাবে সজ্জিত করে তিনটি বাথরুমের প্ল্যান ও ছবি এখানে দেওয়া হল ৩০নং নকশায়—ছোট (৩০ বর্গফুট), মাঝারী (৪৫ বর্গ ফুট) ও বড় (৬০ বর্গফুট) আয়তনের যা বানাবার জন্য বর্তমান খরচ যথাক্রমে ৪০০০ টাকা, ৬০০০ টাকা ও ৮০০০ টাকা (ছবিতে দেখানো গ্লেজড টালি বাদে—টালি লাগানোর জন্য বাড়তি পড়বে ১২০০ থেকে ২০০০ টাকা টালির রং আয়তন অনুযায়ী।) বাড়ীতে এমন বাথরুম তৈরী করে নিলে দেখবেন আপনার মনই টানছে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করার দিকে।

'এই নেয়েছ, ভাত খেয়েছ, ঘণ্টা খানেক হবে—
আবার কেন হঠাৎ হেন নামলে এখন টবে?
একলা ঘরে ফুর্তি ভরে লুকিয়ে দুপুর বেলা
স্নানের ছলে ঠাণ্ডা জলে জল-ছপছপ খেলা!

[—৺সুকুমার রায়]

হোম-ইয়োপ্যাথি চিকিচ্ছে করে আশা করা যেতে পারে আপনার বাড়ীর অসাড় অ্যানিমিয়ার বিবর্ণতা কেটে গিয়ে অঙ্গে অঙ্গে ভাব-তরঙ্গে রক্তিম স্বাস্থ্যের আভা দেখা দিয়েছে। তাকে আরো মনলোভা আরো অপরূপা করতে হলে সাজাতে হবে যতনে, কেয়ূরে কঙ্কনে। সেই ঘরকন্নার ধরনকরণ আর খেলনাপাতি ঘিরে রচিত হয়েছে এ বইয়ের ৭ম অধ্যায়……

৭ ঘরকন্নার পাঁচালী

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩। আজ সরস্বতী পূজা। ভাইপো শ্রীমান ভাকু আর তার মা দোলা বৌদি কাল রাত থেকে উঠে পড়ে লেগেছে বাড়ীর শ্রী ফেরাতে। ফুল-পাতা-রঙ্গীন কাগজ-আলপনায় ফুটে উঠছে এক সরস সৌন্দর্য যার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিলে একটা মজার শান্ত, ঠাণ্ডা আরাম পাওয়া যায়, যেটা সফল ঘরকন্নার মূল উদ্দেশ্য। হোম সায়েন্সের শেষকথা। ঘর কন্নার এই পাঁচালীটি অতিশয় বৃহৎ। গৃহীর গাইডের মাপে দশ-ভল্যুম কেতাবেও কূল পাওয়া যাবে না। এখানে তার গুটিকতক প্রকরণ ও উপকরণের সাহায্যে বিষয়টির একটি প্রাথমিক আলোচনা করা হল যার সূত্র ধরে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পাঠক নিজের ভাবনাকে মিশিয়ে সত্যিকার ওস্তাদী খেলা দেখাতে পারবেন হোম সায়েন্স বা গৃহ-বিজ্ঞানে।

এই পাঁচালীর দুটি ভাগ :

(১) খেলনাপাতি—গৃহসজ্জার নানান উপকরণ, যথা—ফুলদানী, অ্যাকোয়ারিয়াম, ছবি, পর্দা, ক্যালেণ্ডার, কার্পেট, ল্যাম্প, কুলার, ওভেন ইত্যাদি।

(২) ধরন-করণ—গৃহ পরিচর্যার নানান প্রকরণ বা পদ্ধতি, যথা—আসবাবের যত্ন, ঘরের রং ফেরানো, মেঝেতে পালিশ বা আল্পনা দেওয়া, বাড়ীতে জলের সুবন্দোবস্ত করা, ডাস্টিং, পোকা-মাকড় দমন (পেস্ট কন্ট্রোল), গৃহাবর্জনার পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি।

সবগুলি নয়—দু তরফেরই গুটি কতক উদাহরণের ব্যাপকতর আলোচনার মাধ্যমে এই নবতর গৃহবিজ্ঞানের সূত্রপাত করা হবে এই 'সাঁতওয়ো' অধ্যায়ে। প্রথমেই খেলনাপাতি :

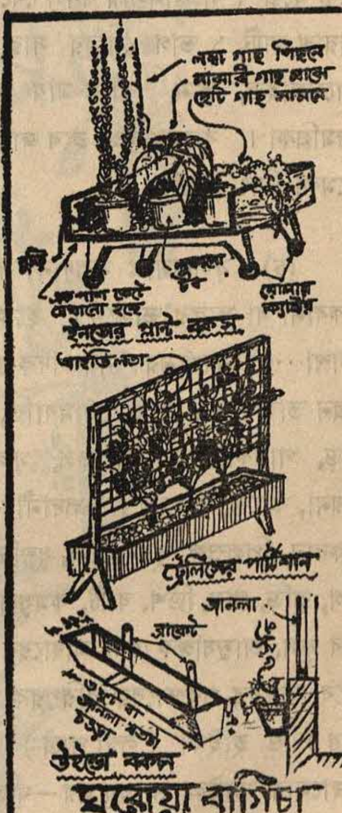
● ঘরোয়া বাগিচা

শহরের রুক্ষ জীবনে সবুজের সরস পরশ লাগাতে ঘরোয়া বাগিচা বা ইনডোর গার্ডেনের অবদান অসাধারণ। গ্রীক ও রোমান প্রাসাদে কক্ষসজ্জা হিসাবে লাগানো হত কিছু গাছ যা ঘন ছায়াতেও থাকত সতেজ। আধুনিক স্থাপত্য তার বড় বড় জানলা ও কাঁচের টানা দেয়ালের মারফত আলোয় উদ্ভাসিত অন্দর মহলে টেনে আনল আরো বহুতর আলোকপিয়াসী তরুলতাকে। ক্রমে গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসাবে দেখা দিল ইনডোর গার্ডেনের বহুতর রকমফের। তাক মাফিক দু চারটে মতলব কাজে লাগাতে পারলে ভদ্রজনের তারিফ পাবেন :

(ক) টেবল গার্ডেন : কাঠের বড় ড্রয়ার, কানা-উঁচু ট্রে বা বগি থালা অথবা চীনে মাটির স্যুপবোল

(Soup bowl) কিম্বা অব্যবহৃত আকোয়ারিয়ামে দেড় দু ইঞ্চি বালি বা মার্বেল দানা ভরে তাতে ছোট ছোট ক্যাকটাস লাগান। পাথরদানা বা বালি উঁচু করে বালিয়াড়ী বা পাহাড়ের মডেল বানাতে পারেন। বালি দিয়ে মরুভূমি বা ছোট-বড় নুড়ি দিয়ে পাহাড়ী দৃশ্যপট রচিত হয়। পাথরের ভিতর লুকানো কাঁচের বাটিতে জল রেখে সৃষ্টি করা যায় নকল পুকুর বা জলা। অ্যাকোয়ারিয়ামের দোকানে পাওয়া যায় চীনে মাটির সাঁকো, প্রাসাদ ইত্যাদি মডেল। তাক মাফিক বসিয়ে দিতে পারলে মরুদ্যানের রূপ আরো খুলবে। বৈঠকখানার সেন্টার টেবিলে রাখুন এই মডেল বাগান—সবার দৃষ্টি কাড়বে।

(খ) ইনডোর প্লান্ট বক্স ঃ ঘরের কোণে ছোট ছোট টবে ফার্ন, পাম, ঝাউ, মানি প্ল্যাণ্ট সাজিয়ে রচিত হয় ইনডোর গার্ডেন। জল কাদায় মেঝে নোংরা হয়; আলাদা আলাদা টবগুলি সামগ্রিক ভাবে কম্পোজিশানে বিঘ্ন ঘটায়; গাছে রোদ খাওয়াতে টব বার করা, ঢোকানোও শ্রমসাধ্য। **৩১নং নকশায়** দেখানো চাকাওয়ালা ৪ফুট×২ফুট মাপের ১ ফুট উচু কাঠের বা লোহার প্ল্যান্ট বক্স বানিয়ে তাতে টবগুলি সাজিয়ে নিন। লম্বা গাছ (ফার্ন, ঝাউ) পিছনে, মাঝারী গাছ (ক্রোটন, কোলিয়াস) মধ্যে ও বেঁটে গাছ (ক্যাণ্ডিয়াম, মানিপ্ল্যাণ্ট) সামনে রাখুন। নুড়ি সাজিয়ে টবগুলি আড়াল করে ফেলুন। নুড়ির সাথে বৈচিত্র্য আনতে ঝিনুক, শাঁখ, বড় পুঁথি বা রঙ্গীন কাঁচের গুলিও ব্যবহার করতে পারেন। টবের জল মেঝে নোংরা করবে না, রোদ খাওয়াতে চাকাওয়ালা বাক্সটি ঠেলে বারান্দায় বা উঠোনে নিয়ে যেতে পারবেন একাই।



ঘরোয়া বাগিচা
৩১নং নকশা

(গ) হ্যাঙ্গিং গার্ডেন—পড়ার বা খাবার টেবিলের হাত দেড়-দুই উপরে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দিন বেত বা লোহার মজবুত ছোট ঝুড়ি। তাতে ছোট টবে রাখুন মানিপ্ল্যাণ্ট, কোলিয়াস বা ছোটজাতের পাতা-বাহার। ঝুড়িটি ক্রমে ঢেকে যাবে ঝুলে পড়া লতাপাতায়। ঠিক ফুলের কুঁড়ির মত দেখতে টুনি বাল্ব পাওয়া যায় বাজারে ; তার ২০।২৫টি গাছের আড়ালে লুকানো তারে আটকে জ্বেলে দিন। রাতে টুনির রঙ্গীন নরম আলোয় খাওয়া বা পড়া হবে দারুণ উপভোগ্য ; দিনে মনে হবে আপনার হ্যাঙ্গিং গার্ডেন ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে।

(ঘ) ট্রেলিস গার্ডেন ঃ ঘরের মধ্যে কাঠ বা বেতের বেড়ায় লতা তুলে দিলে এক ধরনের পার্টিশান বা রুম ডিভাইডার তৈরি হয় (**৩১নং নকশা**) যা দিয়ে ঘরের মধ্যে রচিত হতে পারে সৌন্দর্যের সাথে প্রয়োজনীয় আব্রু। আইভি, ফিলডেনড্রন বা ফিকাস পুমিলা জাতীয় লতা ব্যবহার করবেন। ড্রেসিং কর্নার (বেডরুমে), ডাইনিং স্পেস (ড্রইংরুমে) বা বাসন ধোয়ার জায়গা (কিচেনে) সাধারণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে এই ট্রেলিস অতি চমৎকার। খোলা ছাদের কাঠ বা কংক্রিটের পারগোলায় লতা চড়িয়ে কুঞ্জ বা টেরাস গার্ডেনে আলোছায়ার মায়া সৃষ্টি করা যায় ; এও এক জাতের ট্রেলিস গার্ডেন।

(ঙ) উইণ্ডো বক্স ঃ যে কোন ঘরে জানলার সামনে পিছনে আসে সবচেয়ে বেশী রোদ হাওয়া—কাজেই এখানে ফুল বাগিচা জমেও ভাল, করাও সহজ। ৩১নং নকশা মাফিক কাঠ বা ধাতু নির্মিত প্ল্যান্ট বক্সে (যা জানলার সিল থেকে ৬ ইঞ্চি নিচে আটকানো থাকবে মজবুত ব্রাকেট দিয়ে) ৩ ভাগ দোঁয়াশ মাটি, ১ ভাগ গোবর সার, ১ ভাগ পচা পাতা ও অল্প বালি মিশিয়ে ফোটান বেগোনিয়া ব্রোমেলাইড, ফার্ন, ঝাউ মায় সরাসরি রোদ এলে টিউলিপ, লতানো গোলাপ, ড্যাফোডিল ও চন্দ্রমল্লিকা। বাক্সের লম্বা হবে জানলার চওড়ার সমান। ঘর নোংরা হবে না, গাছে রোদ খাওয়ানোর ঝামেলা নিল (Nil)।

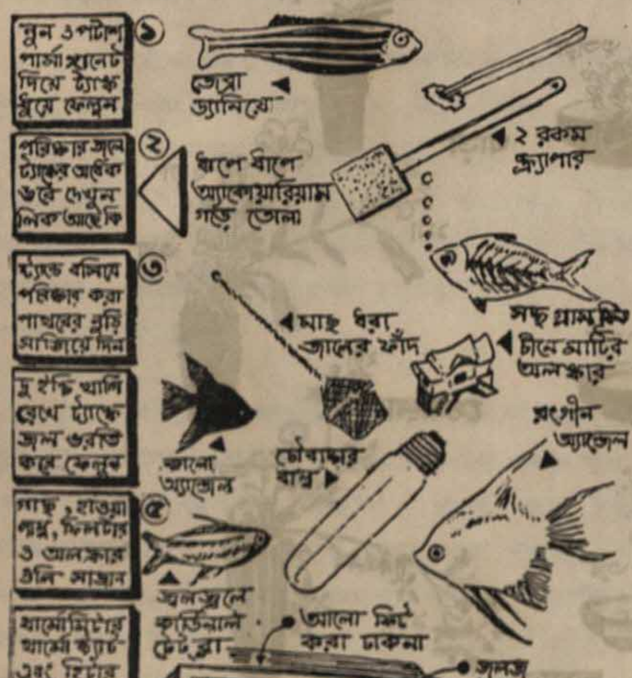
(চ) ফুলদানী ঃ ফুলদানী সাজানোকে এক পরিপূর্ণ কলাবিত্থার রূপ দিয়েছেন জাপানীরা তাঁদের ইকেবানা বা ফুলের ভাস্কর্যে। ইকেবানার মাধ্যমে প্রকাশ পায় মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, স্বপ্ন, প্রেরণা হতাশা···জীবনদর্শনের সব দিকগুলো। ফুলের সাথে শিল্পী হামেশাই প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করেন তালপাতার পাখা, মোমবাতি, শুকনো ডাল, শেকড়, সাবান, কাগজ, রঙ্গীন ফিতে, পাখির পালক, বিড়ে, পাটকাঠি, নানান ফল, ফুলঝাড়ু, কাঁটাতার, প্লাস্টিসিন, ধানের শীষ, পাথর, কাঁচের টুকরো, আয়না, কাস্তে, কি নয় ? ফুলদানী বা পাত্র হিসাবেও ব্যবহার করা যায় যে কোন শিল্পসম্মত আধার—পিকদান, পিলসুজ, ফুলের টব, ধুনুচি, ফলের বাস্কেট, অ্যাশ ট্রে, কোশাকুশি, বোতল, ঘটি, সাজি, শাঁক, পেগ, ঝুড়ি, গ্লাস, ডিশ, বাটি, কমণ্ডলু, টিপট, প্রদীপ, টিফিন কৌটো, স্যুপ প্লেট, ঘড়া—যা প্রাণ চায়। তবে ফুল, আনুষঙ্গিক এবং আধারের মধ্যে একটা শৈল্পিক যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে। নান্দনিক গুণগত ভাবে তাদের পরস্পরের পরিপূরক হতে হবে। পাত্র হিসাবে ফুলসজ্জা হয় দু ধরনের—মরিবানা (বেঁটে পাত্র) ও হাইকা (লম্বা পাত্র)। খুব রং চং-এ নক্সাদার পাত্র বাছাই করবেন না। প্রত্যেক ধরনে ফুল সাজানোর স্টাইল ৪ ধরনের—খাড়া, হেলানো, ছড়ানো ও লম্বমান (**৩২নং নকশা**)। সব স্টাইলেই তিনটি মূল ডাল থাকে যাদের নাম দিয়েছি—১মা, ২য়া ও ৩য়া। এক একটি ডালে ছোট বড় দুটো ফুল বা ১টি ফুল ও ২টি কুঁড়িই যথেষ্ট। পাতার ঘনত্ব এমন হবে যাতে ফাঁক দিয়ে আদ্দেকের বেশী ডাল দেখা যায়। ছবি দেখে দেখে প্র্যাকটিস করুন, ইকেবানার প্রদর্শনী দেখুন সুযোগ পেলেই। ক্রমে আপনি হয়ে উঠবেন ফুল সাজানোর ওস্তাদ।



৩২ নং নকশা - ফুলদানী সাজানো

● বৈঠকখানার মৎস্যপুরাণ

অ্যাকোয়ারিয়াম বা রঙ্গীন মাছের শো-কেস ঘরের শোভা বাড়াবে, হবে অবসর-বিনোদনের সাথী, গড়ে তুলবে এক সস্তা হবি যা ছোটদের মানবিক গুণগুলো ফুটিয়ে তুলতে করবে সাহায্য। মোট বাজেট ২০০ টাকা।



৩৩নং নকশা

অ্যাকুরিয়ামের সাজ সরঞ্জাম

জল ভর্তি অ্যাকোয়ারিয়ামের ওজন ২৫ কেজি থেকে ৬০ কেজি পর্যন্ত। নড়াচড়া করালে ট্যাঙ্কের জোড় খুলে লিক দেখা দেবে। অতএব ঘরের নিরালা কোণে যাতে চলা ফেরায় বাধা না সৃষ্টি করে এমন ভাবে খুব মজবুত লোহার বা কাঠের স্ট্যাণ্ডে বসান ২০ থেকে ৩০ লিটার জল ধরে এমন চৌবাচ্চা (শুরুতে বেশি বড় ট্যাঙ্ক নেবেন না)। কাছে-পিঠে আলো ও অ্যারেটার পাম্প চালানোর জন্য চাই একটা ইলেট্রিক প্ল্যাগ পয়েন্ট। এই চৌবাচ্চায় আপনার ১/১½ ইঞ্চি সাইজের ৮/১০ টি মাছ দিব্যি এঁটে যাবে (**৬ নং ছবি**)। স্ট্যাণ্ডের খাড়াই এমন হবে যে শো-কেস থাকবে আপনার চোখের লেভেলে। আনুষঙ্গিক সারঞ্জামের মধ্যে এক নম্বর বাতি। এটি ফিট করা থাকে ঢাকনার তলায়। উদ্দেশ্য, এক. লুকানো আলোয় অ্যাকোয়ারিয়ামের সৌন্দর্যকে উদ্ভাসিত করা; দুই, বাল্বের উত্তাপে জলকে রঙ্গীন মাছের উপযুক্ত ভাবে উত্তপ্ত ($৭৪^{০}$-$৭৮^{০}$ ফারেনহাইট) করে তোলা।

৪০ ওয়াটের দুটি বাল্বই মাঝারী মাপের (২৫/৩০ লিটার জল) চৌবাচ্চার পক্ষে যথেষ্ট। এই আলো জলজ উদ্ভিদকেও বাড়তে সাহায্য করবে।

এরপর অ্যারেশন বা জলে হাওয়া খেলানোর ব্যবস্থা। মাছ কানকো দিয়ে জল থেকে অক্সিজেন শুষে নেয়। অ্যারেশনের মারফত হাওয়া জলকে জোগান দেয় সেই অক্সিজেন। কাজেই মাছের জীবন-ধারণের পক্ষে চৌবাচ্চার অল্প বদ্ধ ঢাকা জলে হাওয়া খেলানো একান্ত দরকারী। এর জন্য দরকার ছোট এয়ার পাম্প, রবারের বা প্লাস্টিকের অ্যারেটার নল (৬ নং ছবিতে দুটি নল দেখা যাচ্ছে) ও নলকে জলের তলায় ডুবিয়ে রাখতে ওজনদার অ্যারেটার নজল (৩৩ নং নকশায় নজ্‌লটির আকৃতি দেওয়া হয়েছে ডুবুরীর।)

এ ছাড়া আর সব যা সরঞ্জাম লাগবে :

(১) মাছ ধরবার হাতলওয়ালা জালের ফাঁদ ;

(২) জল ভরা ও খালি করার জন্য বালতি, মগ, রবারের নল ;

(৩) বাচ্চা বা রোগগ্রস্তকে আলাদা রাখার জন্য ৫ লিটারের ছোট চৌবাচ্চা ;

(৪) চৌবাচ্চার কাঁচ পরিষ্কার করার জন্য খুন্তির মত স্ক্র্যাপার ;

(৫) খাবার দেবার প্লাস্টিকের ভাসন্ত ফিডিং কাপ ;

(৬) অ্যাকোরিয়াম সাজাবার জন্য ২/১ টি সুনির্বাচিত কাঁচ, প্লাস্টিক বা চীনে মাটির অলঙ্করণ (ব্যাং, ডুবুরী, সাঁকো, জাহাজ, নোঙ্গর, জলপরী ইত্যাদি)

(৭) তলায় বিছাবার সাদা ও রঙ্গীন নুড়ি ;

(৮) ২/১ টি জলজ উদ্ভিদ। আলো না পেলে কিন্তু এরা বাঁচবে না ;

(৯) জল পরিষ্কারক মেথানিল ব্লু।

এবার **৩৩ নং নকশায়** দেখানো ৮টি ধাপে গড়ে তুলুন আপনার শখের অ্যাকোরিয়াম। মাছের নির্বাচনে সাহায্য করবে **৩৪ নং নকশার** সারণীটি। মাছের স্বভাব অনুযায়ী তারা ট্যাঙ্কের উপর দিকে মাঝ বরাবর বা তলদেশে ঘুরে বেড়ায়। এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে এই তিন শ্রেণীর মাছই চৌবাচ্চায় থাকে। তাতে ট্যাঙ্ক ভরাট দেখাবে। (ক. উপর দিকে থাকে—পার্ল, ড্যানিয়ো, হ্যাচেট ; খ. মাঝখানে থাকে নিওন, কার্ডিনাল টেট্রা, জেব্রা ; গ. তলায় থাকে— স্ক্যাভেঞ্জার, কাটফিশ ও লোচ।) মাছের প্রিয় খাদ্য উইপোকা, বাচ্চা কেঁচো (সবচেয়ে সহজ লভ্য), মশা ও কুচো চিংড়ির ডিম। এক ঘণ্টায় যতটুকু খেতে পারে সারাদিন সেইটুকুই বারে বারে খেতে দেবেন। মনে রাখবেন অ্যাকোয়ারিয়ামে গুরুভোজনই হচ্ছে মাছের মৃত্যুর বৃহত্তম কারণ।

অ্যাকারিয়ামের মাছ

নাম	বিবরণ	মাপ	জলের উত্তাপ
নানাজাতের ডানিও	রঙিন শিরওয়ালা শক্ত সমর্থ খেলুড়ে মাছ	১-১ ১.৫ ইঞ্চি	৭০-৭৩ ডিঃ ফারেনহাইট
হ্যাচেট	রূপালি রঙ-এর মাংসাশী ঝগড়াটে মাছ	২-২ ১.৫ ইঞ্চি	৭৫ ডিঃ ফারেনহাইট
গাপ্পী	অপরূপ বর্ণছটা, বাহারে পাখনা, শক্ত সমর্থ	১ ১.২-২ ইঞ্চি	৭২-৭৫ ডিঃ ফারেনহাইট
টেট্রা	জ্বলজ্বলে নীলচে সবুজ শান্ত মাছ, তলাটা লাল	১ ১.৫-২ ইঞ্চি	৭৩-৭৬ ডিঃ ফারেনহাইট
টাইগার কার্ব	হলদের উপর কাল স্ট্রাইপ; সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতি	২-২ ১.৫ ইঞ্চি	৭৩-৭৪ ডিঃ ফারেনহাইট
ফাইটার	সুন্দর কিন্তু ভীষণ ঝগড়াটে	২ ১.৫ ইঞ্চি	৭৮-৮২ ডিঃ ফাঃ
ভাঁড় লোচ	সোনালি কমলা রঙ, তিনটি চকলেট ডোরা, লুকিয়ে থাকে	ঐ	৭৫-৭৬ ডিঃ ফারেনহাইট
অ্যাঞ্জেল ফিস	অপরূপ দেখতে, হিংস্র, ছোট মাছ খেয়ে ফেলে	৪-৫ ইঞ্চি	৭৫-৮২ ডিঃ ফারেনহাইট
গ্লাস ফিস	সচ্ছ, সমর্থ মাংসাশী মাছ	১১.৫ ইঞ্চি	৭৩-৭৫ ডিঃ ফাঃ
মলি	লম্বা পাখনা, ভেলভেটের মত রঙ	১-১ ১.৫ ইঞ্চি	৭৫-৭৬ ডিঃ ফারেনহাইট
প্লাটি	লাল-কমলা রঙ, শান্ত, প্রচুর ডিম পাড়ে	২-২ ১.৫ ইঞ্চি	৭৪-৭৫ ডিঃ ফারেনহাইট
চিচলিড	রঙিন বড় মাছ, বড় ট্যাঙ্কের প্রয়োজন	৬-৭ ইঞ্চি	৭৪-৭৮ ডিঃ ফারেনহাইট
সোর্ড টেল	ভয়ানক ঝগড়াটে, লম্বা ল্যাজ	২ ১.৫-৩ ইঞ্চি	ঐ
কাটি ফিস	মুন্ডাফরাশ মাছ, জল পরিষ্কার রাখে	২-২ ১.৫ ইঞ্চি	৭৬-৮০ ডিঃ ফারেনহাইট

৩৪ নং নকশা

● ছবি-পর্দা-ক্যালেণ্ডার

বা এক কথায় দেয়াল সজ্জা।

> ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
> কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
> ক্ষণিক আভাস –
> আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।
> পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
> রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
>
> [নগ্ন নির্জন হাত : জীবনানন্দ দাশ]

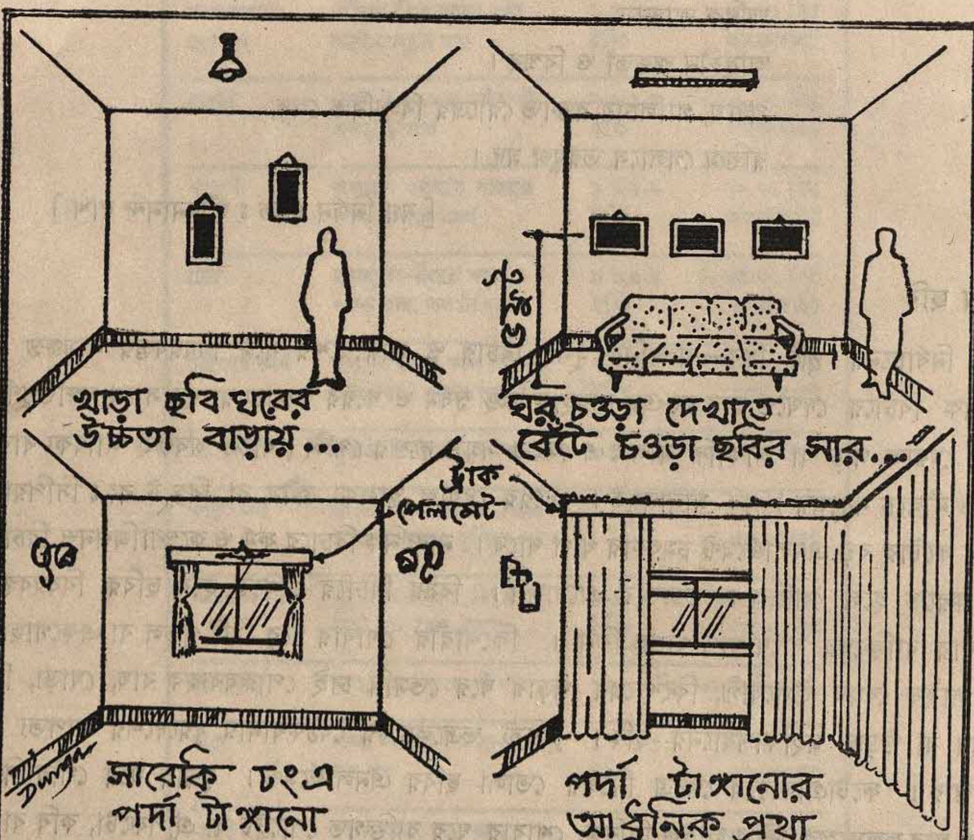
প্রথমে ছবি

নির্বাচনের দুটি দিক—নান্দনিক মূল্য বিচার ও পরিবেশের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিচার। নান্দনিক বিচারে দেখতে হবে রং-এর ব্যবহার স্বচ্ছ সুষম ও ঘরের অন্যান্য রংয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। ঘরের দেয়াল গাঢ় বা আকাশি নীল : এ ক্ষেত্রে সমুদ্র দৃশ্যের পেন্টিং (যাতে অবশ্যই আধিক্য থাকবে ঘন নীল ও নীলচে সবুজের) খুব মানানসই। ঘরের দেয়াল হালকা ক্রীম বা বিস্কুট রং : সিপিয়া টোনে ছাপান ফটোর বড় এনলার্জমেণ্ট চমৎকার থাপ খাবে। নান্দনিক বিচারে ফর্ম ও কম্পোজিশনও বিচার্য, তবে সেটা করতে হলে শৈল্পিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। বিষয় বিচারে দেখতে হবে ছবির বিষয়বস্তু ঘরের বাসিন্দার ব্যক্তিত্বের সাথে থাপ থাচ্ছে কিনা। কিশোরীর শোবার ঘরে মিষ্টি পুতুল বা একগোছা ফুলের স্টিল লাইফ যেমন উপযোগী, কিশোরের পড়ার ঘরে তেমনি চাই পৌরুষব্যঞ্জক বাঘ, ঘোড়া, শিকারী, কাউবয় বা উড়ন্ত মহাকাশযানের ছবি। টুরিস্ট ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় দূরদেশের স্থাপত্য শৈলীর চিত্রসম্ভার। ফটোগ্রাফারের ক্ষেত্রে নিজের তোলা ছবির এনলার্জমেণ্ট। বৃদ্ধার ঘরে পৌরাণিক দৃশ্য, খাবার ঘরে ফলফুলের স্টিল লাইফ সিরিজ, শোবার ঘরে ব্যক্তিগত পোট্রেট বা গ্রুপফটো, কবি বা শিল্পীর স্টাডিতে বিমূর্ত জলছবি। মূল চিত্র কেনা মধ্যবিত্তের ক্ষমতার বাইরে। আর্ট অ্যাকাডেমির মারফত যে ভাল দেশী-বিদেশী প্রিন্ট পাওয়া যায় তা দেখতে প্রায় মূল ছবিরই সমতুল। ঘরের আসবাব ও সাজানোর ঢং যেখানে সাবেকী সেখানে ছবি ও তার ফ্রেমও হবে সনাতনী (ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণ)। আসবাব যেখানে সাবেকী ও আধুনিক মেশানো সেখানে আধুনিক মূর্ত ছবি (Realistic Picture) ও আসবাব যেখানে অত্যাধুনিক সেখানে আধুনিক বিমূর্ত ছবি (Abstruct Picture) ভাল থাপ থায়। আধুনিক ছবির ফ্রেমও হতে হবে আধুনিক। ছবি টাঙ্গানোর কয়েকটি নিয়ম আছে :

(১) ছবিকে দেয়ালে টাঙ্গাবার সময় দেয়ালের ধারে রাখা সোফা বা ক্যাবিনেট-এর সঙ্গে মানিয়ে (কম্পোজ করে) টাঙ্গাবেন।

(২) ছবির উচ্চতা হবে মেঝে থেকে ৫½ ফুট। ছোটদের ঘরে ৪ ফুট। ছবি হেলিয়ে না রেখে খাড়া করে টাঙ্গাবেন দেয়ালের সাথে সাঁটিয়ে। পেছনের দড়ি বা তার দেখা যাওয়া অনুচিত।

(৩) লম্বা সরু ছবি দৃশ্যত ঘরের উচ্চতা বাড়ায়। ঘর চওড়া দেখাতে প্রয়োজন বেঁটে চওড়া ছবির সার।



৩৫ নং নকশা - ছবি ও পর্দা

এবারে পর্দা

মূল উদ্দেশ্য আলো-বাতাস নিয়ন্ত্রণ ও আব্রু সৃষ্টি। অধুনা এর সাথে যোগ হয়েছে ঘরের সৌন্দর্য-বিধান। কুরূপ নিরালঙ্কার দেয়াল আড়াল করতে বা ভাস্কর্যের পশ্চাদপট হিসাবে টানা বড় পর্দা। 'কক্ষান্তরের ক্ষণিক আভাস—আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়'। আকৃতিগত দিক দিয়ে রঙ্গীন বিমূর্ত কলাযুক্ত ট্যাপেস্ট্রি হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে রেকর্ড সাইজের পর্দা হচ্ছে বুলগেরীয় ভাস্কর কৃস্টোর তৈরি। ১৮৫ ফুট উঁচু পর্দাটি গ্রাণ্ড হকব্যাক, কলোরেডোর ১৩৫০ ফুট চওড়া গিরিপথের উপর আড়াআড়ি ভাবে টাঙ্গানো

হয় ১০ আগস্ট, ১৯৭১-এ। উজ্জ্বল লাল ও হলুদ রং-এর সাড়ে তিন টন ওজনের ও সাড়ে সাত লক্ষ ডলার মূল্যের এই পর্দাটি টাঙ্গানোর ২৭ ঘণ্টা বাদেই ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

পর্দার মাপ ঠিক করার একটি সূত্র আছে। দেয়ালের যতটা অংশ ঢাকা হবে, পর্দার চওড়া করতে হবে তার ডবল। অর্থাৎ ৩ ফুট চওড়া দরজার পর্দার ওসার হবে ছ' ফুট ঃ তা হলে টানা অবস্থাতেও পর্দার কুচি বা ফোল্ডগুলি সুন্দর ও ঘনঘন দেখাবে। এছাড়া ধার মোড়ার জন্য দু পাশে দু ইঞ্চি, মাথায় সাড়ে তিন ইঞ্চি ও তলায় হেমের জন্য ছয় ইঞ্চি বাড়তি কাপড় চাই। সাবেকী ঢং-এ, পর্দার খাড়াই হয় জানলার মাপে। আধুনিক স্টাইলে পেলমেট থেকে মেঝে পর্যন্ত ঃ দু পাশের দেয়ালে বেশ খানিকটা চওড়া করে গুচ্ছ করা থাকে, তাতে জানলাটি প্রকৃত মাপের তুলনায় দেখতে চওড়া লাগে। পেলমেটের ব্যবহার ক্রমে কমে আসছে। চালু হচ্ছে খোলা অ্যালুমিনিয়াম ট্র্যাক থেকে ঝোলানো পর্দার।

আধুনিক পর্দার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ঃ

(১) ঘর অন্ধকার করতে মোটা কাপড়ের ভারী ড্রেপারী

(২) ঘর সাজাতে মোটা কাপড়ে ছবি আঁকা ভারী ট্রাপেস্ট্রি

(৩) আব্রুর জন্য পাতলা কাপড়, প্লাস্টিক, নেট বা লেসের পর্দা

(৪) প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামের ভেনেসিয়ান ব্লাইণ্ড

(৫) দড়ি পুঁথি কাঠের মটরদানা ও মাদুরের বাহারী স্ক্রীন

(৬) বাঁশের বা খসখসের চিক—ঘর ঠাণ্ডা রাখতে দরকার। আপনার রুচি ও প্রয়োজন মত বেছে নিতে পারেন।

পর্দা নির্বাচন ও টাঙ্গানোর কতকগুলি নিয়ম ঃ

(ক) সাবেকী ঢং-এ সাজানো ঘরে নকশাওয়ালা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গাতে হবে সাবেকী ঢং-এ। আধুনিক স্টাইলে সাজানো ঘরে এক রংয়া পর্দা টাঙ্গাতে হবে আধুনিক ঢং-এ। ছাদ থেকে মেঝে অবধি ঝোলানো বড় পর্দায় ঘরের উচ্চতা ও আকার বড় দেখায়। জানলার মাপে খাটো ঝুলের পর্দায় প্রতিক্রিয়া হয় ঠিক উল্টো।

(খ) পেলমেট বা ট্রাক এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়াল ছড়িয়ে গেলে ঘরের আয়তন বড় মনে হয় ; সমগ্র গৃহসজ্জাকে একীভূত (Unified) করে।

(গ) যথেষ্ট মাপের টেঁকসহ সস্তা কাপড় কিনুন। খাটো মাপের দামী পর্দাও বেখাপ্পা দেখায়। লাইনিং দিয়ে নিন, পর্দা টেঁকসই হবে।

(ঘ) পর্দার রং হবে ঘরের অন্যান্য রং-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তলার দিকের হেমে ছোট ছোট ওজন সেলাই করে দিলে পর্দা টান টান হয়ে ঝুলে থাকে ; ভাল দেখায়।

শেষে ক্যালেণ্ডার

ছবির মত এরও নির্বাচন করতে হবে নান্দনিক ও বিষয়বস্তুর বিচার করে। দামী, সুরুচিপূর্ণ ক্যালেণ্ডার গৃহস্থের আভিজাত্য বাড়ায়। শুধু দিন ও তারিখ দেখার প্রয়োজনে নয়—বর্তমানে গৃহসৌষ্ঠব

বাড়াতেও ক্যালেণ্ডারের অবদান স্বীকৃত হয়েছে। ক্যালেণ্ডার টাঙ্গানোর দুটি নিয়ম—এক, পুরোনো ক্যালেণ্ডার দেয়ালে জমিয়ে রাখবেন না ; বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বিদায় করবেন তাকে। এবং দুই, একটি ঘরে একটির বেশী ক্যালেণ্ডার কিছুতেই টাঙ্গাবেন না।

অথ ইতি দেয়াল-সজ্জা কথা ॥

● কার্পেটের কারিকুরি

আধুনিক নাগরিক জীবনে কার্পেট বা গালিচার ব্যবহার বেড়েই চলেছে। জমিদারের খাস কামরা, বিবাহবাসর, গানের মজলিশ থেকে অফিস, শোরুম, একজিবিশান গ্যালারী, হোটেল মায় এয়ার পোর্ট লাউঞ্জেও প্রসারিত হচ্ছে কার্পেট। ধাওয়া করছে বিত্তবান গৃহ থেকে মধ্যবিত্ত আবাসনে। মেঝের সৌন্দর্যবিধানে গালিচার ব্যবহার সুপ্রাচীন। ১৯৪৭ সালে রাশিয়ার পাজিরিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত সাদা জমির উপর লাল কাজ করা অতি উমদা উলের কার্পেটটি (আনুমানিক সৃষ্টিকাল খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ) মানুষের হাতে তৈরি গালিচার প্রাচীনতম নিদর্শন। ২৫০০ বছরের পুরানো এই কার্পেটটি লেনিনগ্রাদ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমতলে অবশ্য শীতের দুমাস বাদ দিলে, বছরের বাকি সময়টুকু কার্পেটবিহীন ঠাণ্ডা সান বাঁধানো মেঝেই অধিকতর সুখকর। তবে সেটা নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যহীন, বে-আব্রুও।

কার্পেট পাতার পদ্ধতি দু রকম :

(১) ছোট মাপের গালিচা বা র‍্যাগ পাতা। বাজারে যে সব মাপে ছোট কার্পেট পাওয়া যায় তা হল : ৬´×৯´, ৯´×১২´, ১২´×১৬´ ইত্যাদি। আপনার ঘরের মাপ অনুযায়ী কিনবেন। ছোট কার্পেটর সুবিধা দু দফা। এক, ঘরের ভিতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এধার-ওধার করে পাতা যায়। ফলে এক অংশ চলাচলে ক্ষয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলে তা আসবাবের তলায় দৃষ্টির আড়ালে চালান করে, ঘুরিয়ে কার্পেটের ভাল অংশটি সামনে রাখা যায়। দুই, পাতা-গোটানো, ডাইং ক্লীনিং-এ পাঠানো, তারে টাঙ্গিয়ে পিটিয়ে ধুলো ঝাড়া এবং প্রয়োজনবোধে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে, এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী নিয়ে যাওয়া বেশ সহজসাধ্য।

(২) পুরো মেঝে জুড়ে ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট পাতা। লম্বা রোল থেকে ঘরের মাপ অনুযায়ী কেটে ৩/৪ ফুট চওড়া ফালিগুলি পাশাপাশি সেলাই করে জুড়ে নিতে হয় ও পাতবার আগে ধার মুড়ে নিতে হয়। কার্পেট বিক্রেতাই ঘরের মাপ নিয়ে এই কাজগুলি করে দেন। ঘরজোড়া কার্পেটের সুবিধাও দু দফা। এক, একরঙ্গা ঘরজোড়া কার্পেটে ঘর অনেক বড় ও সুন্দর দেখায়। তেড়া বেঁকা ঘরে মোজাইকের চৌকটালি বসালে সরু-মোটা খাপছাড়া ধারি বা বর্ডারে সৌন্দর্যহানি হয়। ঘরজোড়া কার্পেটে এসব দোষত্রুটি ঢেকে যায়। দুই, পুরো মেঝে নজরের আড়ালে চলে যায় বলে খুব সস্তা সিমেন্টের বা ইটের ফাটা-ফুটো, উঁচু-নিচু, খোঁদলানো রং চটা বিবর্ণ পুরানো মেঝেতেও ঘরের সৌন্দর্য পুরোপুরি বজায় থাকে।

স্থান ভেদে ব্যবহার্য্য কার্পেটের প্রকার-ভেদ হয় ঃ

(ক) বোনা কার্পেট—করিডোর, বারান্দা, সিঁড়ির পাট বা নারকেল দড়ির কার্পেট।

(খ) খাট গুচ্ছ—স্টাডি, লবী, প্যাসেজ ও অফিস রুমের এক রঙ্গা উল বা নাইলন কার্পেট।

(গ) ডীপ গুচ্ছ—বসার, শোবার ঘর ও ড্রেসিং রুমের আরামদায়ক দামী উল বা নাইলন কার্পেট। রুচিভেদে এক রঙ্গা বা নকশাদার।

(ঘ) নকশাদার গালিচা—নাচ-গানের মজলিশ, বরাসন, সাহিত্য বাসরে বহু রঙ্গা পার্সিয়ান বা নাগা কার্পেট।

(ঙ) এক রঙ্গা নকশাহীন ছোট আধুনিক ঘর বড় দেখাতে ঘরজোড়া বর্ডারবিহীন কার্পেট।

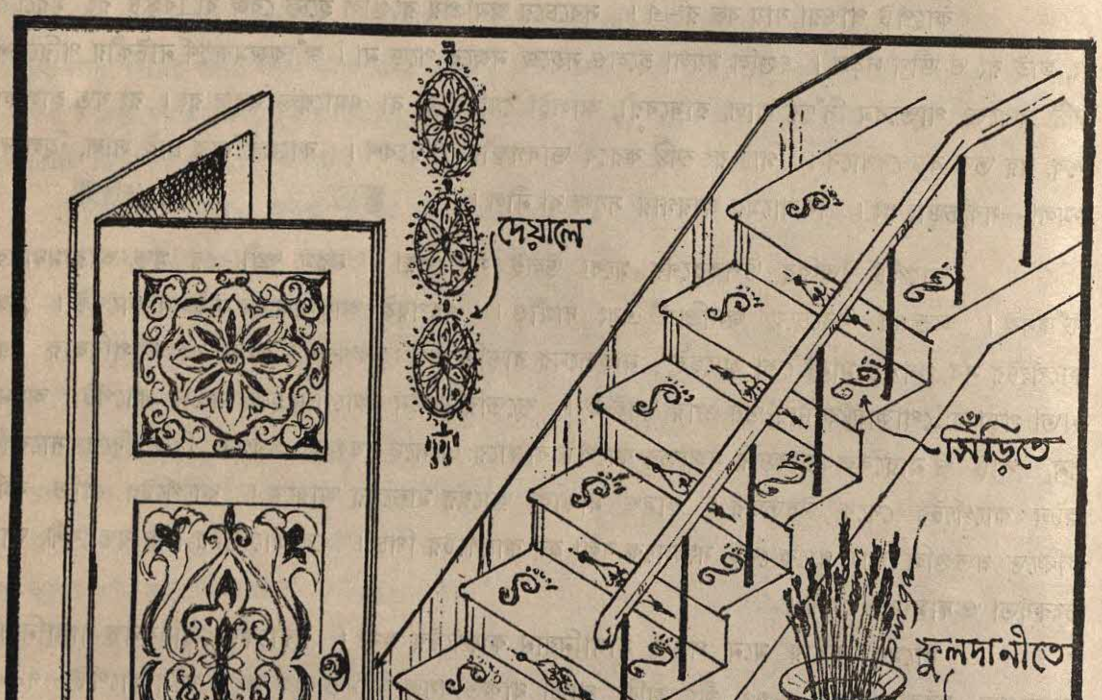
কার্পেট পাওয়া যায় বহু রং-এ। সবচেয়ে জনপ্রিয় রংগুলি হচ্ছে বেজ বা বিস্কুট রং, মরচের রং, ছাই রং ও ডীপ সবুজ। এগুলি ময়লা হলেও সহজে নজরে পড়ে না। জাঁকজমকপূর্ণ নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পাতবেন সিঁদুর লাল, রাসবেরী, আলট্রা মেরিন ব্লু বা এমারেল্ড সবুজ রং। রং যত হালকা হবে, ঘর তত বড় দেখাবে। গাঢ় রং সৃষ্টি করবে ভাবগম্ভীর পরিবেশ। কাজের ঘরে চাই লাল, হলদে, কমলা—সব চড়াং রং। বিশ্রামের জায়গায় সবুজ বা নীল।

কার্পেট তৈরির উপকরণের মধ্যে উলই সব সেরা। নরম, স্প্রীং-এর মত, আরামদায়ক টেঁকসই। অতএব সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং দামীও। এরপরই আধুনিকতম নাইলন কার্পেট। উল কার্পেটের সব গুণগত মান তো আছেই ; নাইলনের বাড়তি গুণ দারুণ—টেঁকসই, সহজে পরিষ্কার হয়, ছাতা পড়া বা পোকায় কাটার ভয় প্রায় নেই-ই। সুতোর কটন কার্পেট হচ্ছে সস্তার কার্পেট। অধুনা শন, পাট ও নারকেল ছোবড়ার সস্তাতর কার্পেট বাজারে এসেছে যেগুলি গুণগত দিক দিয়ে সাবেকী কটন কার্পেটের থেকে উন্নততর। দামও মাঝারী আয়ের মানুষের আয়ত্তে। কার্পেটের প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে যতগুলি লোম থাকে সেই সংখ্যাকে বলা হয় কার্পেটের পিচ। যে কার্পেটের পিচ যত বেশী, তার উৎকর্ষতা ও দাম তত বেশী।

দামের কথায় মনে পড়ল সাসানিয়ান কার্পেটের কথা। ইরাকের স্টেসিফনস্থ সাসানিয়ান প্রাসাদের দরবার হলে ৬৩৫ খ্রীঃ অব্দি পাতা থাকত খসরু-নির্মিত এক অপূর্ব স্প্রীং কার্পেট—৭০০০ বর্গফুট আয়তন ; তৈরি হয়েছিল রেশম ও সোনার সূক্ষ্ম তার বুনে যাতে গাঁথা ছিল সবুজ পান্নার পুঁথি। দাম ? সেকালের হিসাবে ৩৬০ কোটি টাকা। দামী কার্পেট হিসাবে এটি বিশ্বরেকর্ড। কিন্তু এ হেন কার্পেটের লোভ করতে যাবেন না। এ কার্পেটের শেষ পরিণাম অতি ভয়াবহ, বীভৎস। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সাসানিয়ান প্রাসাদ সামরিক লুটেরাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল স্রেফ এই কার্পেটের জন্যই। রক্তের নদী বয়েছিল। সমস্ত প্রাসাদবাসী নিহত হয়েছিলেন এক রাতে। অভিশপ্ত সোনার কার্পেটটি লুট হয়ে গিয়েছিল সহস্র টুকরো হয়ে। একটি কার্পেটের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ রাতারাতি পরিণত হয়েছিল প'ড়ো ধ্বংসস্তূপে !

● জল্পনা কল্পনা……আল্পনা

আল্পনা হল ভারতের প্রাচীনতম লোকশিল্প। কুমারস্বামীর মতে ৫০০০ বছরের পুরানো। কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'আলিম্পন' থেকে। গুজরাটে এর নাম সাথিয়া, মহারাষ্ট্রে রঙ্গাবলী, উত্তর প্রদেশে সাঁঝী। মেয়েদের নিজস্ব এই শিল্পে গুঁড়ো চালে জল মিশিয়ে তৈরি হয় সাদা রং ; এক টুকরো কাপড় ওই রং-এ ভিজিয়ে হাতের তালুতে রেখে অনামিকার সাহায্যে আল্পনার নকশা আঁকা হয়। তুলির বদলে আঙ্গুলের ব্যবহারে আল্পনার মাঝে ফুটে ওঠে লোকায়ত শিল্পের মোটা দাগের বলিষ্ঠ ছাপ। এটাই আল্পনার বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ আল্পনা চালের গুঁড়ি দিয়ে দেওয়া হত বলে এর স্থায়িত্বও ছিল খুব কম।



৩৬ নং নকশা - আলপনার বৈচিত্র্য

অবনীন্দ্রনাথ পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে জাতে তুল্লেন এই আর্ট ফর্মকে। গ্রামীণ লক্ষ্মীর পা, হাঁস,

মাছ, ধানের শীষের মত মাঙ্গলিক চিহ্নের স্থানাধিকার করল শান্তি-নিকেতনী ধারার ফুল, লতা, পাতা, কল্কা ইত্যাদি নান্দনিক মোটিফ। ধর্মীয় অঙ্কনে যুক্ত হল শিল্পশ্রী। এল রং, স্থায়িত্ব বাড়াতে যুক্ত হল শিরিষের আঠা ও ইদানীং ফেবিকল, মোয়িকল। মন্দিরের অঙ্গন থেকে আল্পনা নেমে এলো ঘর সাজানোর কাজে। শুধু মেঝে নয়, ঘরের দরজা, জানলা, দেয়াল—সর্বত্র শুরু হল আল্পনার জল্পনা-কল্পনা (**৩৬নং নকশা**)।

দরজার পাল্লায় আমন্ত্রণসূচক মোটিফ (পদ্ম, শঙ্খ বা জোড়া হাতের নমস্কার ভঙ্গী), সিঁড়ির ত্বপাশে আঁকা লক্ষ্মীর পা বা লতানো মোটিফ, ছোট দেয়ালে খাড়া নকশা (গাঢ় রং দিয়ে আঁকা চাঁদমালা, সশীষ ডাব সহ মঙ্গল ঘট), টানা দেয়ালে বড় নকশা (সূর্য মন্দিরের রথের চাকা, মধুবনী নকশা) এঁকে দিলে এক অপূর্ব সুন্দর শিল্প-স্বর্গের পরিবেশ সৃষ্টি হবে বাড়ীতে। একটু পাকা হাতের কাজ হলে শান বাঁধানো মেঝেও অক্লেশে হারিয়ে দেবে কার্পেটের কারিকুরিকে। বড় মাটির জালার গায়ে আল্পনা এঁকে সৃষ্টি করা যায় অতি সুরুচিপূর্ণ বিশাল ফুলদানী। পর্দা, ওয়াড়, টেবিল ক্লথে ফেব্রিক পেন্ট দিয়ে আঁকতে পারেন চিরস্থায়ী আল্পনা। এমন কি আপনি অবন ঠাকুরের মত অতি উৎসাহী হলে ঘোড়নচি কাঁধে সৃষ্টি করতে পারেন আলপনার চাঁদমালা······ঘরের সিলিং-এ! ঘরে যতক্ষণ চলছে পার্সিয়ার কার্পেট খাঁ বনাম শান্তি-নিকেতনের শ্রীমতী আল্পনার সাংস্কৃতিক লড়াই বা কুষ্টি-যুদ্ধ—ততক্ষণ চলুন আমরা ঘুরে আসি হিরাট-কাবুল-কান্দাহার। খেলনাপাতির অধ্যায় শেষে ধরা যাক ধরন-করন :

● যাযাবরের পিছুটান

'যারে তুমি ফেলেছো পিছে,
সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে।'

—রবীন্দ্রনাথ

হঠাৎ হাতে এসে গেল হিল স্টেশান কনসেসান, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নকুড় মামা যে দিন সপরিবারে ছুট লাগালেন সিমলার পথে, সেদিন বারটা গুরুবার ছিল কিনা, কালটা বারবেলা ছিল কিনা বলতে পারব না, তবে ট্রেনে চড়েই আবিষ্কৃত হল সারা পরিবারের গরম জামার পোঁটলাটা খোকার পড়ার টেবিলেই রয়ে গেছে। দিল্লীতে পা দিয়েই লালিমিলির কবলে গচ্ছা গেল আড়াই শো টাকা। নকুড় বেজার হলেন। মামী সমেত বাকি সব্বাই আনন্দে ডগমগ। ভাগ্যিস পোঁটলাটা বাড়ীতে রয়ে গেছল, তাই না প্রত্যেকের ঝকমকে নতুন সোয়েটার হল!

মোকামে পৌঁছানোর পরের দিন থানাদার ইনস্পেক্টার দিলদার খাঁ যখন হুর্বোধ্য টেলিগ্রামটা নকুড় মামার হাতে তুলে দিল তখন তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। 'রিকোয়েস্ট সার্চ এন. সি. ঘোষ বেঙ্গলী টুরিস্ট উইথ ফ্যামিলি লাইকলী স্টেয়িং ইন সাম বেঙ্গলী হোটেল। মিসেস ঘোষেস ক্যাট ট্র্যাপ্‌ড্‌ ইন আলমীরা। কি নট ফাউণ্ড। আস্‌ক্‌ঃ ঘোষ রিং ব্যাক নেবার চৌধুরী অ্যাট ক্যালকাটা টু সিকস থ্রি এইট সেভেন সেভেন ফর ক্লারিফিকেসান—অফিস বস।'

শেষ পর্যন্ত দেড়শ টাকা খসিয়ে ট্রাঙ্ককল করে জানা গেল ব্যাপারটা। মামীর আদরের বেড়াল আইসক্রীম গোছগাছ করার ফাঁকে ঢুকেছিল গদরেজের আলমারীতে ইঁদুর কি আরশুলার খোঁজে। হন্তদন্ত মামী আলমারীতে ডবল চাবী লাগিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন সিমলা। চাবী তাঁর আঁচলে। এদিকে ঠিকে ঝি গিরিবালার মারফৎ খবর পৌঁছালো পাশের বাড়ীর ভূতনাথ চৌধুরী এবং অফিসের বড়কর্তা মিস্টার পাকড়াশী হয়ে ক্যালকাটা পুলিস, সোসাইটি ফর প্রিভেনসান অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমাল, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সারভিস, পাঞ্জাব পুলিস। হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার! খাঁকি পোশাক পরা দিলদার খাঁকে দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন গ্রীন হোটেলের মালিক। ভাগাতে চাইলেন নকুড়কে, 'যান মশাই, ফিরেই যান। ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করেন, মা ষষ্ঠীর বাহন বলে কথা!' পুলিসকে তাঁর বেজায় ভয়। ওঁর সঙ্গে গলা মেলালেন মামী, 'আইসক্রীম'-এর বিপদ! অতএব ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান। সাতাশী ঘণ্টার মাথায় আলমারী খুলে হতভাগা বেড়ালকে উদ্ধার করলেন নকুড় মামা। ইতিমধ্যে তাঁর পকেট থেকে গলে গেছে সাড়ে তেরোশো টাকার মত।

বেড়াতে যাবার আগে বাড়ীর ব্যাপারে কিছু কৃত্য আছে। যেমন, বিয়ের আগে গায়ে হলুদ। যেমন ধরুন (১) বাড়ীর এক সেট চাবী পড়শী বন্ধু/আত্মীয়কে দিয়ে যাবেন। (২) চাবী কোথায় রইল সেই খবরটি অন্ততঃ দুজন প্রতিবেশীকে দিয়ে যাবেন। (৩) সম্ভব হলে আপনার ভ্রমণসূচী, সেখানকার সম্ভাব্য আস্তানার নাম-ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরও রেখে যাবেন। (৪) বাড়ীর ইলেকট্রিক মেন স্যুইচ অফ করে দেবেন বা ফিউজগুলি খুলে রেখে যাবেন। (৫) সোনা-রূপোর গয়না ও বাসন ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকিয়ে দেবেন। (৬) গ্যাস সিলিণ্ডারের ভ্যালব খুব ভাল করে দেখে নেবেন—সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা চাই-ই। (৭) জলের লাইনের চাবিও বন্ধ করে যাবেন। তাতে পাইপ ভাল থাকবে, মরচে পড়বে না। (৮) ফ্রিজ বন্ধ করে যাবেন, স্টেবিলাইজার থাকলেও। (৯) বরফ গলিয়ে ট্রের জল ফেলে শুকনো ফ্রিজের ডালা অল্প খুলে রেখে যাবেন। (১০) খুলে দিয়ে যাবেন রেডিয়ো ও টিভির এরিয়াল প্লাগও। (১১) ফুলদানীগুলি খালি করে রেখে যাবেন। (১২) কাচার কাপড় ভেজানো অবস্থায় না থেকে যায়। (১৩) বাড়ীতে আত্মীয় আশ্রিত বা চাকর কেউ থেকে গেলে তার হাতে যথেষ্ট পয়সা দিয়ে যাবেন যাতে আপনার ট্যুর ১/১½ সপ্তাহ দীর্ঘায়িত হলেও তাকে অনাহারে থাকতে না হয়। (১৪) পোষা কুকুর, বেড়াল, রঙ্গীন মাছের যত্ন নেবার ব্যবস্থা করে যেতে হবে। হয় তাদের কোন বন্ধুর জিম্মা করে দিন, নয়ত বাড়ীতেই কোন চাকরের দায়িত্বে রেখে, জীবপ্রেমী ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীকে তদারকি করতে বলে যান। (১৫) পচে যেতে পারে এমন খাবার বা কাঁচা মাছ, মাংস, দই, দুধ, আনাজপাতি খেয়ে বিলিয়ে শেষ করে যান। (১৬) ৮/১০ দিনের প্রোগ্রাম হলে ডিমগুলিকে চুনের জলে ডুবিয়ে রেখে যেতে পারেন, ভালই থাকবে। (১৭) সর্বশেষে, দুবেলার মত রেশন—চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ, ডাল, তেল, পাঁপড়, চাল, আলু, পেঁয়াজ, আচার, সস্, নুন, শুকনো লঙ্কা, পাঁচফোড়ন, মসলা, কেরোসিন ভর্তি স্টোভ বা কাঠ কয়লার ইকমিক কুকার সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে যান যাতে এসেই বাজার ছুটতে বা প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হতে না হয়।

এই সব বিলিব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করে কম্মে গেলে আপনাকে নকুড় মামার মত বিপাকে পড়তে হবে না।

● আসবাবের ঘরোয়া পরিচর্যা

আসবাব তৈরি হতে পারে কাঠ, কাঁচ, লোহা, সানমাইকা, চামড়া, রেক্সিন বা কাপড়ের। এদের তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে রাখতে প্রয়োজন রকমারী কলাকৌশলের। যেমন—

কাঠ : পালিশের সময় রং লাগাবার ন্যাকড়াটি পুরানো নাইলন মোজায় পুরে নিন। পালিশের চেকনাই বাড়বে। পরে এক কোট মোম লাগিয়ে নেবেন। পালিশের আয়ু হবে ডবল। মেঝেতে লাগাবার ওয়াক্স-পলিশ বা মুচীদের মোমও ব্যবহার করতে পারেন। আঁচড়ানো দাগের উপর ব্রাউনট্যান জুতোর কালি লেপে শুকানোর পর নরম কাপড় দিয়ে ঘষে নিন। দাগ মিলিয়ে যেতে বাধ্য। সাদা দাগ মেটাতে মিহি নুন ও স্যালাড অয়েলের মিশ্রণ অথবা ভিজে ন্যাকড়ায় সাদা টুথপেস্ট মাখিয়ে ব্যবহার করবেন। সিগারেটের কালচে পোড়া দাগ তুলতে পয়লা আধপোড়া কাঠের গুঁড়ো ছুরি দিয়ে চেঁচে মোম দিয়ে গর্তটুকু ভরুন। তারপর মেয়নীজ সস লেপে আধ ঘন্টা বাদ সস মুছে মোম ঘষে দিন।

কাঁচ : আঁচড়ের ছোটখাট দাগ মেলাতে টুথপেস্ট অতি চমৎকার। পালিশ করতে কাঁচের গায়ে পাতিলেবুর রস মাখিয়ে পুরানো খবর কাগজের দলা পাকিয়ে তাই দিয়ে ঘষে ঘষে পালিশ করুন। কাঁচ হীরের মত চমকে উঠবে।

লোহা : অল্প-সল্প মরচে চেঁচে তোলার সময় ও মোছার সময় সামান্য তারপিন তেল ব্যবহার করুন। মরচে আর দেখা দেবে না।

সানমাইকা : পালিশ করবেন খাবার সোডা দিয়ে ঘষে।

চামড়া/রেক্সিন : ভিজে কাপড় দিয়ে ধুলো মুছবেন। একভাগ সাদা ভিনিগারে দুভাগ তিষির তেল মিশিয়ে চামড়ার গায়ে মাখিয়ে নরম কাপড় দিয়ে জোরে জোরে ঘষুন। মাসে একবার। চামড়া ও রেক্সিনের গদী নতুনের মত থাকবে বছরের পর বছর।

ফেব্রিক : র‍্যাক, কার্পেট, পর্দা বা কাপড়ের সোফাকভার থেকে তেল-ঘি-হলুদের দাগ ওঠাতে শেভিং ক্রীম খুব কাজের। কালি-আলকাতরা-পেন্টের দাগ ওঠাতে দু চামচ ডিটার্জেন্ট পাউডারের সাথে তিন চামচ ভিনিগার ও এক গ্লাস জল মিশিয়ে ধুয়ে ফেলুন ও টিস্যু পেপারের রুমাল চেপে জায়গাটা শুকিয়ে ফেলুন। আইডিনের ছাপ পড়লে সাদা জিঙ্ক হোয়াইট বা অ্যামোনিয়া লেপে দিয়ে কাচুন। লিপস্টিকের দাগে প্রথম সজোরে পাউরুটি ঘষে দিন। কাচবার আগে লেবুর রস বা অ্যালকোহল মাখিয়ে সাবান জলে কাচবেন। ভাল ফল পাবেন। কাদার শুকনো ছাপ বুরুষ ঘষে হালকা করে নিন; তারপর কাটা আলুর টুকরো দাগের উপর ঘষে ঠাণ্ডা জলে কাচুন—দাগ উঠে যাবে। মরচে বা জং-এর দাগ পুরানো হলে তোলা মুস্কিল। টাটকা দাগলাগা অংশটুকু ফুটন্ত জলপাত্রের উপর ধরে নুন ও লেবুর রস মাখিয়ে দিন। কাজ না হলে দাগের উপর ক্রীম অব্ টার্টার দিয়ে লেপে গরম জলে কাচুন। মাস্টার্ড

বা কাসুন্দীর ছোপ তুলতে হলে দাগের উপর গ্লিসারিন বা ডিটার্জেন্ট পাউডার ছড়িয়ে আধ ঘণ্টা পর সাবান জলে কাচতে হবে। তামাক বা সবজির কষের বেলাও কাচবার আধ ঘণ্টা আগে দাগী অংশগুলো ভিজিয়ে নিতে হবে তবে গ্লিসারিনে নয়, অ্যালকোহলে। চায়ের দাগের বেলা ভিজান কাপড় কাচা সোডা বা ফুটন্ত গরম জলে। বমি বা পেচ্ছাপের দাগ তুলতেও একই পদ্ধতি। দাগ পুরানো হলে সোডা-গরম জলে সবটা নাও উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে দু কাপ জলে এক চামচ সাদা ভিনিগার মিশিয়ে দাগের উপর ছড়িয়ে দিন। শুকিয়ে এলে কাচবেন। নেল পালিশ লেগে গেলে দাগের উল্টো পিঠে: নেল পালিশ রিমুভার লাগাতে হবে। তবে কাপড়ের এক কোণে আগে-ভাগে রিমুভার লাগিয়ে দেখে নিন কাপড় বা তার রং জ্বলে যাচ্ছে কিনা। পোড়ার দাগ তোলা শক্ত। কাপড় পুড়ে না গিয়ে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডে দাগটুকু ভিজিয়ে সোডার জলে কেচে নিন। দাগ ফিকে হয়ে আসবে।

খাটের নেয়ার মাঝে-সাঝে ফুটন্ত নুন জলে ধুয়ে নিলে হলদে ময়লাটে হতে পারে না। ফার্নিচারের চাপে কার্পেটের রোঁয়া বসে গিয়ে গর্ত গর্ত দাগ হয়ে যায়। প্রতি গর্তে ৪/৫ চামচ জল ঢেলে আধ ঘণ্টা বাদে ভিজে তোয়ালে চাপা দিয়ে গরম ইস্ত্রি চালান ও শেষে চিরুনি বা কড়া বুরুষ দিয়ে আঁচড়ে দিন। বসা রোঁয়া ফের খাড়া হয়ে যাবে।

● অবাক জলপান

Manually operated Non-repumping Domestic Soluble Iron and Manganese Removing gravity filter cum waste-proof Hydrant!

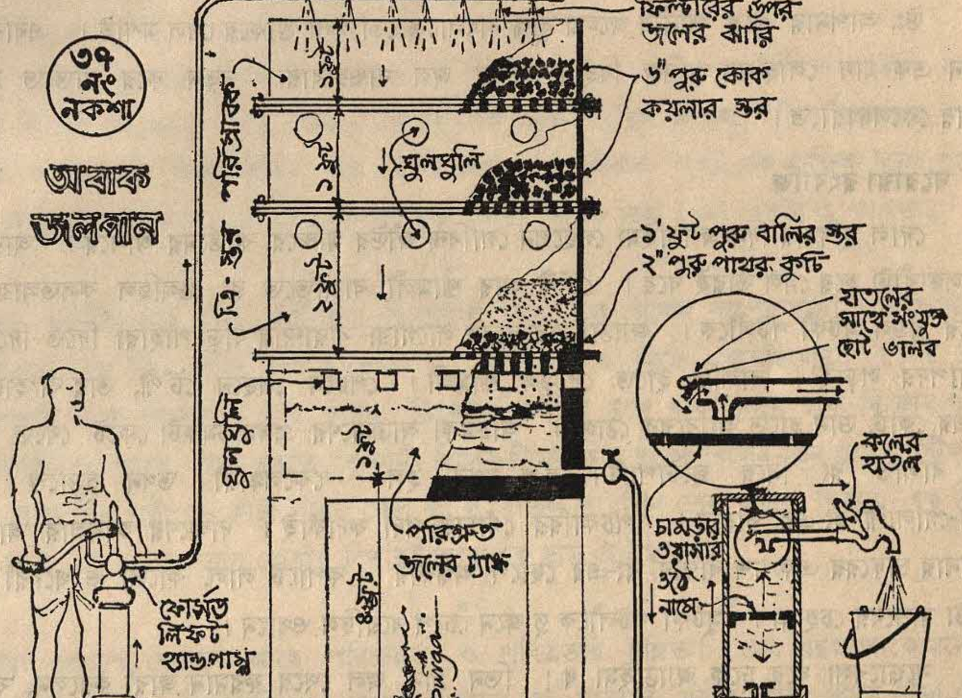
এঁজ্ঞে ?

মনুষ্য-চালিত অপুনরুত্তোলক ঘরোয়া দ্রবণীয় লৌহ ও ম্যাংগানিজ অপসারণকারী অভিকর্ষীয় পরিস্রাবক সহ জল-অপচয়-রোধক কল !

আরো বড় রকমের এঁজ্ঞে ???

নাঃ, ব্যাপারটা খোলসা করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গসহ পূর্ব ভারতের ভূতল জলে দ্রবীভূত লোহা ও ম্যাংগানিজের পরিমাণ বেশ বেশী রকম। ফলে টিউবওয়েলের জল খেতে বোদা বোদা লাগে, কাপড় কাচলে তা লালচে হয়ে যায়। সুপেয় পানীয় জলে সর্বাধিক ০.৩ গ্রাম লোহা ও ০.১ গ্রাম ম্যাংগানিজ প্রতি লিটারে থাকতে পারে। বাড়তি খনিজ পদার্থকে সহজে এবং সস্তায় সরাবার এক ফিল্টার বেড বা পরিস্রাবক আবিষ্কার করেছেন নাগপুরের কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য-প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থা (**৩৭নং নকশা**)। টিউবওয়েল থেকে জল পাম্প করে সরাসরি ছিটিয়ে দেওয়া হয় ত্রি-স্তর ফিল্টারের মাথায় যার উপরের দুটি ছ ইঞ্চি পুরু স্তর এক ইঞ্চি মাপের কোক কয়লার টুকরো সাজিয়ে তৈরী। নিচের স্তরটি দু ইঞ্চি পুরু পাথরকুচির উপর এক ফুট পুরু বালির স্তর। অভিকর্ষের (অভিকর্ষ বোঝেন না ? তুর মশাই ! আমরা যাকে বাংলায় বলি মাধ্যাকর্ষণ সেই গ্রাভিটির পরিভাষা হল অভিকর্ষ। কি বল্লেন ? মাধ্যাকর্ষণ

বল্লেই চুকে যায় ? আজ্ঞে না ! প্রযুক্তিগত আলোচনায় পরিভাষা ব্যবহার না করলে পাণ্ডিত্যের মহাভারতটি অশুদ্ধ হয়ে যায় !) টানে জল ওই সব স্তরের মধ্য দিয়ে এসে জমা হয় নিচের ঘুলঘুলি যুক্ত ট্যাঙ্কে। দ্রবীভূত লোহা ও ম্যাংগানিজ জারণ প্রক্রিয়ায় (ফের পরিভাষা—অক্সিডেশানের) থেকে যায় ফিল্টার বেড়ে।



টিউবওয়েল • গ্র্যাভিটি ফিলটার • অপচয় রোধক কল

এই সুপেয় জলের যাতে অযথা অপচয় না হয় তার জন্য যোধপুরের পূর্তবিদ পি. এস. রাজবংশী উদ্ভাবন করেছেন এক অপচয় রোধক কল (**৩৭নং নকশা**) যার ফাঁপা কাণ্ডের ভিতর একটি চামড়ার ফুটো ফুটো ওয়াশার আছে যা জলের কল খুল্লেই জলের তোড়ে উপরে উঠে এসে চেপে ধরে নলের মুখটা। ইতিমধ্যে অবশ্য কল থেকে কুড়ি লিটার মত জল বেরিয়ে গেছে। চামড়ার ওয়াশার নলের মুখ চেপে ধরায় কলের মুখ দিয়ে জল পড়া বন্ধ হয়ে যায় কল খোলা থাকা সত্ত্বেও। কলের হাতলটি ঘুরিয়ে কল বন্ধ করলেই হাতলের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ছোট্ট ভাল্ব খুলে গিয়ে নলের ভিতর জল ঢোকে কিন্তু হাতল ঘোরানো থাকায় সে জল মুখ দিয়ে পড়তে পারে না। এ দিকে নলের মুখে আটকানো ওয়াসারের দু পিঠেই জলের চাপ সমান হওয়ায় ওয়াশারটি নলের মুখ থেকে খসে পড়ে ও অভিকর্ষের টানে (আবার পরিভাষা,

আমাদের আলোচনাটি নিঃসন্দেহে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ !!) নিচের দিকে নামতে শুরু করে। তার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে নিচের জল উপরে উঠে নিম্নগামী ওয়াশারের অধঃপতনকে সুগম করে। আবার যদি কলের হাতলটি ঘোরান ফের একদমে ২০ লিটার জল ঢালার পর ওয়াশারের উর্ধ্বগমন-অধঃপতন পুনরাভিনীত হবে। আপনি যে কলটি খুলে রেখে অফিস পাড়ি দেবেন আর কল বেয়ে জল পড়ে ট্যাঙ্কটি শূন্যগর্ভ হবে···সেটির আর উপায় রইল না।

উঃ, আপনার গৃহে পানীয় জলের বুদ্ধি বাৎলাতে তো গলা শুকিয়ে গেল মশাই। এবার উদ্যোগ করুন এক গ্লাস লৌহ-ম্যাংগানিজ বিহীন সুপেয় জল খাওয়াবার। নতুন করে মাততে হবে এক রংদার কেলেঙ্কারীতে।

● **ঘরোয়া রংবাজি**

দোল পূর্ণিমার দিন জ্যাঠাইমা গেছলেন গোবিন্দ জীউর মন্দিরে, কীর্তনের আসরে। আর তখনই কেলেঙ্কারীটা হয়ে গেল তাঁরই ঘরে। টেঁপী আর শ্যামলী বালতিতে রং গুলছিল কলতলায়। হঠাৎ নজরে পড়ল মুটকী পটলীকে। জ্যাঠাইমার ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বড়ি পাহারা দিতে দিতে পড়ছে 'নিরাপদর লড়াই'। বালতি হাতে দৌড়ল শ্যামলী। পেছনে পেছনে টেঁপী, তার বাঁ'হাতে বাঁদুরে রং-এর কৌট, ডান হাতে আবিরের ঠোঙ্গা। আচমকা আক্রমণের প্রথম চমকটা কেটে যেতে শুরু হল এক বালতি রং নিয়ে হুটোপাটি। হুঁশ যখন হল······কেলেঙ্কারী তখন চূড়ান্তে। দেয়ালে লাল-গোলাপী রং-এর বাহার। পিচকারির খোঁচায় পর্দা ফর্দাফাঁই। দক্ষিণের জানলার আধখানা ও বিছানার চাদরের একপাশ বাঁদুরে রং-এর ছোপে অন্ধকার। কপাটে লাল, কালো ও খয়েরী মেশানো একটা মানুষের চেহারা। মুটকী পটলীকে দু জনে চেপে ধরেছিল ওখানে।

সন্ধ্যেবেলা ঘরে ঢুকে জ্যাঠাইমা থ! তিন গ্লাস জল খেয়ে ফরমান জারী করলেন, 'যতদিন না মিস্ত্রি ডাকিয়ে ঘরে কলি ফিরিয়ে ঠিক আগেকার মত করা হচ্ছে, ততদিন তিন জনেরই ম্যাটিনী শো, নুন শো মায় শনি রবির টিভি প্রোগ্রাম সব বন্ধ।' টেঁপীরা কেঁদে পড়ল বৌদির কাছে। বৌদি ডেকে পাঠালেন ছোটভাই অলকেন্দুকে, পি. ডাবলু. ডির পেন্টিং কন্ট্রাক্টার। তিন মহিলাই খুশী। ইদানীং তারা আলাদা আলাদা ভাবে অলকেন্দুকে নিয়ে ছোটখাট কাঁচা মিঠে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে কিনা!

* * *

প্লাস্টার করা দেয়ালে ৪ রকমে রং করা যায়—(ক) জলে গোলা চুন রং বা লাইম কালার, (খ) দু রকমের ডিসটেম্পার—এক. সস্তা, ড্রাই বা জলে গোলা এবং দুই. দামী, অয়েল বাউণ্ড বা তেলে গোলা, (গ) জলে গোলা সিমেন্ট পেন্ট এবং (ঘ) প্লাস্টিক ইমালসান (বাইরের দেয়ালের জন্য প্লাস্টিক অ্যাক্রালিক)। নতুন দেয়ালে আপনার খুশীমত রং বাছাই করুন। পুরানো দেয়ালে যে রং আছে, তা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। চুন রং সবচেয়ে সস্তা। সবচেয়ে দামী প্লাস্টিক, রং-এর খোলতাইও চুনের

থেকে অনেক বেশী। সিমেন্ট পেন্ট সাধারণতঃ বাইরের দেয়ালে ব্যবহার্য তবে আমার সোনারপুরের বাড়ীতে ড্যাম্প লাগা নোনা দেয়ালের ভিতর পিঠে লাগিয়ে খুব ভাল ফল পেয়েছি।

কাঠের রং তিন রকম—সিন্থেটিক এনামেল (কমদামী, চকচকে) ; প্লাস্টিক ইমালসান বা বাইরের জন্য প্লাস্টিক অ্যাক্রালিক (দামে বেশী, চকচক করে না) এবং রেডি মিক্সড অয়েল পেন্ট (সবচেয়ে সস্তা)। এছাড়া আছে প্রাইমার বা এক রকম সস্তা তেল রং যা প্রথমে দেয়ালে এক পোঁছ মাখিয়ে নিলে পরের কোটে দামী রং খাবে কম। খরচা বাঁচবে।

রং করার সাজ-সরঞ্জাম বলতে লাগবে—(১) তিনটে ব্রাস ; ১ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি ও ৬ ইঞ্চি চওড়া (চাঁদনীতে কিনতে পাবেন), (২) জিরো নম্বরের এক ডজন শিরিষ কাগজ, (৩) ন্যাকড়ার তাল, (৪) একটা চওড়া মাথা ভোঁতা ছুরি, (৫) একটা গুলন, (৬) ফুটরুল, (৭) এক বাণ্ডিল টনের সুতো, (৮) ৭/৮ লছি নারকেল দড়ি, (৯) রং গোলার ড্রাম গোটা তিনেক এবং (১০) একটা স্ক্রু ড্রাইভার।

* * *

চৈত্র সংক্রান্তি পার হতে জ্যাঠাইমা অ্যানুয়াল ট্যুরে চলে গেলেন বাপের বাড়ী আর অলকেন্দু তিন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিল ধর্মতলায়। বৌদিও সংগ নিতে চেয়েছিলেন। টেঁপী তাঁর বাতের দোহাই দিয়ে থামালো। তার ভাষায়, 'ত্রিশোর্ধ্ব বৌদির সঙ্গে থাকা মানে হাফ দি ফান গন।' দরজা, জানলা ও ঘরের মাপ বলতে দোকানী হিসেব-টিসেব করে ওদের দিলেন তিন ড্রাম প্লাস্টিক রং, খানিকটা গোল্ড সিল পুটিং, দু কৌটা মিক্সড তেল রং, দু বোতল তারপিন তেল অর্থাৎ থিনার, এক শিশি লিনসিড তেল, এক বোতল ব্রাস ধোবার স্পিরিট আর এক ড্রাম প্রাইমার।

* * *

সাদা ধপধপে দেয়ালে আছে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ইঙ্গিত। তবে ঘরগুলোকে মনে হয় একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। মনস্তত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন রং মানুষের মনকে নানা ভাবে নাড়া দেয়। রক্ত গোলাপ মন মাতায় অথচ রক্তের লালে গা গুলোয়। সেই প্রতিক্রিয়াকে বিশেষণ করে আমরা রং-এর নামকরণ করি ধপধপে সাদা, কটকটে লাল, নরম সবুজ, বিশ্রী বেগুনী, সমুদ্র সুনীল, ফ্যাকাশে হলদে, ক্যাঁটক্যাটে কমলা। কোন রং মনকে রূপে রসে মাতায়, কোন রং তাকে বিরূপ করে তোলে। ঘর সাজানোর পর্বে রং-এর এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাঝেই লুকিয়ে আছে রং নির্বাচনের প্রধান ফরমূলা। কোন্ রং-এর কি প্রতিক্রিয়া সে বিষয়ে ১ম খণ্ডের ১১শ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। সে সবের পুনরুল্লেখ না করে বলতে পারি তরুণেরা চড়া রং (লাল, হলদে, কমলা) ও গাঢ় শেড পছন্দ করেন। বয়স্ক মানুষ চান ঠাণ্ডা রং (নীল, সবুজ, মভ)। মেয়েদের পছন্দ গোলাপী, হালকা নীল, কচি কলাপাতা, মভ ও সোনালীর ফিকে শেড। ছেলেরা চায় বাদামী ও বিস্কুট রং-এর নানা শেড বা লাল-নীল-গোলাপী-ধান রং-এর গাঢ় শেড। কমলাও তাদের পছন্দসই। জঠরের শিশুকে অভ্যর্থনা জানাতে এক দম্পতি স্থির করেছিলেন ছেলে হলে তাঁদের শোবার ঘরটির রং করা হবে গাঢ় নীল আর মেয়ে হলে

হালকা গোলাপী। বেচারাদের ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছিল নার্সের প্রসবান্ত ঘোষণা, 'আপনাদের যমজ সন্তান হয়েছে······একটি ছেলে, একটি মেয়ে !'

* * *

জ্যাঠাইমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অলকেন্দু বেছে নিল সিলিং-এর জন্য আকাশী নীল, দেয়ালে মাঝারী নীল এবং দরজা, জানলা, গ্রীলের জন্য গাঢ় নীল যা হাত লেগে ময়লা হয় না। ছোট এক ডিবে ধান রং কেনা হল পশ্চিমের কুলুঙ্গীটার জন্য—যেখানে থাকেন কালো মার্বেলের গোবিন্দ জীউ।

* * *

একই রং দিনের আলোয় এক রকম দেখায়, রাত্রে ইলেকট্রিক আলোয় অন্য রকম। আপনি চান ঘরের একটা দেয়াল হবে হালকা সবুজ বা ক্রীম। ঘরে নীল ফ্লুরোসেন্ট বাতি থাকলে রাত্রে এই দেয়াল দেখাবে গাঢ় সবুজ বা হলদেটে সবুজ। এক রকম গোলাপী ফ্লুরোসেন্ট টিউব হয়, তাতে করে এই দেয়ালকেই দেখাবে প্রাণহীন ছাই ছাই রং-এর। আজকাল যে সব রঙ্গীন বাল্ব বেরিয়েছে, তার আলোয় ফল হবে আরো উদ্ভট। হালকা গোলাপী দেয়াল হলদে বাল্বে দেখাবে কমলা, নীল বাল্বে হালকা বেগুনী, সবুজ বাল্বে মরা মরা ছাই রং !

* * *

টেঁপী হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসল। বাঁশ নেই, ভারা হবে কেমন করে? অলকেন্দু মিষ্টি হেসে (তিন জনের মতেই অমন হাসি শুধু অলকেন্দুই হাসতে পারে) অভয় দিল, ঘরের ভিতরটা রং করতে ভারার দরকার নেই। জ্যাঠাইয়ের বিছানা গুটিয়ে চৌকির উপর অষুধ রাখার মজবুত টেবিলটা চড়ানো হল। টেবিলের উপর তাঁর গীতা পাঠের জলচৌকি। তার উপর শ্যামলী। ছুরি দিয়ে এবড়ো খেবড়ো প্লাস্টার চেঁচে প্লেন করল। তারপর দড়ির লচ্ছি ঘষে পুরানো রং সব তুলে ফেললো। শ্যামলী হাঁফিয়ে পড়তে চড়ল অলকেন্দু। তার পর টেঁপী। ফের শ্যামলী। অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে পটলীকে আর ওঠানো হল না। আসবাব আর মেঝের উপর পুরানো খবর কাগজ পেতে ইটের টুকরো চাপা দিয়ে রাখছিল সে, যাতে ধুলো পড়ে নোংরা না হয়। দড়ির পর ঘষা হচ্ছিল শিরিষ কাগজ দিয়ে। ফুটো গর্ত কিছুতেই প্লেন হচ্ছিল না। ছুরি দিয়ে পুটিং ভর্তি করে সেগুলোকে সমান করল অলকেন্দু। শুকিয়ে গেলে শিরিষ কাগজ ঘষে দেয়ালের সাথে বেমালুম মিশিয়ে দেওয়া হল পুটিং। জল-ন্যাকড়া বুলিয়ে দেয়াল, সিলিং, দরজা, জানলা, গ্রীলের ধুলো মুছে প্রাইমার লাগানো হল। ছাদে দেয়ালে সিমেন্ট প্রাইমার। দরজা, জানলা, গ্রীলে তেল প্রাইমার। ব্রাস চালানো হল পাশাপাশি। তারপর নিচে থেকে উপরে। ব্রাসে খুব অল্প রং নেওয়া হচ্ছিল যাতে দেয়াল বেয়ে গড়িয়ে না পড়ে। পটলীর উপর ভার ছিল রোজ কাজের শেষে ব্রাসগুলো স্পিরিটে ধুয়ে টাঙ্গিয়ে রাখা।

প্রাইমার মাখানোর পর আর এক দফা শিরিষ কাগজ ঘষে, শুকনো মোলায়েম কাপড় দিয়ে মুছে শুরু হল আসল রং-এর কাজ। লাগাবার আগে অবশ্য দোকানীর দেখিয়ে দেওয়া মাপ মাফিক জিনজিড

তেল মিশিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কারণ লিনসিড মেশানো রং চটপট শুকোয়। দেয়াল ও ছাদে লাগানো হল প্লাস্টিক পেন্ট ; দরজায়, জানলায় গাঢ় নীল তেল রং। লাগাতে লাগাতে রং ঘন হয়ে এলে প্রয়োজন মাফিক তারপিন তেল মিশিয়ে পাতলা করে নিচ্ছিল অলকেন্দু। দু রকম পেন্টই দু বার করে লাগানো হল। শেষ হলে ঘরটিকে মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নপুরী। দশ দিনের মাথায় জ্যাঠাইমা ফিরে এসে হতবাক ! নিজের মালার ঝুলি থেকে পয়সা বার করে অলকেন্দুকে দিয়েছেন ম্যাটিনী শোতে ড্রেস সারকেলের চারখানা টিকিট আনতে। টেঁপী, পটলী আর শ্যামলী জ্যাঠাইয়ের দেওয়া পয়সায় ঝালমুড়ি খেতে খেতে চাপা স্বরে তর্ক করছে—সিনেমায় কে কে অলকেন্দুর দু পাশে বসবে ! বোধ হয় টস হবে।

(৭ম অধ্যায় শেষ করার আগে একটি মার্জনা ভিক্ষার প্রয়োজন আছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো ভাবে ১৯৮১-৮২ সালের মধ্যে মাসিক 'মালিনী' পত্রিকা ও দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুনর্লিখিত হলেও কোন কোন পাঠক-পাঠিকার কাছে হয়ত তা পৌনঃপুনিকতার দোষে দুষ্ট বলে মনে হতে পারে। চর্বিত চর্বণের কোন ইচ্ছা না থাকলেও বইয়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা চিন্তা করেই সেগুলি এখানে সংযোজিত হয়েছে। কারু খারাপ লাগলে আগে ভাগেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি।)

'শরীরের নাম মহাশয়। যা সওয়াইবে তাই স'য়' ॥

তবু মাঝে মাঝে বিগড়োয় শরীরের কলকব্জা। দরকার পড়ে কোব্‌রেজ, বদ্যির। অল্পসল্পে ম্যানেজ করে দেন টোটকা জানা ঠানদি। ঘর সংসারেরও একই কথা। থেকে থেকে কলকব্জা বিগড়োলে ডাক পড়ে প্লাম্বার, ইলেকট্রিসিয়ান, মেকানিকের। তবে অল্পসল্প হলে ? নিজেই ম্যানেজ করে নিতে পারবেন যদি জানা থাকে 'ঘরোয়া টোটকা'......

৮ ঘরোয়া টোটকা

'মডার্ন টাইমস' সিনেমায় চার্লি চ্যাপলিন আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার বিপদের এক নিপুণ ছবি এঁকেছেন। গ্যাজেট-সর্বস্ব জীবনে নায়ক ঘুম থেকে উঠে নিজেকে সমর্পণ করে অটোমেটিক যন্ত্র বাহিনীর হাতে। একটা বোতাম টিপলে বেরিয়ে আসে টুথব্রাস সমন্বিত মেকানিক্যাল হাত। নায়কের দায়িত্ব শুধু সুইচ টেপার। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, মুখ ধোয়ানো, চুল আঁচড়ানোর দায়িত্ব যন্ত্রের। সেই একই ভাবে মেসিন থেকেই বেরিয়ে আসে কফি, প্রাতরাশ, হাত ধোবার ফিঙ্গার-ব্যোল।

তারপর একদিন অটোমেটিক গ্যাজেট বিগড়ে বসল। টুথব্রাসের বদলে ঘুঁষি পাকানো যান্ত্রিক হাত থেবড়ে দিয়ে গেল নাকটা। প্রাতরাশ খাবার বদলে নায়ককে খেতে হল যান্ত্রিক চড়। কফির বদলে মাথার উপর থেকে শাওয়ারের মাধ্যমে ঝরে পড়ল ফুটন্ত জল। বেচারা নায়কের দুর্দশার একশেষ। অ্যামেরিকান মানুষের প্রতি পদে পদে গ্যাজেটের সাহায্য নেওয়ার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করতে চার্লি তুলেছিলেন মডার্ন টাইমস। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা অ্যামেরিকানদের মত যন্ত্র-সর্বস্ব হয়ে উঠিনি এখনো। তবু নেই নেই করেও বেশ কিছু গ্যাজেট ঢুকে পড়েছে আমাদের গৃহে। তার কিছু কিছু মাঝে মাঝে অচল হয়ে আমাদের চার্লির মত না হোক, অল্পস্বল্প বিপদে ফেলে বইকি! এর বেশীর ভাগই কিন্তু খুব সহজে মেরামত করা যায় যদি ওই যন্ত্র সম্পর্কে ঘটে থাকে সামান্য ব্যবহারিক জ্ঞান আর হাতে থাকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, একটা কাটিং প্লায়ার্স, একটা অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ ও একটি টেস্টিং ল্যাম্প। পরের কয়েক পাতা এই রকম গোটা কুড়ি গ্যাজেটের ব্যবহারিক জ্ঞান নিয়ে করা হয়েছে একটা প্রাথমিক আলোচনা। এই আলোচনার সঙ্গে যদি আপনি একটু হাতে-কলমে মেরামতির চেষ্টা করেন এই সব সহজ যন্ত্রের, খুব শীঘ্রই নিজের সাফল্য দেখে আপনি নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠবেন।

যান্ত্রিক বিপর্যয় হয় দু রকম—(১) জ্যাম হয়ে, মরচে পড়ে বা যন্ত্রাংশের স্থানচ্যুতিতে সৃষ্ট মেকানিক্যাল দোষ এবং (২) তার খুলে গিয়ে বা লিক করে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার দরুন উদ্ভূত ইলেকট্রিক্যাল দোষ। আমরা এখানে প্রথমে কিছু কিছু ঘরোয়া যন্ত্রাংশের সম্ভাব্য মেকানিক্যাল দোষ সম্বন্ধে আলোচনা করব। তারপর বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের সম্ভাব্য ইলেকট্রিক্যাল দোষ নিয়ে পড়ব।

(১) জলের কল ও ভাল্ব

জলের কল হচ্ছে নল বেয়ে পড়া জলের ধারাকে বন্ধ করার ভালব বা কপাটিকা। ছবিতে (**৩৮নং নকশা**) দেখুন, কলের একটি খুঁটি ও তৎসংলগ্ন চাকার সাথে নাট দিয়ে আটকানো আছে একটি চামড়ার ওয়াশার। কলের হাতলটি ঘোরালে মাথার পিস্টনটি খুঁটির উপর চাপ দেয় ও চামড়ার ওয়াশারটি জল কপাটের উপর চেপে বসে নলের বহমান জলধারাকে বন্ধ করে দেয়। এইভাবে ক্রমাগত খোলা-

বন্ধ করার ফলে, কালক্রমে চামড়ার ওয়াশারটি জলের ঘর্ষণে ক্ষয়ে আসে ও হাতল পুরোপুরি আঁট করে বন্ধ করা সত্ত্বেও ক্ষয়ে যাওয়া ওয়াশারের পাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরিয়ে এসে কলের মুখ বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে। একেই আমরা বলি কল লিক করা। প্রতিকার হিসাবে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে হাতলের স্ক্রুটি আলগা করুন। হাতল ও মাথার পিস্টনটি আলাদা হয়ে যাবে। এবার পিস্টনের কলারটি ঘুরিয়ে কলের মাথার প্যাঁচ থেকে আলগা করে দিলে পিস্টনটিও কলের মাথা থেকে আলাদা করে নেওয়া যাবে। কলের মাথাটিও প্যাঁচ ঘোরালে কলের গা (ছবিতে কালো রং করে দেখানো) থেকে খুলে আসবে। নাট, ওয়াশার ও চাকা সমেত খুঁটিটিও বেরিয়ে আসবে। এরপর নাট খুলে ওয়াশার পাল্টে দিলেই সব রকম লিক বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক সময় খুঁটির নাটটি জলের সেডিমেন্ট ও মরচেতে এমন ভাবে জ্যাম হয়ে যায় যে তেলে ভিজিয়েও তা খোলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে অম্লাত্মক জলে চাকা সমেত খুঁটিটাও ক্ষয়ে জখম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে ওয়াশারের সাথে খুঁটি-চাকাও পাল্টে নেবেন। জখম খুঁটি-চাকাটি দোকানীকে দেখালে সে একই মাপের নতুন পার্টস দিয়ে দেবে। কলের কাজ করবার আগে সরবরাহ পাইপের ভাল্‌ব বন্ধ করে নল জলশূন্য করে নেবেন। নতুন ওয়াশার যাতে ঠিক পুরানো ওয়াশারের মাপের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। ওয়াশারের দাম সামান্যই, বাড়ীতে নানান মাপের এক বাক্স ওয়াশার এনে রেখে দিলে কাজের সময় সঠিক মাপের ওয়াশার পেতে অসুবিধা হবে না। প্যাঁচ খুলতে কলের যন্ত্রাংশের উপর রেঞ্চ আটকানোর সময় কলের গায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে তার উপর থেকে রেঞ্চ চেপে ধরলে রেঞ্চের আঘাতে কলের গায়ে চোট হবে না।

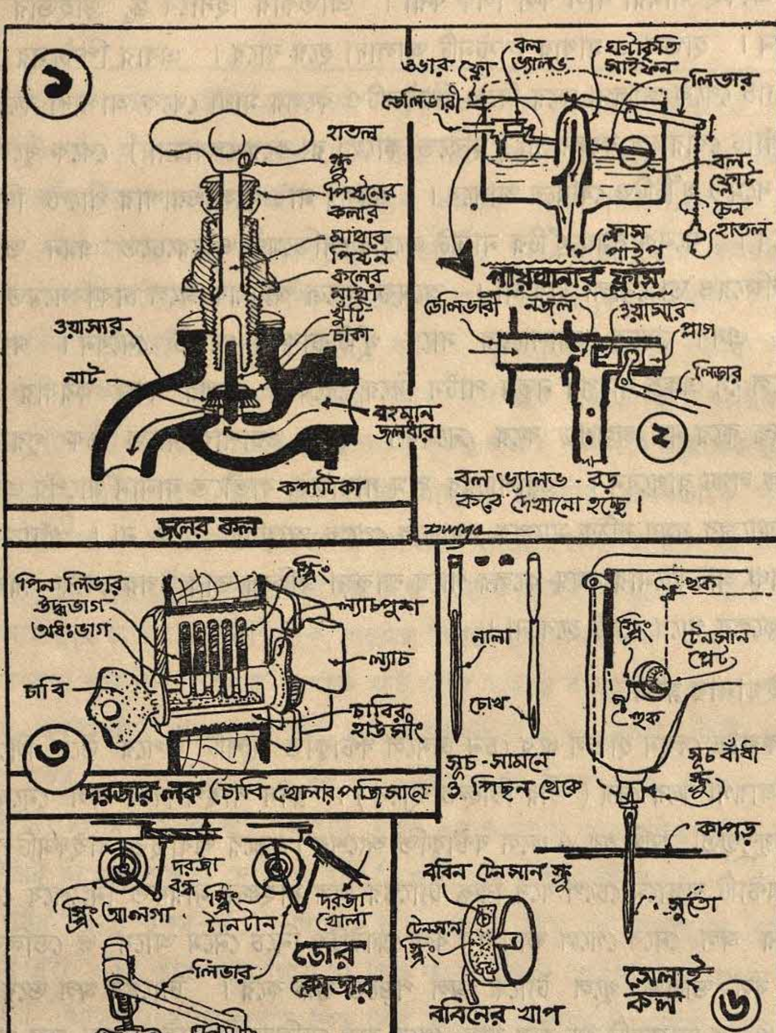
(২) পাইখানার ফ্লাস

৩৮নং নকশায় দেখুন হাতল ধরে চেন টানলে ঘণ্টাকৃতি অংশটি উপরে উঠে গিয়ে ফ্লাস পাইপ দিয়ে জল যাবার জায়গা করে দেয় (তীর চিহ্নিত স্থানে)। ফ্লাস পাইপ দিয়ে জল নেবে যাবার টানে ভ্যাকুয়েম বা বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হয় ও ফলে ঘণ্টাকৃতি অংশের ভিতরে অবস্থিত সাইফনটি চালু হয়ে যায়। চেন ছেড়ে দিলে ঘণ্টাটি স্বস্থানে চেপে বসে কিন্তু ট্যাঙ্কের জল সাইফন মারফত নিঃশেষে নেবে যায় ফ্লাস পাইপে। ট্যাঙ্কের জল নেবে গেলে ভাসমান বল ফ্লোটটিও নিচে নেমে আসে ও ডেলিভারী পাইপের মুখে ফিট করা বল ভাল্‌ভ খুলে ট্যাঙ্কে জল পড়তে শুরু করে। ট্যাঙ্কের জল ভরে এলে ভাসমান বলটি উঠে আসে ও বল ভাল্‌ভটি বন্ধ হয়ে যায়, থেমে যায় ডেলিভারী পাইপ দিয়ে জল পড়া।

ঘণ্টাটি যেখানে ট্যাঙ্কের ভিতর বসে সেখানে কাদা ময়লা জমলে ঘণ্টাটি বসা অবস্থাতেও তার তলা দিয়ে জল লিক করে চলে যাবে ফ্লাস পাইপে। ট্যাঙ্ক কখনই ভরবে না। ডেলিভারী পাইপের ভাল্‌ভ বন্ধ করে, লিভারের হুক থেকে উপর দিকে তুলে নিন ঘণ্টাটি। তারপর তারের ব্রাস ঘষে পরিষ্কার করে ফেলুন ট্যাঙ্কটি। জল ভরে এক-আধবার ফ্লাস করে নেবেন ব্যবহারের আগে।

বল ভাল্‌ভটি ফ্লাসের মূল যন্ত্রাংশ। এটি সচরাচর খারাপ হয় না। তবে এর সঙ্গে একটি ছোট লিভার দিয়ে আটকানো বল ফ্লোটটি ছেঁদা হয়ে তার ভিতর জল ঢুকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বলটি

আর ভাসমান থাকবে না ও ভাল্‌ভটি বন্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে বলটি পাল্টে দেওয়ায়ই যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় ফিটিং-এর দোষে বলটি পুরোপুরি ভাসমান থাকলেও বল ভাল্‌ভটি সম্পূর্ণ বন্ধ



৩৮নং নকশা

হয় না। এক্ষেত্রে সংযোগকারী লিভারটিকে হাতের চাপে একটু তলার দিকে বেঁকিয়ে দিন ; দেখবেন ভাসমান বল ভাল্‌ভটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারছে।

(৬) দরজার লক

ফের নজর করুন ৩৮নং নকশায়। লাগানো অবস্থায় লকের ভিতর ৪/৫টি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পিন-লিভার (ছবিতে যার দুটি অংশ উর্ধ্বভাগ ও অধঃভাগ যথাক্রমে কালো ও সাদা রং-এ দেখানো হয়েছে) স্প্রীং-এর চাপে বেলনাকৃতি (cylindrical) চাবির হাউসীং-এর ছিদ্রগুলির মধ্যে ঢুকে থাকে। ফলে হাউসীং ও হাউসীং সংলগ্ন ল্যাচ-পুশ যথাস্থানে অনড় হয়ে থাকে। চাবি ঢোকালে চাবির ঘাটের ঠেলায় লিভারের অধঃভাগগুলি এমন স্থানে এসে দাঁড়ায় যে উর্ধ্বভাগগুলি ঠিক হাউসীং-এর বাইরে চলে যায়। এখন চাবি ঘোরালে হাউসীং ও ল্যাচপুশ অনায়াসে ঘুরে যাবে ও ল্যাচ ভিতরে ঢুকে গিয়ে লক খুলে যাবে।

খোলা-বন্ধ করার ব্যাপারটা আয়াস-সাধ্য হয়ে উঠতে পারে ৩টি কারণে ঃ

(ক) ভিতরের কলকব্জা শুকিয়ে ধুলো বালিতে ভিতরটা জ্যাম হয়ে গেলে। এক্ষেত্রে চাবির ফুটো দিয়ে কয়েক ফোঁটা তেল ঢেলে দিলেই তালা আবার সহজ সচল হয়ে উঠবে।

(খ) ভিতরের স্প্রীং-এর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে গেলে। এক্ষেত্রে তালার উপরের স্ক্রু আটকানো ডালাটা খুলে অকেজো স্প্রীংগুলি পাল্টে ফেলতে হবে ও ভিতরে তেল দিয়ে ডালাটি স্ক্রু দিয়ে পুনরায় আটকে দিতে হবে।

(গ) চাবির ঘাট ক্ষয়ে বা বেঁকে নষ্ট হয়ে গেলে। এক্ষেত্রে ভাঙ্গা ক্ষয়া চাবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খারিজ করে ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবস্থা করা উচিত। তা না হলে এ ধরনের চাবি পুরো দামী তালাটাকেই এমন ভাবে জখম করে দিতে পারে যে তাকে আর কোন দিনই মেরামত করতে পারবেন না।

(৭) ডোর ক্লোজার

খোলা দরজাকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ করা হচ্ছে ডোর ক্লোজারের কাজ। দু রকমের ডোর ক্লোজার হয়—এক, স্প্রীং দেওয়া ; দুই, তেলের শক্‌-অ্যাবজরভার যুক্ত। স্প্রীং ক্লোজারে দরজা খুললেই পাকানো স্প্রীং-এ টান ধরে ও দরজা ছেড়ে দিলেই স্প্রীং-এর চাপে তা বন্ধ হয়ে যায় (**৩৮নং নকশা**)। শক-অ্যাবজরভার টাইপে তেল ভর্তি সিলিণ্ডারের ভিতর একটি পিস্টন থাকে (**৩৮নং নকশা**)। পিস্টনটি লিভার ও পাকানো স্প্রীং-এর মারফত দরজা খোলা বন্ধ করার তালে এগোয় পেছোয়। তবে পিস্টনটি তেলের মধ্যে ডুবে থাকায় তেল ঠেলে এগুতে-পেছুতে তার গতি হ্রাস পায়। এই মৃদু গতির দরুন খোলা দরজাটি দড়াম করে বন্ধ না হয়ে, বন্ধ হয় আস্তে আস্তে। স্প্রীং টাইপ ক্লোজারে স্প্রীংটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে যার দরুন ক্লোজারের স্বয়ংক্রিয়তাও আর থাকবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় পুরানো স্প্রীংটি বাতিল করে নতুন স্প্রীং লাগানো।

শক-অ্যাবজরভার টাইপের স্প্রীং অত্যন্ত দীর্ঘায়ু হয়। মাঝে-মধ্যে লিভারের স্ক্রু আলগা হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন গোলমাল হয় না সাধারণতঃ। আলগা স্ক্রু টাইট করার সময় ক্লোজারের মাথার

চাকাটি পুরোপুরি ঢিলা করে দেবেন নতুবা লিভারটি বেঁকে থাকা অবস্থায় স্ক্রু তেরছা ভাবে টাইট হবে। নিয়মমাফিক স্ক্রু আঁটবার পর চাকাটি স্বস্থানে টাইট করে দিতে হয়। সিলিণ্ডারের তেল শীতকালে ঘন ও গ্রীষ্মকালে পাতলা হয়ে যায়। ফলে ক্লোজারটি শীতকালে খুব আস্তে ও গ্রীষ্মকালে খুব দ্রুত কাজ করে। এই গতি কমানো-বাড়ানোর জন্য ক্লোজারের তলার দিকে একটি গতিনির্ধারক স্ক্রু থাকে। এটিকে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিয়ে শীতকালে স্পীড বাড়াতে ও গ্রীষ্মকালে স্পীড কমাতে পারেন।

(৫) ইনভারটারের ব্যাটারী

আজকাল লোডশেডিং-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে ঘরে ঘরে চালু হয়েছে ইনভারটার যন্ত্র। যার তিনটি অংশ—(১) একটি স্টেপডাউন ট্রান্সফরমার বা চার্জার যার কাজ হল ইলেকট্রিক লাইন থেকে ২২০ ভোল্টের বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে তাকে ১২ বা ২৪ ভোল্টের বিদ্যুতে পরিণত করা ও তা স্টোরেজ ব্যাটারীতে পাঠানো ; (২) ১২ বা ২৪ ভোল্টের এক বা জোড়া অ্যাসিডযুক্ত স্টোরেজ ব্যাটারী (যা মোটরগাড়ীতে ব্যবহার করা হয়) যাতে চার্জার প্রেরিত বিদ্যুৎটি জমা রাখা হয় যতক্ষণ না লোডশেডিং হচ্ছে এবং (৩) ইনভারটার বা স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার যা লোডশেডিং-এর সময় ব্যাটারী থেকে ১২ বা ২৪ ভোল্টের বিদ্যুৎ আহরণ করে তাকে ২২০ ভোল্টে পরিণত করবে এবং ইলেকট্রিক লাইনে তাকে পাঠিয়ে দেবে আলো জ্বালাতে, ফ্যান চালাতে। ট্রান্সফরমার দুটি শক্তসমর্থ যন্ত্র—একমাত্র ফিউজ পুড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ঝামেলা হয় না। ফিউজ সম্বন্ধে অন্যত্র বলেছি। এখানে শুধু বলা হল ব্যাটারীর তত্ত্বাবধান।

ব্যাটারীর ভোল্টেজ হিসাবে ৬টি থেকে ১২টি সেল থাকে। একে বলা হয় অ্যাকুমুলেটার। প্রতি সেলে অ্যাসিডে ডোবানো অবস্থায় দুটি ইলেকট্রড থাকে—পজেটিভ ও নেগেটিভ। এক কথায় বলতে গেলে এই সেলগুলির মধ্যেই জমা থাকে বিদ্যুৎ। অ্যাকুমুলেটারের ভিতরে থাকে জল দিয়ে পাতলা করা সালফিউরিক অ্যাসিড। জমা বিদ্যুৎ কমে এলে এই অ্যাসিডের জলীয়াংশ বেড়ে যায়, বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়লে অ্যাসিডের আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যায়। বাড়ীতে একটি সাধারণ রবারের বাল্‌বওয়ালা হাইড্রোমিটার (দাম ২০ টাকার মত) রাখবেন, এতে অ্যাসিডের আপেক্ষিক ঘনত্ব সরাসরি মাপতে পারবেন ও জানতে পারবেন জমা বিদ্যুতের অবস্থা।

হাইড্রোমিটারের রিডিং		**সেলে জমা বিদ্যুতের অবস্থা**
১·২৮	—	সেল পরিপূর্ণভাবে চার্জ হয়ে রয়েছে।
১·২৫	—	সেলের চার্জ মোটামুটি ভালই।
১·২২	—	সেলের চার্জ কমের দিকে।
১·১৫	—	সেল ডিসচার্জ হয়ে এসেছে।

ব্যাটারীর আয়ু বাড়াতে হলে চার দফা যত্ন নিতে হবে। (১) হাইড্রোমিটারের রিডিং ১·২০ এর নিচে নামলেই ব্যাটারী চার্জ করে নিতে হবে ; (২) ব্যাটারীর টার্মিনাল দুটি ও কেব্‌লের ক্ল্যাম্পের

ভিতর-বাহির নিয়মিত শিরিষ কাগজ ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে কোন রকম সালফার জমা হয়ে না থাকে। টার্মিনালের সঙ্গে ক্ল্যাম্পগুলি স্ক্রু এঁটে খুব শক্ত করে ফিট করতে হবে ; (৩) সেলগুলির ভিতর অ্যাসিড শুকিয়ে গেলে তা ডিসটিল্ড ওয়াটার দিয়ে এমন ভাবে পূরণ করে দিতে হবে যাতে ইলেকট্রোডের পাতগুলি অ্যাসিডে ডুবে থাকে এবং (৪) ব্যাটারীর টার্মিনাল ও কেবল ক্ল্যাম্পগুলি পাতলা করে গ্রীজ মাখিয়ে রাখতে হবে যাতে জলীয় আবহাওয়ায় তার উপর সালফার জমতে না পারে।

(৬) সেলাই কল

সাবেকী হাতে ঘোরানো কল ছাড়াও এখন বাজার সরগরম করে রেখেছে বৈদ্যুতিক কল। বৈদ্যুতিক কলের আর সব কিছুই সাবেকী কলের মডেলে কেবল ঘোরাবার ব্যাপারটুকু সম্পন্ন হয় একটি মোটরের সাহায্যে যার স্পীড বা গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আছে একটি পায়ে চালানো সুইচ গীয়ার। মেসিনের বিদ্যুৎ প্রবাহ খোলা ও বন্ধ করার সুইচ ও এইটিই।

সেলাই কলের ছোটখাট দোষত্রুটি আপনি বাড়ীতে মেরামত করে নিতে পারেন। যেমন, ইনডিকেটার আলো জ্বলছে অথচ মোটর ঘুরছে না। প্রথমেই পরীক্ষা করতে হবে সুইচটিকে। বিভিন্ন স্পীডে মোটর ঘোরাবার জন্য পাখার রেগুলেটারের মত কলের সুইচেও একটি বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন রেজিস্টেন্স আছে যার মাধ্যমে সুইচের পজেটিভ ও নেগেটিভের যোগাযোগ হয়। এই রেজিস্টেন্সটিকে বাদ দিয়ে একটি ঢাকা (Insulated) তারের সাহায্যে পজেটিভ ও নেগেটিভকে যোগ করলে যদি মোটর চলতে শুরু করে তা হলে বুঝতে হবে দোষী হচ্ছে সুইচের রেজিস্টেন্সটি। সেটিকে বদলাতে হবে। কিন্তু এভাবেও যদি মোটর না ঘোরে তা হলে দেখতে হবে মোটরের ব্রাশ জোড়া ক্ষয়ে গেছে কিনা। ব্রাশ ক্ষয়ে গিয়ে থাকলে তা পাল্টে দিতে হবে। যদি ব্রাশও অক্ষত থাকে তা হলে বুঝতে হবে মোটরের ভিতরে যে সূক্ষ্ম তার জড়ানো আছে গোলমাল সেখানেই। এবার আপনাকে মিস্ত্রি ডাকতে হবেই আর নয়ত মেসিন নিয়ে যেতে হবে কোম্পানীর ঘরে।

মেসিনে চলবার সময় যদি একটা গোঁ গোঁ করে শব্দ হয়, থামিয়ে দিয়ে মোটর পুলিটা হাতে করে ঘুরিয়ে দিন। যদি দেখেন হঠাৎ ঘচ্ করে থেমে যাচ্ছে বুঝবেন মোটরের বেয়ারিং শুকিয়ে গেছে। তেল বা গ্রীজ দেওয়া জরুরী। অনেক সময় দেখা যায় মোটর ঘুরছে অথচ বেল্ট স্লিপ করে গিয়ে মেসিন ঘুরছে না। বেল্টে তেল-কালি-গ্রীজ লেগে সেটা পিচ্ছিল হয়ে গেলে এরকম গণ্ডগোল দেখা দেয়। পেট্রল ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে বেল্টটাকে মুছে শুকিয়ে নিন। বেল্টটি চলতে চলতে যদি বড় ও ঢিলা হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তা বদলে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মেসিন ঠিক মত চললেও অনেক সময় সেলাইয়ের গণ্ডগোল দেখা দেয়। যদি দেখেন উপরের সুতোটা ঢিলা থেকে যাচ্ছে তা হলে সুতোর টান বাড়াতে, ছুচের সুতো যে টেনসান স্প্রীং-এর মারফৎ এসেছে (**৩৮নং নকশা**) তাকে ঘুরিয়ে আঁট করে দিতে হবে। তলার সুতো যদি ঢিলা থেকে যায় তা হলে ববিনের গায়ে লাগানো টেনসান স্প্রীংটি স্ক্রু এঁটে টাইট করে দিতে হবে। আর এক রকম

দোষ দেখা দিতে পারে, তা হল মাঝে মাঝে সেলাইয়ের বাঁধন ফসকে যাওয়া। ভোঁতা বা বাঁকা ছুচ অথবা উল্টোভাবে পরানো ছুচের দরুনই এরকম খাপছাড়া সেলাই হয়। ছুঁচ বদলী করুন বা সঠিক ভাবে ক্ল্যাম্পেয় সঙ্গে আটকান (**৩৮নং নকশা**)। সেলাইয়ের পাগলামী সেরে যাবে।

বিভিন্ন যন্ত্রের মেকানিক্যাল গণ্ডগোল নিয়ে আলোচনার পর এবার আমরা পর্যবেক্ষণ করব নানান ঘরোয়া ইলেকট্রিক মেরামতির। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা যাক ঃ

(৭) ফিউজ পাল্টানো

আলো, পাখা, ফ্রিজ বা টিভি চালাতে ঠিক যতটুকু বিদ্যুৎ তারের ভিতর দিয়ে যাওয়া দরকার, কোন কারণে তার থেকে বেশী যেতে শুরু করলেই ফিউজের তারটি (এটি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়) বেশী বিদ্যুতের উত্তাপে পুড়ে গিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়। নিজে শহীদ হয়ে বাঁচায় অপর প্রান্তের ফ্রিজ, টিভি, হিটার প্রভৃতি দামী যন্ত্রপাতিকে। ফিউজ না থাকলে বিদ্যুতাধিক্যে ওগুলিতে আগুন লাগা খুবই সম্ভব। তিন মাপের ফিউজের তার হয়—৫, ১০ ও ১৫ অ্যাম্পিয়ার। ফিউজে এই তারই লাগাবেন, অন্য কোন মোটা তার কদাচ নয়।

প্রথমে মেন সুইচ (**৩৯নং নকশা**) বন্ধ করুন। যন্ত্রের প্লাগ খুলে দিন। মেন সুইচ বা ডিস্ট্রিবিউসান বোর্ড থেকে ফিউজ খুলে পরীক্ষা করুন। গলা-আধপোড়া তার ও ঝলসানো দাগ পরিষ্কার করে ফিউজ ক্ল্যাম্পের মাঝে নতুন তার লাগান (**৩৯নং নকশা**)। খুব ঢিলাও নয়, খুব আঁটও নয়। মেন সুইচের ফিউজ হলে ১০ বা ১৫ সাইজ এবং ডিস্ট্রিবিউসান বোর্ড বা যন্ত্রের নিজস্ব ফিউজ হলে ৫ সাইজের তার লাগাবেন। বড় প্লাগ, ফ্রিজ বা কুকিং রেঞ্জ হলে ১৫ সাইজ। ফিউজে যদি কোন সুড়ঙ্গ বা গর্ত থাকে তার মধ্যে দিয়ে পরাতে হবে ফিউজ তার। ফিউজ যথাস্থানে আটকে মেন সুইচ দিন ও প্লাগ লাগিয়ে যন্ত্র চালু করুন।

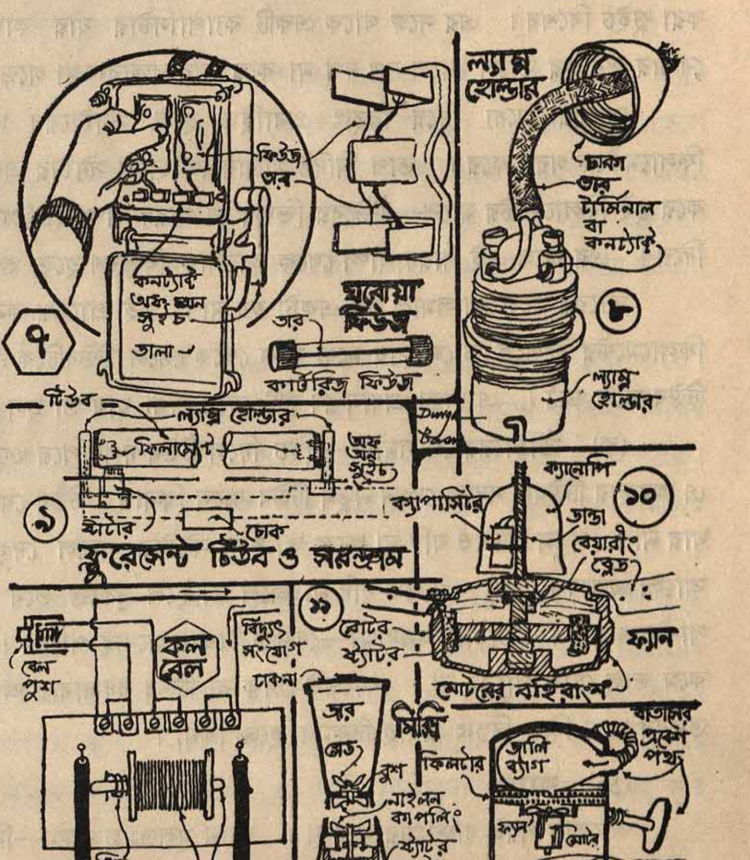
আজকাল টিভি, রেডিয়ো, রেকর্ড প্লেয়ার বা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারে একরকম কাচের টিউবে তার ফিট করা কার্টরিজ ফিউজ (**৩৯নং নকশা**) লাগানো হয়, যা বাজারে ফিট করা অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। কিনে এনে ফিউজের নির্দিষ্ট ক্ল্যাম্পের মধ্যে গুঁজে দিলেই আপনার দায় খালাস। এই ফিউজ অপেক্ষাকৃত দামী। কাজেই দোকান থেকে কেনবার সময় দোকানের লাইনে লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নেবেন যে ভিতরের তারটি অটুট আছে, ঠিক মত কাজ করছে।

(৮) ল্যাম্প জ্বালানো

আলো জ্বালানোর সরঞ্জাম তিনটি—(১) একটি ইলেকট্রিক বাল্ব, **(২)** তার সমেত একটি বাল্ব হোল্ডার (**৩৯নং নকশা**) ও (৩) একটি অফ-অন সুইচ। এছাড়া অবশ্য আলোকে প্রয়োজনীয় দিকে প্রতিফলিত ও ফোকাস করতে এবং তার ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে প্রয়োজন একটি উপযুক্ত রিফ্লেক্টার।

আপনার ঘরের টেবিল ল্যাম্প বা ব্র্যাকেটের আলোটি যদি সুইচ দিলেও না জ্বলে ওঠে তা হলে বুঝতে হবে—(ক) বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে। বালবের কাঁচটি স্বচ্ছ হলে ফিউজড বাল্বে ভিতরের

ফিলামেণ্টটি ভাঙ্গা টুকরো টুকরো অবস্থায় দেখা যাবে। স্বচ্ছ না হলে অন্য কোন হোল্ডারে লাগিয়ে দেখে নিন বাল্বটি জ্বলছে কিনা। (খ) বাল্ব ভাল থাকলে গণ্ডগোল থাকতে পারে প্লাগে বা তারে। কোন কারণে ভেঙ্গে সরে গিয়ে প্লাগের কনট্যাক্ট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্ল্যাগ পাল্টানই যুক্তিযুক্ত। তারের কোন অংশে যদি ছিঁড়ে কেটে গিয়ে থাকে, ওই অংশ বাদ দিয়ে তারটি পুনর্ব্যবহার করা চলতে পারে। (গ) গোলমালটা প্লাগে না হয়ে সুইচে হয়ে থাকতে পারে। যদি দেখা যায় সুইচের পজেটিভ-নেগেটিভের মধ্যে একটি তার দিয়ে যুক্ত করে দিলে আলো জ্বলে উঠছে, বুঝতে হবে সুইচটি বিগড়েছে। সুইচে একটু তেল দিয়ে তার স্প্রীংগুলিকে সচল করে তুলুন। তাতেও যদি ফল না হয়, বদলে দিন সুইচটি। (ঘ) অনেক সময় ল্যাম্প বা বাল্ব হোল্ডারটি অকেজো হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মেন অফ করে বা আলোর প্লাগটি বেস থেকে খুলে দিয়ে হোল্ডারের গা থেকে বাল্ব ও



রিফ্লেক্টার অপসারণ করুন। ল্যাম্প হোল্ডারের স্ক্রু এঁটে তারগুলিকে ভাল করে আটকে দিন। হোল্ডারের ভিতরে যে স্প্রীং জোড়া আছে তার স্থিতিস্থাপকতা সঠিক মাত্রায় আছে কিনা পরীক্ষা করে নিন। এগুলি যথাযথ থাকলে বাল্ব ঠিকই জ্বলে উঠবে।

(৯) ফ্লুরেসেন্ট টিউব

আর এক রকম বাতি বা বৈদ্যুতিক আলো হল টিউব (৩৯নং নকশা)। টিউবের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম হল—(এক) চোক, যার কাজ হল তিন দফা ঃ টিউবের দুই প্রান্তের ফিলামেণ্টকে জ্বলবার আগে

যথেষ্ট উত্তপ্ত করে তোলা, আলোক বিচ্ছুরণের জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজনীয় উচ্চ ভোল্টেজ সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণকে একটা নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ রাখা। (দুই) স্টাটার—যেটি একটি সিল করা সুইচ বিশেষ। এর সঙ্গে থাকে একটি ক্যাপাসিটার যার কাজ রেডিয়ো চালালে যাতে বাতিটি বেতার তরঙ্গের তালে তালে দপ দপ না করে তার রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, স্টাটারের মারফৎ বিদ্যুৎ টিউবের দুই প্রান্তের ফিলামেণ্টকে গরম করে। তাপ নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছালে স্টাটার এক ঝলক উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ সংযোগ করে দুই ফিলামেণ্টের মাঝে—টিউবের ভিতর যে পারদ বাষ্প (Mercury Vapour) আছে তার মধ্যে দিয়ে। এর ফলে এই পারদ বাষ্প থেকে আলোক বিচ্ছুরণ হতে শুরু করে।

তারের মধ্যে গোলমাল বড় একটা হয় না। দুই প্রান্তের কনট্যাক্ট বা বৈদ্যুতিক সংযোগবিন্দু ও ফিলামেণ্টের ইলেক্ট্রোড জোড়ার মধ্যে ফাঁক থেকে গেলে টিউবটিকে হোল্ডারের মধ্যে সামান্য ঘুরিয়ে দিলেই টিউব জ্বলে ওঠে। এ ছাড়া প্রধান যে দুটি দোষ দেখা যায় তা হল :

(ক) স্টাটারের গোলমাল—সুইচ দিলে টিউব দপদপিয়ে ওঠে কিন্তু আলোকিত হয়ে ওঠে না—এ অবস্থায় টিউবটি বদলে দেখুন নতুন টিউব জ্বলে কিনা। টিউব কেটে গেলে তা আর মেরামত করা যায় না। নতুন টিউবও যদি না জ্বলে তা হলে স্টাটার বদলে দেখুন। স্টাটারে ত্রুটি থাকলে এবার আলো জ্বলবে। (খ) এতেও যদি না জ্বলে তা হলে বুঝতে হবে চোক খারাপ হয়ে গেছে। চোক পাল্টাতে হবে। স্টাটার অল্পদামী—দেড় দু টাকার মধ্যেই পাবেন। চোকের দাম বেশী, ১৮/২০ টাকার কমে ভাল চোক পাবেন না। কাজেই চোক বা টিউব বদলাবার আগে লাইন টেস্টার দিয়ে দেখে নেবেন তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঠিকমত হচ্ছে কিনা।

(১০) ফ্যান

আলোর পরই বাতাসের ব্যবস্থা। ফ্যান মূলতঃ দু রকম—সিলিং ফ্যান ও টেবিল ফ্যান। যে কোন ফ্যানই হচ্ছে একটি সিঙ্গল ফেজ (২২০ ভোল্ট) ইনডাকসান মোটর যা ক্যাপাসিটার যোগে চালু করলে সিলিং ফ্যানের বেলায় মোটরের বাহিরের অংশ (রোটর) এবং টেবিল ফ্যানের বেলায় মোটরের ভিতরের অংশ (স্ট্যাটর)-টি ঘুরতে শুরু করে এবং সেই সঙ্গে ঘোরাতে শুরু করে ব্লেড তিনটিকে। ফ্যানের সঙ্গে থাকে একটি রেগুলেটার যার সুইচ বিভিন্ন ঘাটে দিয়ে চালালে বিভিন্ন শক্তির রেজিস্টেন্সের মারফৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। রেজিস্টেন্সের তারতম্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের ভোল্টেজের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে ও ফ্যানে গতিও সেই মত নিয়ন্ত্রিত হয় (**৩৯নং নকশা**)।

ফ্যানের সম্ভাব্য ত্রুটি ও তার মেরামতি :

(ক) **পাখা ঘুরছে না :** একটা কাঠি দিয়ে ব্লেড ঘুরিয়ে দিয়ে সুইচ দিন। পাখা যদি ঘুরতে শুরু করে বুঝবেন ডাণ্ডার গায়ে লাগানো স্টার্টিং ক্যাপাসিটারটি (ক্যানোপি দিয়ে ঢাকা থাকে) খারাপ হয়ে গেছে। ওটি বদলে দিন। যদি ঘুরিয়ে দিলেও না চালু হয় তা হলে টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করে

দেখুন রেগুলেটারের মধ্য দিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কিনা। রেগুলেটারের যোগাযোগও যদি ঠিক থাকে তাহলে বুঝতে হবে গণ্ডগোলটি হয়েছে মোটরের ভিতর। এটি আপনার ঘরোয়া টোটকা চিকিৎসার আওতার বাইরে। অতএব মিস্ত্রি ডাকুন।

(খ) **বাতাস কম দিচ্ছে :** রেগুলেটারটি হয়ত কম স্পিডের ঘরে আটকে গেছে। তার জ্যাম ছাড়িয়ে তেল দিয়ে দিন। না হলে ক্ষয়ে যাওয়া বেয়ারীং-এর দরুনও হতে পারে। বেয়ারীং ক্ষয়ে গেলে পাখা চলার সময় ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হবে। বেয়ারীং শুকিয়ে গেলেও এরকম আওয়াজ বেরুবে। বেয়ারীং হাউসীং-এর ভিতর ভাল করে গ্রীজ মাখিয়ে এবং প্রয়োজন হলে বেয়ারীং পাল্টিয়ে দিয়ে পাখা চালান। এতেও যদি স্পিড না বাড়ে বুঝতে হবে স্টার্টারের কনডেনসারটি লিক করছে। এক্ষেত্রে স্টার্টার পাল্টানোই একমাত্র চিকিৎসা।

(গ) **পাখায় খুব শব্দ হচ্ছে :** শুকনো বেয়ারীং ছাড়াও বেঁকে বসা ব্লেডও আসামী হতে পারে। ব্লেড যাতে সঠিক ভাবে হাওয়া কাটতে পারে তার জন্য তার নির্দিষ্ট ঢালে ব্লেড বসাতে অভিজ্ঞ মিস্ত্রির সাহায্য নিন। টেবিল ফ্যানের ক্ষেত্রে তারের গার্ডটি ঢিলা হয়ে গেলেও বেয়াড়া শব্দ হতে পারে। গার্ডের ক্ল্যাম্প বা তার স্ক্রু আঁটার সময় ঢিলা হয়ে যাওয়া অংশ দুটির মাঝে একটি রবার বা চামড়ার প্যাকিং দিয়ে নিলে ফল ভাল হয়।

(ঘ) **টেবিল ফ্যান অসিলেট করছে না :** দামী টেবিল ফ্যানে গিয়ারের ব্যবস্থা থাকে যাতে নিজের অক্ষে পাখা এপাশ থেকে ওপাশ মুখ ঘুরিয়ে সব দিকে বাতাস ছড়িয়ে দিতে পারে। গিয়ারের দাঁত ভেঙ্গে গেলে বা গিয়ারের চাকাগুলি ঠিকমত খাপ খাইয়ে না বসালে এ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে। দাঁত ভেঙ্গে গেলে গিয়ারের চাকা পাল্টাতে হবে। গ্রীজ মাখিয়ে সঠিক ভাবে দাঁতে দাঁত মিলিয়ে বসাবেন। প্রয়োজনে প্রথম বার মিস্ত্রির সাহায্য নেবেন ও তিনি কিভাবে ফিট করেন, নজর করে দেখে নেবেন।

এরপর আমরা গোটা কয়েক ঘরোয়া যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করব। এর প্রথম দুটিতে ফ্যানের মতই রয়েছে মোটরের ব্যবহার।

(১১) মিক্সি

ইলেকট্রিক মিক্সির দুটি অংশ—নিচে সুইচসহ সাইড প্লেট থেকে ঝোলানো মোটর। উপরে ঢাকনাওয়ালা স্বচ্ছ জার। জারের ভিতর থাকে এক জোড়া ব্লেড যাকে নিচের মোটরটি ঘোরাতে পারে নাইলন কাপলিং মারফৎ। এই ব্লেড জোড়া জারের ভিতর রাখা খাদ্য ও মসলাকে মেশায়, গুঁড়ো করে (**৩৯নং নকশা**)।

মিক্সি অচল হলে প্রথমে পরীক্ষা করুন তার, প্লাগ ও সকেটের কানেকসানগুলি। আলগা থাকলে আঁট করুন। লাইন টেস্টার দিয়ে দেখুন মোটরের ব্রাসে বিদ্যুৎ আসছে কিনা। ব্রাস ও কম্যুটেটার পরিষ্কার করুন, ক্ষয়ে যাওয়া ব্রাস বদলে ফেলুন ও ব্রাসের স্প্রীংগুলির স্থিতিস্থাপকতা বজায়

আছে কিনা দেখে নিন। মোটরের তারের কয়েল কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়েছে কিনা দেখতে এই তারের মাথায় জুড়ে দিন একটি সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প। আলো জ্বললে কয়েল বহাল তবিয়ৎ—না জ্বললে নতুন কয়েল জড়াতে দোকানে পাঠাতে হবে। অনেক সময় রোটর ও স্ট্যাটার পরস্পরের গায়ে ঠেকে গিয়ে জ্যাম হয়ে যেতে পারে। সাইড প্লেটের নাটগুলি একটু ঢিলা করে স্ট্যাটারটিকে সোজা করে বসিয়ে দিলে রোটর আলাদা হয়ে যাবে। জারের তলার বুশের ছিদ্রটি চলতে চলতে বড় হয়ে গেলে জারের খাদ্য-পানীয় নিচে মোটরের ভিতর পড়তে পারে। এতে মোটর জ্বলে যাবে। কাজেই মাঝে মধ্যে বুশ পাল্টে নেওয়া খুব জরুরী।

(১২) ভ্যাকুয়েম ক্লীনার

ভ্যাকুয়েম ক্লীনারের মূলতঃ চারটি অংশ—মোটর, ফ্যান, ধুলো যাওয়ার ডাক্ট বা পাইপ এবং একটি সচ্ছিদ্র প্লাস্টিকের ব্যাগ। ভ্যাকুয়েম ক্লীনারে দু জাতের দোষ দেখা দিতে পারে—পাইপে বা ব্যাগে ময়লা জমার দরুন ধুলো-বালি শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া বা বৈদ্যুতিক অংশে গোলমালের দরুন মেসিন বন্ধ হয়ে যাওয়া (**২৯নং নকশা**) প্রথম ক্ষেত্রে, মোটর চালু অবস্থায় হোসপাইপটি হাওয়া ঢোকার পথ থেকে খুলে নিয়ে হাওয়া বেরোবার মুখে ফিট করে নিন। উল্টো দিক থেকে হাওয়ার চাপ আসায় পাইপে জমা ধুলো-ময়লা চট করে পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটা মোটা লম্বা তার দু ভাঁজ করে দোমড়ানো মাথাটা পাইপের ভিতর ঢুকিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করলেও পাইপের ময়লা ঝরে যাবে। ব্যাগটি ময়লায় পূর্ণ হয়ে এলেও ক্লীনারের কার্যক্ষমতা কমে আসে। এক্ষেত্রে ব্যাগটিকে খালি করে সাবান জলে ধুয়ে নিন। ব্যাগ ও মোটর ফ্যান ইউনিটের মাঝে একটি সূক্ষ্ম ধুলো আটকানো ফিল্টার থাকে। ভাল কাজ পেতে এটিও পরিষ্কার থাকা দরকার। হোস পাইপটি জড়ানো তারের বাঁধনে মজবুত থাকে। তারের প্যাঁচ খুলে গেলে পাইপটি বদলে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বৈদ্যুতিক গোলযোগ হলে যথারীতি টেস্টার দিয়ে সুইচ-তার-প্লাগ পরীক্ষা করে নিয়ে নজর করুন মোটরের দিকে। তার স্প্রীং, ব্রাস, কম্যুটেটর ময়লা থাকলে পরিষ্কার করুন ; ক্ষয়া ভাঙ্গা দেখলে বদলে দিন। মোটরের সাথে ফ্যানের কাপলিং আলগা থাকলে বুশ পাল্টে টাইট করে দিন। এসব করেও যদি ক্লীনার অচল থাকে, বুঝতে হবে গণ্ডগোল মোটরের ভিতর যার মেরামতি আপনার বাড়ীতে সম্ভব নয়।

(১৩) কল বেল

একটি বৈদ্যুতিক তার পেঁচানো রীলের ভিতর স্প্রীং থেকে ঝোলানো অবস্থায় থাকে একটি লোহার প্লাঞ্জার, যা তারের কয়েলে বিদ্যুৎ সংযোগের সাথে সাথে পরিণত হয় চুম্বকে। এই চৌম্বিক টানে প্লাঞ্জারটি 'খ' চিহ্নিত রড আঘাত করে শব্দ তোলে টুং। বৈদ্যুতিক সংযোগ ঘটেছিল পুশ সুইচটি টেপার দরুন। সুইচ থেকে আঙ্গুল তুলে নিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়, কয়েলের চৌম্বিক ক্ষেত্র অদৃশ্য

হয়, স্প্রীং-এর টানে প্লাঞ্জারটি ফিরে এসে 'ক' চিহ্নিত দণ্ডে আঘাত করে শব্দ তোলে 'টাং'। এই টুংটাং শব্দ ঘরের মানুষকে জানিয়ে দেয়, বাইরে কেউ ডাকছে (**৩৯নং নকশা**)।

অনেক সময় ভোল্টেজ বেড়ে যাওয়ায় বা টানা ব্যবহারে উত্তপ্ত হয়ে কয়েলের সূক্ষ্ম তার পুড়ে যেতে পারে। তার পাল্টাতে হলে সঠিক ভাবে জড়াবার জন্য কারখানায় দেওয়াই উচিত। নতুন কয়েল (তারের সাইজ ও কয়েলের পাক আগের কয়েলের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে) লাগাতে হলে সেটি আপনি ঘরেই করতে পারবেন। স্প্রীং-এর টান কমে এলে প্লাঞ্জারের ছুটোছুটিও কমে আসবে। স্প্রীং একটি খাঁজে আটকানো থাকে। খুলে পাল্টে নিন। অনেক দিন ব্যবহারের পর পুশ বোতাম সুইচটির স্প্রীং দেবে যায়, কনট্যাক্টে সাল্‌ফার জাতীয় ময়লা পড়ে সুইচ অকেজো হয়ে পড়ে। মেরামত করলেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাজ হয়। সামান্য দাম, বদলে নেওয়াই ভাল।

(১৪) স্টেবিলাইজার

ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারের কাজ ঃ ভোল্টেজ কম বেশী হওয়ার দরুন বিদ্যুৎ প্রবাহে যে বিপজ্জনক ধাক্কার সৃষ্টি হয় টিভি, ফ্রিজ, এয়ার-কণ্ডিশনারের মত দামী যন্ত্রকে তার হাত থেকে রক্ষা করা। ফ্যানের স্পীড রেগুলেটারের মত এটিও একটি রেগুলেটার বিশেষ।

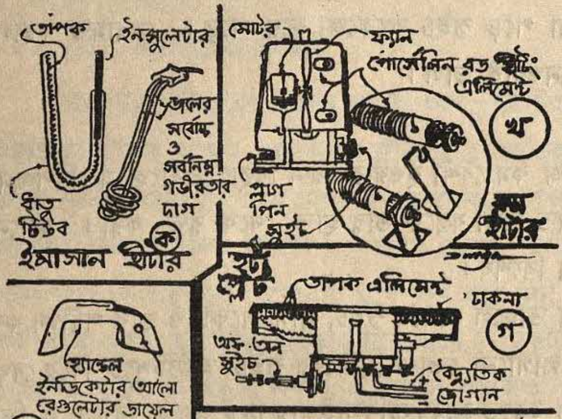
এই রেগুলেটার যদি ঠিকমত কাজ না করে তাহলে প্রথমে সুইচ, প্লাগ, সকেট ও তার পরীক্ষা করে নিন। সব ঠিক থাকলে স্টেবিলাইজারের গায়ে লাগানো ভোল্ট মিটারের সুইচ 'আউটপুটে' দিয়ে দেখুন মিটারে কোন ভোল্টেজ দেখাচ্ছে কিনা। দেখালে বুঝতে হবে স্টেবিলাইজার ঠিক আছে, বিগড়েছে ফ্রিজ বা টিভি স্বয়ং। না দেখালে আপনি নিশ্চিত, গণ্ডগোল স্টেবিলাইজারে। এবার ভোল্ট মিটারের সুইচ 'ইনপুটে' দিন। ভোল্টেজ না দেখালে স্টেবিলাইজারের ফিউজ পরীক্ষা করুন ও প্রয়োজনে পাল্টান বা মেরামত করুন। ঠিক থাকলে স্টেবিলাইজারের অফ-অন সুইচকে নিয়ে পড়ুন। একটি তার দিয়ে তার নেগেটিভ ও পজেটিভ কনট্যাক্ট দুটি জুড়ে দিলে যদি ভোল্টমিটারের কাঁটা নড়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে সুইচই অকেজো হয়েছে। নতুন সুইচ চাই। ইনপুটে যদি ভোল্টেজ দেখা যায় তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে কারেন্ট স্টেবিলাইজারে আসছে অথচ বেরুচ্ছে না। এবার ঢাকনা খুলে যে তার পাকানো ট্রান্সফরমার রয়েছে তার দুপাশে টেস্টার লাগিয়ে বিদ্যুৎ আছে কিনা দেখুন। ট্রান্সফরমারের পাকানো তারের কয়েল পুড়ে গিয়ে থাকলে তাকে পাল্টানো ছাড়া কোন গতি নেই। যদি দেখা যায় ট্রান্সফরমারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ অপ্রতিহত তাহলে গোলমালের একমাত্র সম্ভাব্য স্থান স্টেবিলাইজারের সিলেক্টার বা রেগুলেটার সুইচ। সুইচ বদলাবার আগে একবার খুলে দেখবেন, সালফার জমা বা কনট্যাক্ট স্লিপ করার মত লঘু দোষে হয়ত তাকে মেরামতও করে নিতে পারবেন। সস্তার স্টেবিলাইজারে ভোল্টমিটার লাগানো থাকে না। এক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্য একটি আলাদা ভোল্টমিটার চাই।

এবার আমরা সাতটি ঘরোয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করব যাদের কাজ হল একটি প্যাঁচানো তারের রেজিস্টেন্স কয়েলের মারফত তাপ উৎপাদন করা। এই কয়েলকে বলা হয় 'তাপক'

বা হিটিং এলিমেণ্ট। এছাড়াও এই তালিকার অধিকাংশ যন্ত্রে আছে স্বয়ংক্রিয় থার্মস্ট্যাট সুইচ—যা উত্তাপকে একটি নির্দিষ্ট মানের থেকে কমতে বা বাড়তে দেয় না। অন্ততঃ দুটি যন্ত্রে গরম হাওয়া নিক্ষেপ করার জন্য আছে ফ্যান। গঠন, যন্ত্রাংশ ও কাজের এই ঘনিষ্ঠ মিলের জন্য এই সপ্তরথীর তুলনামূলক আলোচনা আমরা একই সঙ্গে করব।

(১৫) বিভিন্ন বৈদ্যুতিক তাপযন্ত্র

(ক) ইমার্সান হীটার (**৪০নং নকশা**) **:** সরু ধাতু নির্মিত টিউবের ভিতর ইলেকট্রিক ইনসুলেটার বা অন্তরকে মোড়া (যাতে ছুঁলে শক না লাগে) অবস্থায় থাকে লম্বা একটা হীটিং এলিমেণ্ট। টিউবটিকে গুটিয়ে পাক খাইয়ে খাট মাপের করে ফেলা হয় যাতে জলপাত্রে ডুবিয়ে চালালে জল সহজেই গরম হয়ে ওঠে। হীটারের উপর জলের উচ্চতম ও নিম্নতম লেভেল দেওয়া থাকে। জলের গভীরতা এই দুই দাগের মাঝে থাকা বিশেষ দরকার।



(খ) রুম হীটার (**৪০নং নকশা**) **:** এতেও থাকে এক জোড়া হীটিং এলিমেণ্ট (পোর্শেলিন-পাইপের উপর ক্রোম নিকেলের তার জড়িয়ে তৈরি হয় এই তাপক)। পেছনে থাকে একটি চকচকে ধাতু নির্মিত রিফ্লেকটর (কম দামী মডেলে) বা গরম হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি ছোট ফ্যান (বেশী দামী মডেলে)। এছাড়া হিটিং এলিমেণ্ট যাতে মাত্রাতিরিক্ত উত্তাপে পুড়ে না যায় সে জন্য কোন কোন মডেলে থাকে জোড়া ধাতুর থার্মস্ট্যাট সুইচ যা উত্তাপ বাড়লে স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ করে দেয় বিদ্যুৎ প্রবাহকে।

(গ) হট প্লেট (**৪০নং নকশা**) **:** এও এক হীটার যা আসলে ব্যবহৃত হয় রান্না করার বৈদ্যুতিক চুল্লী হিসাবে। পাছে তেল ঝোল উপচে পড়ে হীটিং এলিমেণ্টগুলি পুড়ে যায় তাই উপর থেকে একটা

ধাতু নির্মিত ঢাকনা রয়েছে। ইমার্সান হীটারের মত এখানেও তাপক এলিমেন্ট অন্তরক বা ইনসুলেটারের ঘেরাটোপে বন্দী, যাতে শক না লাগে।

(ঘ) অটোমেটিক ইলেকট্রিক ইস্ত্রি (**৪০নং নকশা**) **:** একই ব্যাপার। অভ্র বা মাইকা পাতের উপর ক্রোম নিকেলের তার জড়িয়ে তৈরি হয় তাপক। তলার ধাতুনির্মিত সোলের উপর ইনসুলেটার পাতের ভিতর বসানো থাকে হীটিং এলিমেন্ট। এছাড়া থাকে রেগুলেটার সুইচসহ থার্মস্ট্যাট যাতে বিভিন্ন জাতের কাপড় (সুতি, উল, সিন্থেটিক, সিল্ক) ইস্ত্রির সময় উপযুক্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় থাকে ইস্ত্রির সোল প্লেটে। উপযুক্ত তাপ সৃষ্টি হলেই হ্যাণ্ডেলে লাগানো ইনডিকেটার ল্যাম্প নিবে যায়।

(ঙ) টোস্টার (**৪০নং নকশা**) **:** একজোড়া খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ২/৪ স্লাইস পাউরুটি যার দুপাশে থাকে দুজোড়া অভ্রপাতায় জড়ানো হীটিং এলিমেন্ট। কোন কোন মডেলে জোড়া ধাতুর থার্মস্ট্যাটসহ থাকে স্বয়ংক্রিয় স্প্রীং-এর ব্যবস্থা যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেই শেঁকা রুটি বা টোস্ট স্প্রীং-এর ঠেলায় টোস্টার থেকে বেরিয়ে আসে।

(চ) গীজার (**৪০নং নকশা**) **:** জল গরম করার জন্য একটি বড় ও মজবুত লোহার ট্যাঙ্ক বা ড্রামের ভিতর বসানো থাকে একজোড়া ইমার্সান হীটার ও সেই সঙ্গে একটি দণ্ডাকৃতি থার্মস্ট্যাট। ট্যাঙ্কের গায়ে থাকে পুরু তাপরোধক ইনসুলেটার যাতে ট্যাঙ্কের জল সহজে ঠাণ্ডা না হয়ে যায়।

(ছ) হেয়ার ড্রায়ার (**৪০নং নকশা**) **:** বড়সড় পিস্তলের মত দেখতে এই যন্ত্রটির মুখে থাকে একটি পেঁচানো হীটিং এলিমেন্ট ও পিছনে ছয় ব্লেডের ছোট্ট কিন্তু শক্তিশালী ফ্যান। ফ্যান ও হীটার চালাবার সুইচটি থাকে পিস্তলের যেখানে ট্রিগার থাকে সেখানে। ভিজে চুলের উপর গরম হাওয়া ফেলে তাকে চট করে শুকিয়ে তোলাই এ যন্ত্রের মূল কাজ।

এবার আসুন এই সব যন্ত্রের সাধারণ ও ছোটখাট দোষত্রুটি মেরামতির বিষয়। এই সব মেসিনে যে ৪টি যন্ত্রাংশের কোনটি না কোনটি রয়েছে, তা হল—(১) তার, ফিউজ ও সুইচ (২) তাপক (৩) থার্মস্ট্যাট ও (৪) ফ্যান। আমাদের মেরামতি আলোচনাও হবে একে একে এই চারটি যন্ত্রাংশকে ঘিরে। যে চার ধরনের দোষ এই সপ্তর্ষির ভিতর দেখা দিতে পারে তা হল **:**

(ক) মেসিন একেবারেই কাজ করছে না, কোন তাপই সৃষ্টি হচ্ছে না,

(খ) স্বাভাবিকের থেকে কম তাপ উৎপন্ন হচ্ছে,

(গ) স্বাভাবিকের থেকে বেশী তাপ উৎপন্ন হচ্ছে, এবং

(ঘ) ফ্যান কাজ করছে না বলে উৎপন্ন তাপ ছড়াতে পারছে না।

প্রথম ত্রুটিটি নানা কারণে হতে পারে। পরীক্ষা শুরু করুন ফিউজ, প্লাগের সকেট, টপ ও তার

দিয়ে। কোথাও তার আলগা বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকলে অথবা কোন কনট্যাক্ট ময়লা জমে, সরে গিয়ে বা ঢিলা হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকলে তা মেরামত করে ফেলুন। যন্ত্রের টারমিনালও পরীক্ষা করুন, পুড়ে বা আলগা হয়ে থাকলে বদলে দিন, আঁট করে দিন। এতে যদি মেসিন না চলে তা হলে একটি টেস্ট ল্যাম্প নিয়ে তাপক এলিমেন্টের দু দিকে সংযোগ করে মেসিন চালু করুন। যদি আলো জ্বলে ওঠে বুঝতে হবে আপনার মেসিনের এলিমেন্টটি অকেজো হয়ে পড়েছে, বদলাতে হবে। রুম হীটার, হটপ্লেট ইত্যাদির এলিমেন্ট গার্ড দিয়ে ঢাকা থাকে। এলিমেন্ট বার করার জন্য স্ক্রু আলগা করে গার্ডটি খুলে নিতে হবে।

স্বাভাবিকের থেকে কম তাপ পাওয়া যায় যখন তাপক এলিমেন্টের জলে ডোবান অংশে জল ফোটানোর দরুন সেডিমেন্ট পড়ে যায় পুরু হয়ে। তাপ যথারীতি উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু সেডিমেন্টের স্তর ভেদ করে বাইরে আসতে পারছে না (এ রকম দোষ দেখা দিতে পারে:ইমার্সান হীটার, হটপ্লেট জাতীয় যন্ত্র ইলেকট্রিক কেটলী বা গীজারে যাতেই জল গরম করা হয়)। শুধু যে তাপই কম পাওয়া যায় তাই নয় ; ভিতরের তাপ বেরুতে পারে না বলে মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত এলিমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। নিয়মিত ছুরি দিয়ে চেঁচে বা পাতলা অ্যাসিডে সারারাত ভিজিয়ে রেখে সেডিমেন্ট পরিষ্কার করলে যন্ত্রের কাছ থেকে কাজও বেশী পাবেন, যন্ত্রের জীবনও দীর্ঘায়ত হবে।

স্বাভাবিকের থেকে বেশী তাপ পাওয়ার অর্থ তাপ নিয়ন্ত্রক থার্মস্ট্যাট কাজ করছে না। টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে থার্মস্ট্যাটের দু মাথা সংযুক্ত করে মেসিন চালালে যদি আলো জ্বলে, বুঝতে হবে ভূত ঢুকেছে থার্মস্ট্যাটেই। শিরিষ কাগজ দিয়ে থার্মস্ট্যাটের টারমিনাল ও কনট্যাক্টগুলি ভাল করে পরিষ্কার করুন ও পাতগুলি বেঁকে দুমড়ে গিয়ে থাকলে সোজা করে দিন। এতে কাজ না হলে পুরো থার্মস্ট্যাটটিই পাল্টাতে হবে।

অত্যধিক তাপের আর এক কারণ ফ্যান না চলা এবং উত্তাপ ছড়িয়ে না পড়া। এতেও কিন্তু এলিমেন্ট পোড়ার ভয় রয়েছে। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্যান চালু করতেই হবে। ১০নং উপ-অধ্যায়ে সিলিং ফ্যান বা টেবিল ফ্যান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে এক্ষেত্রেও সেই সবই প্রযোজ্য। ফ্যানের বেয়ারীং-এ মাঝে মাঝে তেল দেবেন। ফ্যানের আয়ু বাড়বে।

অধ্যায়ের শেষে যদি আমরা সমস্ত অধ্যায়টির সংক্ষিপ্তকরণ করি তা হলে দেখব সব মেসিনেরই মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় যন্ত্রাংশ জ্যাম হয়ে ; মরচে, ময়লা বা সেডিমেন্ট পড়ে কিম্বা যন্ত্রাংশ সরে বেঁকে গেলে। এর যে কোন ত্রুটিই আপনি সহস্তে সারিয়ে ফেলতে পারবেন সহজেই যদি উপযুক্ত হাতিয়ার আপনার কাছে থাকে। হাতিয়ার বলতে বোঝায় ছোট বড় স্ক্রু-ড্রাইভার, ছুরি, প্লাস, অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ, তেলের কুপিতে থ্রি-ইন-ওয়ান লুব্রিকেটিং অয়েল এবং এক কৌটো হালকা গ্রীজ।

অপর শ্রেণীর গোলযোগ হল বৈদ্যুতিক গণ্ডগোল যা মূলত ঘটে থাকে তার, ফিউজ বা হীটিং কয়েল পুড়ে গেলে, টারমিনাল ভেঙ্গে বা আলগা হয়ে গেলে—এক কথায় যে কোন কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহের ছেদ ঘটলেই। বৈদ্যুতিক মেরামতি মানেই হচ্ছে বিদ্যুৎ চলাচল কেন বন্ধ তার কারণ খুঁজে বার করে প্রবাহকে ফের চালিয়ে দেওয়া। আগের উল্লেখিত হাতিয়ারের সঙ্গে লাগবে একটি টেস্ট ল্যাম্প। বাল্বের হোল্ডার থেকে যে দুটি পজেটিভ ও নেগেটিভ তার বেরিয়েছে তার মাথায় লাগানো থাকে দুটি ক্ল্যাম্প, যাতে ল্যাম্পটিকে খুশীমত সহজেই আটকে দেওয়া যায় যে কোন তার বা টার্মিনালে। টুকিটাকি বৈদ্যুতিক মেরামতও সমান সহজ তবে কিছু সাবধানতার প্রয়োজন :

(১) ইনসুলেটার জড়ানো নয় এরকম তার, মেন সুইচ চালু অবস্থায় কখনো ছোঁরেন না।

(২) যে কোন যন্ত্র পরীক্ষা করার আগে তার প্লাগ খুলে নিন।

(৩) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে থ্রি পিন প্লাগ ব্যবহার করা উচিত। এর সবচেয়ে মোটা পিনটির সঙ্গে বাড়ীর আর্দিং ব্যবস্থা যুক্ত থাকা দরকার। চালু অবস্থায় কোন যন্ত্র ছুলে যদি কম বেশী 'শক' অনুভূত হয়, জানবেন আপনার আর্দিং ব্যবস্থায় গোলমাল আছে।

● জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার

মনে রাখবেন কেবল গৃহীর গাইড মুখস্থ করে আপনি নামজাদা মেকানিক ইলেকট্রিসিয়ান হয়ে উঠতে পারবেন না। এই সঙ্গে নিজের হাতে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে দেখবেন ক্রমে যন্ত্র তার যান্ত্রিক দুর্বোধ্যতা ও বিভীষিকা হারাচ্ছে। আস্তে আস্তে তার চেহারা, দোষ, ত্রুটি আপনার কাছে দেখা দিচ্ছে সরলতর রূপ নিয়ে। একেই বোধ হয় বলে ঠেকে শেখা। এখানে ২০/২২টি যন্ত্রের উল্লেখ করা হল যার গঠন সরল ও প্রাথমিক। সহজে মেরামত করা সম্ভব। এ ছাড়া বাড়ীতে ফ্রিজ, টিভি, এয়ার কণ্ডিশনার, কুকিং রেঞ্জ, রেডিয়ো, টেপ রেকর্ডার, ভিডিয়ো, ইলেকট্রনিক ফায়ার ওয়ার্নিং সিস্টেম, স্টিরিও, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, লিফ্‌ট, জলের পাম্প, ক্যালকুলেটার ইত্যাদি বহু জটিল বৈদ্যুতিক বা বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি থাকতে পারে যার জটিল গঠনের দরুন তাদের ঘরোয়া মেরামতির পরিধির মধ্যে না রাখাই বাঞ্ছনীয়। তবে এই সব যন্ত্রপাতি বিগড়েছে কিনা জানবার আর একটি সরল উপায় হল তার পিছনে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তা নজর করা। যেকোন যন্ত্র পুরানো হলে বা তার গুণগত অবস্থার অবনতি হলে স্বাভাবিকের থেকে বেশী বিদ্যুৎ টানবে। কয়েকটি সরঞ্জামের স্বাভাবিক ও নতুন অবস্থায় কি পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগে ও কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার রেটে তার সম্ভাব্য খরচের একটা তালিকা পরপৃষ্ঠায় দিলাম যা পাঠকের উপকারে লাগবে।

	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট	মাসিক মোট চার্জ
(১) আলো			
(ক) ৪০ ওয়াট টিউব বা বাল্ব	৫	৬·০	৩·৬৫
(খ) ১০০ ,, বাল্ব	৫	১৫·০	৯·১৫
(২) পাখা (এ. সি.)			
(ক) ৪৮ ইঞ্চি (৬০ ওয়াট)	১২	২১·৬	১৩·১৫
(খ) ৬০ ,, (৭৫ ,,)	১২	২৭·০	১৬·৪৫
(৩) পাম্প মোটর (৪০০ ওয়াট)	৩	৩৬·০	২১·৯০
(৪) হীটার ও কুকার			
(ক) ছোট ১০০০ ওয়াট	২	৬০·০	৩৬·৫০
(খ) মাঝারী ২০০০ ওয়াট	৩	১৮০·০	১০৯·৫০
(৫) রেডিয়ো এ. সি. মেন (৪০ ওয়াট)	৪	৪·৮	২·৯০
(৬) শীতাতপ যন্ত্র			
(ক) ১৬৫ লিটার এ. সি. (১২০ ওয়াট) রেফ্রিজারেটার	১৪	৫০·৪	৩০·৬৫
(খ) ১৬৫ লিটার অ্যাবজর্পসান টাইপ (৪০০ ওয়াট ফ্রিজ)	১৪	১৬৮·০	১০২·২০
(গ) ১ টন এ. সি. (১২৭৫ ওয়াট) এয়ার কণ্ডিসনার	১০	৩৮২·৫	২৩২·৭০
(৭) ব্যাটারী / ইনভারটার ইউনিট			
(ক) ২৫০ ওয়াট আউটপুট	পরিমিত ব্যবহার	৬০·৮	৩৬·৫০
(খ) ৪০০ ,, ,,		৯৬·০	৫৮·৪০

আপনার বিদ্যুৎ খরচ যদি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় তার কারণ সন্ধান আপনার জরুরী কর্তব্য—ব্যক্তিগত ভাবে তো বটেই, জাতীয় কর্তব্যও বটে। বিদ্যুতের অপচয় জাতীয় সম্পদের অপচয়—এমন সম্পদ, যার ঘাটতি রয়েছে দেশে।

বইটি শেষ করার আগে শেষ নিবেদন—প্রচুর খেটে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম 'গৃহীর গাইডের' দ্বিতীয় খণ্ড। কোন উপকারে লাগল কিনা জানালে বুঝব শ্রম সার্থক হল। আর সেই সঙ্গে দয়া করে জানাবেন যদি আপনার কোন প্রস্তাব থাকে—সংশোধন বা সংযোজনের। তা পরবর্তী সংস্করণকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে। নমস্কার।

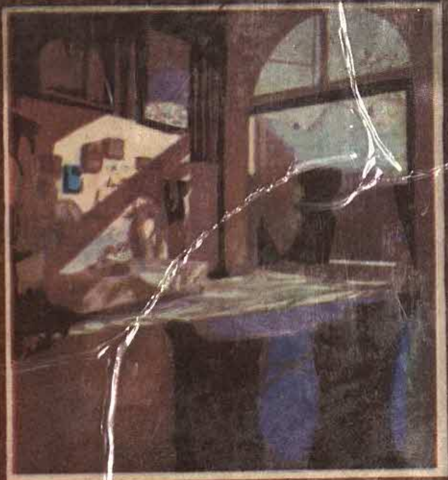
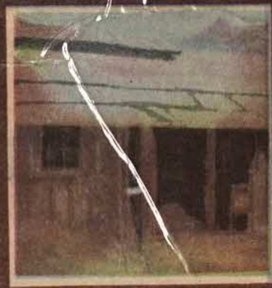
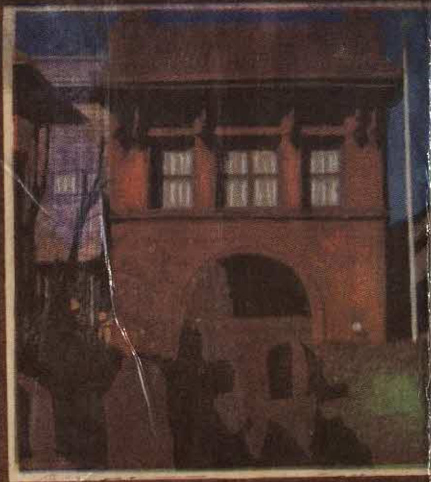
সহায়ক আকরগ্রন্থ

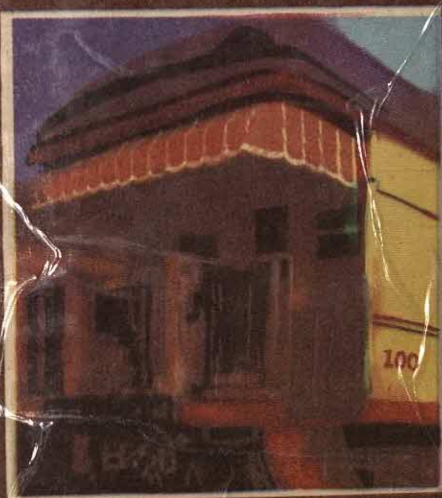
(১) Planning—The Architects Handbook—by E. & O. E. (Iliffe Books Ltd. London).
(২) Easy Guide for home decoration by Marabou Flash (Ed. Gerard & Co, Switzerland).
(৩) Handbook of Estimating by N. Sanyal (Bharati Book Stall).
(৪) Valuation by H. Sarkar (Nrityalal Seals Library).
(৫) Valuation by R. Namavati (Booksell Agencies).
(৬) Schedule of Rates for Building Works etc., Presidency Circle. W. Bengal P.W.D. for 1981-82.
(৭) Low Cost Housing Compiled by CECON.
(৮) Bedrooms by Jacqueline Inchbald (Studio Vista Ltd., London).
(৯) Storage by Geoffrey Salmon (Design Centre Publication, UK).
(১০) Interior Decoration by Pramila Mehra (Hind Pocket Books Pvt. Ltd, Delhi).
(১১) Workrooms by Peter Matthews (Design Centre Publication UK).
(১২) Economy of Iron & Steel in Building Construction (NBO).
(১৩) Home Maintenence by Martin Sara (Crowell-Collier Publishing, Co., London).
(১৪) Small Space Gardens by Kathryn L. Arthurs (Lane Publishing Co., California).
(১৫) Storage by Sherry Gellner (Lane Publishing Co. California).
(১৬) Good Taste in Decorating by W. E. O'Neill (International Textbook Co., U.S.A.).
(১৭) Walls & Windows by W. E. O'Neill (International Textbook Co. U.S.A).
(১৮) Floor Coverings by W. E. O'Neill (International Textbook Co. U.S.A.),
(১৯) Solar Heating & Cooling by H. L. Antolini (Lane Publishing Co., California).
(২০) Comparisons by Diagram Group (Penguin Books Ltd. UK).
(২১) Guinness Book of World Record (Sterling Publishing Co. New York, U.S.A).
(২২) Home Furnishing by Anna Hong Rutt (Wiley Eastern Pvt. Ltd. New Delhi).
(২৩) Household Repairs by P. Shukla (Hind Pocket Books Pvt. Ltd, Delhi).
(২৪) Staircase by H. Kitao (Shokoku-Sha, Japan).
(২৫) Bathroom & Toilet-Room by H. Kitao (Shokoku-Sha, Japan).
(২৬) Standard Mode of Measurement of Building Works (Indian Institute of Architects, Bombay).
(২৭) Seminar on Low Cost Housing, 1971—Compilation of papers presented in XI IFAWPCA Convention, New Delhi (The Builders Association of India).
(২৮) Carports & Garages (Lane Publishing Co., California).
(২৯) গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি—দুর্গা বসু (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
(৩০) বাস্তুবিজ্ঞান—নারায়ণ সান্যাল (ভারতী বুক স্টল)

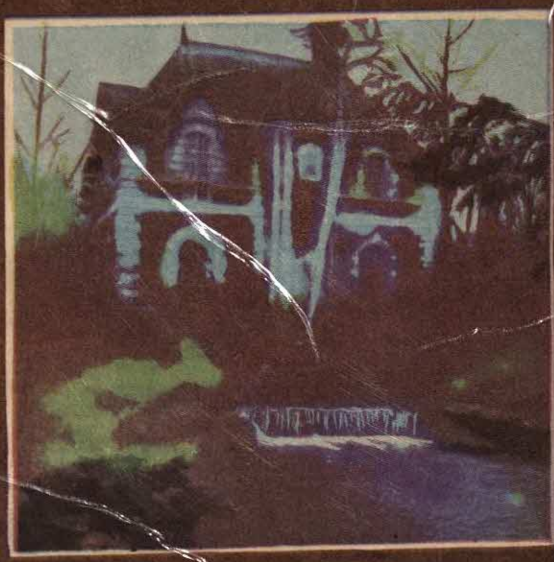
(৩১) নিরাপদর লড়াই—দুর্গা বসু (শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী)
(৩২) বাদশাহী আমল—বিনয় ঘোষ (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ)
(৩৩) গৃহীর গাইড (১ম খণ্ড)—দুর্গা বসু (শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং)
(৩৪) শুচি প্রযুক্তি বিদ্যা—এন. কে. সামন্ত (অশোক পুস্তকালয়)
(৩৫) জল-সরবরাহ প্রযুক্তি বিদ্যা—এন. কে. সামন্ত (ভারতী বুক স্টল)
(৩৬) Home Gardens by B. L. Desai (I.C.A.R., New Delhi).
(৩৭) Indoor Gardening by Vishnu Swarup (I.C.A.R. New Delhi).
(৩৮) Converted into Houses by Charles Fracchia (Viking Press, N.Y.).
(৩৯) নিম্ন লিখিত সাময়িক ও দৈনিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা ঃ
- (ক) মালিনী (১৯৮০-১৯৮২)—মালিনী প্রকাশনী, কলিকাতা
- (খ) Annual of Architecture, Structure & Town Planning (Publishing Corp. of India, Calcutta).
- (গ) Journal of the Indian Town & Country Planning Association, Bombay.
- (ঘ) Woman's Era (Vol. 8, Issue 184), New Delhi.
- (ঙ) Architects Trade Journal, Bombay.
- (চ) Science Reporter (C.S.I.R., New Delhi).
- (ছ) The Indian Architect (Vol. XIV. No. 9), New Delhi.
- (জ) Design incorporating Indian Builders, New Delhi.
- (ঝ) Interiors (Vol. I, Nos. 2, 3, 4 & 6), Bombay.
- (ঞ) Journal of The Indian Inst. of Architects, Bombay.
- (ট) The Statesman, Calcutta.
- (ঠ) আজকাল, কলিকাতা
- (ড) আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলিকাতা
- (ঢ) দৈনিক যুগান্তর, কলিকাতা

মধ্যবিত্তের ঘরসাজানো

গৃহীর গাইড প্রকল্পটি শেষ হল। তবে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা **মধ্যবিত্তের ঘর সাজানো**। এবারেও রচনাকার আপনাদের সুপ্রিয় লেখক দুর্গা বসু। ইন্টিরিয়ার ডেকরেশান বাবদে এখনো পর্যন্ত বাংলায় কোন বই নেই। হয়ত আমরাই হব পথিকৃত। আশা করি সামনের বছরেই আপনাদের হাতে তুলে দিত পারব এই বই যার মূল বিশিষ্টতা এটি বিলেতী বইয়ের চর্বিত চর্বণ নয়। লেখকের ২৫ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতার ফসল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের ও আর্থিক ক্ষমতার উপযোগী করে, বাংলা দেশের জল, বায়ু. মাল, মশলা ও বাঙ্গালী মানসিকতা, রুচি এবং চাহিদার কথা মনে রেখে, তিনি দেশের সামনে পেশ করবেন এই অনন্য বইয়ের মাধ্যমে। পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ—নোট সংগ্রহ, বিষয় নির্বাচন, চিত্র চয়ন, লেখার কাঠামো তৈরী প্রায় সমাপ্ত।




শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী • কলিকাতা-নয়